বিজ্ঞানিকা

চতুর্থ খণ্ড

উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয়ের
নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য

কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক
ডাঃ দিগ্বিজয় দত্ত এম. এস-সি, ডি. ফিল.
ও
শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র দাসগুপ্ত এম. এস-সি.
ইউনিভার্সিটি সায়েন্স ট্রেনড
প্রধান বিজ্ঞান শিক্ষক কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশন
ভূতপূর্ব অধ্যাপক নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ
ও বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বাণী তীর্থ
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
২৬-২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীশিশুকুমার বিশ্বাস
২৬-২বি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ১৯৫৯
মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জী
তারকনাথ প্রেস
শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE FOR CLASSES IX & X OF CLASS-X SCHOOLS AND CLASS-XI SCHOOLS

CLASS IX

A. MECHANICS

1. What makes work hard ; weight, friction, inertia.	
2. General notion of gravitation, Newton's Law of attraction. Simple explanation of movement of Moon and of artificial satellites. Simple explanation of tides.	
3. Simple machines to make work easier : inclined plane : lever, pulleys. (Simple pulleys).	Demonstration, experiments with inclined plane, pulleys.

B. LIGHT

1. Light travels in a straight line ; shadows ; eclipses.	Construction of a pinhole camera.
2. Light travels with finite velocity (simple statement) : Light from the sun takes 8 mins. to reach us. Light travels faster than sound. Lightning is seen before thunder is heard.	
3. Reflection of light at plane and spherical mirrors ; convex and concave (Focus and focal length). Real and virtual images (no mathematical formulae).	Construction of a periscope. Formation of images by mirrors.
4. Refraction ; convex lense. Focus and focal length (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses.
5. The eye as a lens (simple explanation).	Demonstration of principal parts of telescope and of simple and compound microscope. Demonstration of model of an eye.

6.	The Prism, dispersion of colours.	Use of prism to show formation of spectrum.
	C. HEAT	
1.	Main sources of heat ; Sun, mechanical action (friction), chemical reactions (burning of fuels), electricity.	
2.	Effects of heat : Expansion of solids, liquids, gases (examples and applications), land and sea breezes.	Ball and ring experiment. Expansion of different metals, of liquid and gases.
3.	Heat and Temperature : Thermometers: fixed points and scale ; maximum and minimum thermometer ; clinical thermometer.	
4.	Change of state : Melting, freezing; evaporation, boiling, condensation ; heat is required for melting and evaporation.	Melting and boiling points of different substances ; preparation of ice by rapid evaporation of ether.
5.	How heat travels; conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), Radiation.	Conduction—experiments convection of liquids and gases.
	D. CHEMICAL REACTIONS	
1.	Acids, bases and salts (to be treated mainly by examples)	Hydrochloric, sulphuric, nitric and carbonic acids ; caustic potash, caustic soda and barium hydroxide ; common salt.
2.	Chemical composition and principal uses of common salt, sodium carbonate, caustic soda, Hydrochloric acid.	
3.	Nitrogen Cycle and Nitrogen—compounds in agriculture : Fertilisers—Ammonium sulphates and Nitrates : Bacterial action —nodules of leguminous plants ; crop-rotation.	

4.	Lime and it products; Chalk; lime-burning; quick lime and slaked lime.	Action of water on quick-lime, action of carbon dioxide on lime water.
5.	Hard water and soft water methods of softening water.	Use of soaps in different kinds of water (before and after boiling).

E. LIVING BEINGS

1.	Outline of internal and external structure of toad or frog and of common fish.	Demonstration of principal structure by dissection.

F. THE HUMAN BODY

1.	Human blood ; the blood circulation, pumping action of the heart ; arteries ; capillaries ; veins ; feeling and pulse ; red and white corpuscles.	Charts on blood circulation. Demonstration of first-aid in case of bleeding including use of tourniquet.
2.	Digestive system of man ; mouth ; teeth ; tongue ; gullet ; stomach ; small intestine ; pancreas ; liver. Action of enzymes in aiding digestion.	Charts on digestive system.
3.	Food ; source of energy for Man ; our food needs balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage).	

CLASS X

A. SOUND

1.	Production by a vibrating body.	Vibrating tuning fork ; sonometer ; working of sound box of gramophone.
2.	Material medium necessary for transmission of sound.	Demonstration with vacuum pump and bell.
3.	Reflection, echoes.	
4.	How we hear : the human ear.	Demonstration of model of the ear.

B. ELECTRICITY	
1. Electric current and voltaic cell; idea of electric potential (compare with waterfall).	Working of simple voltaic cell.
2. Effects of electric current: magnetic, heating, chemical; Electric bell.	Construction of electromagnet, assembling an electric bell; electrolysis.
3. Idea of intensity (like flow of water per unit time: something pushed). Idea of resistance (compare flow of water through pipe: pipe offers resistance to flow).	
4. Interaction of electricity and magnetism.	Simple experiments to show action of magnet on current and current on magnet.
5. Electromagnetic induction (Faraday).	Experiments on electromagnetic induction.
6. Daniel Cell, Leclanche Cell and Lead accumulators. (No explanation of chemical reaction required).	Handling of Daniel cell and Leclanche cell (dry and wet) and lead accumulator :
7. Electricity as energy; Motors, Heating and lighting; Electric lamps.	Working models; handling an electric iron, stove and heater; study of a fan regulator.
8. Electricity for communication: telegraph, telephone.	Model of telegraph.
C. METALS	
1. Study of the natural occurrence and properties and uses of the following metals and alloys: iron, copper, aluminium, zinc, steel, brass, bell-metal. (Details of methods of extraction are not required).	
D. LIVING BEINGS	
1. Elementary idea about structure and life history of amoeba, spirogyra (algae) yeast and fern.	Demonstration by charts and specimens.

E. GENERAL IDEAS ABOUT :	
1. (a) Evolution, (b) Heredity, (c) Adaptation.	Demonstration by charts.
F. COMMON DISEASES AND EPIDEMICS	
Brief and elementary statement of main symptoms, causes, treatment and preventi on in each case.	Demonstration by charts.
(i) Air-borne diseases : common cold, influenza.	
(ii) Water-borne diseases : cholera, typhoid, dysentery.	
(iii) Insect-borne diseases : Malaria, plague.	
(iv) Diseases by contact : Ring-warm, scabies.	

সূচীপত্র

নবম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

বল বিদ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোক

তৃতীয় অধ্যায়

তাপ

চতুর্থ অধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়া

পঞ্চম অধ্যায়

জীব-জগৎ

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানবদেহ

দশম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

শব্দ-বিদ্যা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু

চতুর্থ অধ্যায়

জীব-জগৎ

পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যক্তি, বংশগতি ও অভিযোজন

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ রোগ ও মহামারী

ভূমিকা

1. বৈজ্ঞানিক নিয়ম : প্রাকৃতিক বিষয়ে পরীক্ষা-লব্ধ, সম্পূর্ণ ও শ্রেণীবদ্ধ জ্ঞানকে **'বিজ্ঞান'** বলে। গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি প্রভৃতি অনুভূতির সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা লাভ করি। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনা একটি নিয়মানুসারে ঘটে। বৈজ্ঞানিকের কাজ হইল এই নিয়ম আবিষ্কার করা। প্রকৃতিতে একই কারণে সর্বদা একই ঘটনা ঘটে। বৈজ্ঞানিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। বিশ্বের প্রত্যেক জিনিস প্রত্যেক জিনিসকে পরস্পর আকর্ষণ করে। উহা একটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম। উহার কোন ব্যতিক্রম নাই।

2. বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার বিষয়ে দুই একটি কথা :
(ক) বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নির্ভুল **পর্যবেক্ষণ-শক্তি** (Power of correct observation) অনুশীলন করা দরকার। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অহরহ কত প্রাকৃতিক ঘটনা সংঘটিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ষাকালে আকাশে নানা প্রকার মেঘ দেখা যায় ; কোন কোন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, কোন কোন মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় না। মধ্যাহ্নে সূর্য-রশ্মির প্রখরতা বেশী, উদয় ও অস্তের সময় সূর্য-রশ্মি স্নিগ্ধ হয় এবং আকাশ নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়। জলের মধ্যে দেহ নিমজ্জিত করিলে আমরা হাল্‌কা বোধ করি। একখণ্ড প্রস্তর ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলে কিছুদূর যাইয়া উহা পুনরায় নামিয়া আসে। কোন পাকা ফল গাছ হইতে খসিয়া পড়িলে উহা নীচের দিকে পড়ে। যখন কেট্‌লিতে জল গরম হয় তখন কেট্‌লির নল দিয়া সাদা ধোঁয়া বাহির হয় এবং কেট্‌লির ঢাকনা কাঁপিতে থাকে। এইরূপ দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনা খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করিবে। জগতে নির্ভুল পর্যবেক্ষণের ফলে অনেক মহাসত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(খ) **কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা** (Reasoning) : প্রত্যেক ঘটনা কেন হইতেছে তাহা জানিতে চেষ্টা করিবে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গরম হয় কেন, পৌষ-মাঘ মাসে শীত পড়ে কেন, পাকা ফল মাটিতে পড়ে কেন, জলের মধ্যে দেহকে হাল্‌কা বোধ হয় কেন—এই সব ঘটনার কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইবে।

(গ) **নিজ হাতে পরীক্ষা করা** (Experiment) : যতদূর সম্ভব নিজ হাতে পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরীক্ষা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না। পরীক্ষা করিতে খুব আমোদ লাগিবে এবং আলোচ্য বিষয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী হইবে।

3. কয়েকটি সংজ্ঞা :

(ক) **জড়** (Matter) ও **শক্তি** (Energy) : যাহা জায়গা দখল করে এবং যাহার ওজন আছে তাহাকে **জড়** বলে। জড়ের উপর কার্য করিবার ক্ষমতাকে **শক্তি** বলে। শক্তি পদার্থের মধ্যে কার্যের প্রেরণা যোগায়। শক্তির ওজন নাই, শক্তি জায়গা দখল করে না। জড ও শক্তি উভয়কে ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। জলকে তাপ দিলে জলের অণুর গতি বৃদ্ধি পায়। অণুর বর্ধিত গতিশক্তি এঞ্জিন চালায়। জল জড, তাপ শক্তি। লীলাময়ী প্রকৃতি জড ও শক্তিরূপে আমাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ করে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আইনস্টাইন** প্রমাণ করিয়াছেন যে, শক্তিকে জড়ে এবং জডকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।



আইনস্টাইন

(খ) **ভর** (Mass) : পদার্থে যতটুকু জড থাকে তাহার পরিমাণকে **ভর** বলে।

(গ) **আয়তন** (Volume) : পদার্থ যতটুকু স্থান অধিকার করে তাহাকে **আয়তন** বলে।

(ঘ) **ঘনত্ব** (Density) : একক আয়তনে যতটুকু ভর থাকে তাহাকে **ঘনত্ব** বলে। $\therefore$ ঘনত্ব $= \frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}$

যদি একটি বস্তুর ভর $=$ M, আয়তন $=$ V এবং ঘনত্ব $= d$ হয়, তবে

$$d = \frac{M}{V}.$$

(ঙ) **চাপ (Pressure) :** কোন ক্ষেত্রের উপর কোন বল লম্বভাবে ক্রিয়া করিলে তাহার একক ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থানের উপর যে বল প্রযুক্ত হয় তাহাকে **চাপ** বলে ; চাপ $= \frac{\text{প্রযুক্ত বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

4: মাপের একক : মাপের দুই রকম একক ব্যবহৃত হয়। (ক) ব্রিটিশ বা ফুট-পাউণ্ড-সেকেণ্ড (F. P. S.) পদ্ধতি (খ) ফ্রেঞ্চ বা সেন্টিমিটার-গ্রাম-সেকেণ্ড (C. G. S.) পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের, ভরের ও সময়ের একক যথাক্রমে ফুট, পাউণ্ড ও সেকেণ্ড। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐ এককগুলি সেন্টিমিটার, গ্রাম ও সেকেণ্ড। দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একককে **প্রাথমিক একক** ধরা হয়। উহারা পরস্পর নির্ভরশীল নহে। বিজ্ঞানে শত শত রাশির একক এই তিনটি একক হইতে পাওয়া যায়। উহাদিগকে **লব্ধ একক** বলে, যথা—ক্ষেত্রফল, আয়তন, বেগ, বল প্রভৃতি রাশির একক উপরোক্ত তিনটি একক হইতে পাওয়া যায়।

F. P. S. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন ও ভরের একক যথাক্রমে ফুট, বর্গ ফুট, ঘন ফুট ও পাউণ্ড হয়। এই পদ্ধতিতে 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব প্রতি ঘন ফুটে 62·43 পাঃ। C. G. S. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন ও ভরের একক যথাক্রমে সেন্টিমিটার, বর্গ সেন্টিমিটার, ঘন সেন্টিমিটার ও গ্রাম। এই পদ্ধতিতে 4° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় পরিস্রুত জলের ঘনত্ব প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে এক গ্রাম।

5. দুই পদ্ধতির সম্পর্ক :

1 ফুট = 30·48 সেন্টিমিটার ; 1 মিটার = 39·37 ইঞ্চি ;

1 মাইল = 1·61 কিলোমিটার ; 100 কিলোমিটার = 62 মাইল।

1 ইঞ্চি = 2·54 সেন্টিমিটার ; 10^{-4} সেন্টিমিটার = 1 মাইক্রন ;

1 বর্গ সেন্টিমিটার = 0·155 বর্গ ইঞ্চি ; 1 ঘনফুট = 28·31 লিটার ;

1 লিটার = 1000 ঘন সেন্টিমিটার (c.c) ;

1 পাউণ্ড (1 lb) = 453·6 গ্রাম।

নক্ষত্রাদির বিরাট দূরত্ব মাপিবার জন্য **আলোকবর্ষ** (light-year) একক ব্যবহার করা হয়। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 1,86,000 মাইল বা 3,00,000 কিলোমিটার। এই হিসাবে এক বৎসরে আলোক যত মাইল বা কিলোমিটার দূরে যায় সেই দূরত্বকে এক আলোকবর্ষ বলে।

6. জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট কঠিন পদার্থের আয়তন :

(ক) আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট (Rectangular) কঠিনের আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা।

(খ) ঘনকের (Cube) আয়তন = দৈর্ঘ্য^3

(গ) গোলকের (Sphere) আয়তন = $\frac{4}{3}\pi$ × (ব্যাসার্ধ)^3

(ঘ) চোঙের (Cylinder) আয়তন = π × (ব্যাসার্ধ)^2 × উচ্চতা ($\pi = \frac{22}{7}$)

প্রথম অধ্যায়

বল-বিদ্যা (Mechanics)

প্রথম পাঠ

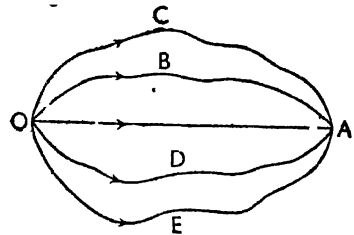
গতি (Motion), জাড্য (Inertia), বল (Force), কার্য (Work), শক্তি (Energy)

1. স্থিতি (Rest) ও গতি (Motion) : আমাদের চতুর্দিকের পদার্থগুলিকে হয় স্থির নতুবা সচল অবস্থায় দেখা যায়। চারিদিকের বাড়ী, গাছপালা প্রভৃতি স্থির, কারণ উহারা স্থান ত্যাগ করে না, বরাবর একই জায়গায় থাকে ; পদার্থের এই অবস্থাকে **স্থিতি** বলে। ধাবমান গাড়ী, ছুটন্ত ঘোড়া, প্রবহমান জলস্রোত, চলন্ত মানুষ প্রভৃতি সচল, কারণ উহারা কোন নির্দিষ্ট স্থির বিন্দুর সম্পর্কে সময়ের সহিত স্বীয় অবস্থানের পরিবর্তন করে অর্থাৎ নিজের স্থান ত্যাগ করে। পদার্থের এই অবস্থাকে **গতি** বলা হয়।

সাধারণতঃ আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় যাহা স্থির আছে তাহাকে স্থির বলি এবং যাহার গতি আছে তাহাকে সচল বলি।

2. সরণ (Displacement) : (কোন গতিশীল বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থানের পরিবর্তনকে **সরণ** বলে।) উহার অভিমুখ (direction) ও পরিমাণ (magnitude) দুইই থাকে। একটি মানুষ সোজা 3 গজ দক্ষিণে A হইতে Bতে যাইয়া 4 গজ সোজা পশ্চিমে Cতে যায়। মানুষটির গতিপথ $3+4=7$ গজ হইল কিন্তু উহার সরণ হইল $\sqrt{3^2+4^2}=\sqrt{25}=5$ গজ।

একটি বস্তু O হইতে OCA, OBA, ODA, OEA পথে A-তে যায়। এখানে পথের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হইলেও সরণ (সরল রৈখিক দূরত্ব) OA হইবে।



চিত্র 1 : সরণ।

3. দ্রুতি (Speed) ও বেগ (Velocity) : (গতিশীল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে **দ্রুতি** বলে।) (কোন একটি নির্দিষ্ট অভিমুখে গতিশীল বস্তুর অবস্থানের হারকে **বেগ** বলে।) দ্রুতির শুধু পরিমাণ

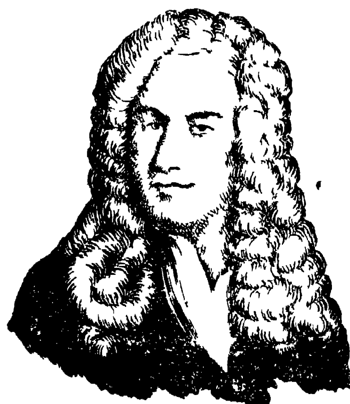
থাকে কিন্তু বেগের পরিমাণ ও অভিমুখ—দুইই থাকে। কোন নির্দিষ্ট অভিমুখে দ্রুতির নাম বেগ। একটি গাড়ী সোজা পূর্বদিকে ঘণ্টায় 40 মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পরে ঘণ্টায় 40 মাইল দক্ষিণে যায়। এই উদাহরণে গাড়ীর দ্রুতি উভয় দিকে সমান কিন্তু দিক পরিবর্তনের জন্য গাড়ীর বেগ বিভিন্ন হয়।

প্রতি একক সময়ে (এক সেকেণ্ডে) গতিশীল বস্তুর অতিক্রান্ত বক্র বা সোজা পথের দৈর্ঘ্য হইল উহার দ্রুতির মাপ। প্রতি একক সময়ে নির্দিষ্ট দিকে গতিশীল বস্তুর অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য হইল উহার বেগের মাপ। বেগের একক F. P. S. প্রণালীতে 1 ফুট প্রতি সেকেণ্ডে এবং C. G. S. প্রণালীতে 1 সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে।

যদি t সময়ে d পথ অতিক্রান্ত হয় তবে দ্রুতি $S = \dfrac{d}{t}$

যদি একক সময়ে বস্তুটি u পথ অতিক্রম করে তবে $S = ut$.

4. ত্বরণ (Acceleration) ; মন্দন (Retardation) : রেল গাড়ী স্থির অবস্থা হইতে চলিতে আরম্ভ করিলে উহার বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে। আবার গাড়ী থামিবার পূর্বে উহার বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আসে। কোন গতিশীল বস্তুর বর্ধিত বেগের পরিবর্তনের হারকে **ত্বরণ** বলে এবং হ্রস্বমান বেগের পরিবর্তনের হারকে **মন্দন** বলে।



চিত্র 2 : নিউটন।

কোন বস্তুর বেগ প্রথম সেকেণ্ডে 4 ফুট, 6 সেকেণ্ডে উহা বাড়িয়া 16 ফুট হইল।

6 সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্তন = 16 ফুট/সেঃ − 4 ফুট/সেঃ = 12 ফুট/সেঃ

∴ ত্বরণ = প্রতি সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্তনের হার

$= \dfrac{12 \text{ ফুট/সেঃ}}{6 \text{ সেঃ}} = 2$ ফুট/সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে = 2 ফুট/সেকেণ্ড^2.

5. নিউটনের গতি-সূত্র (Laws of Motion) : নিউটন গতি সম্বন্ধে তিনটি মূল্যবান সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলি গতিবিজ্ঞানের (dynamics) ভিত্তিস্বরূপ।

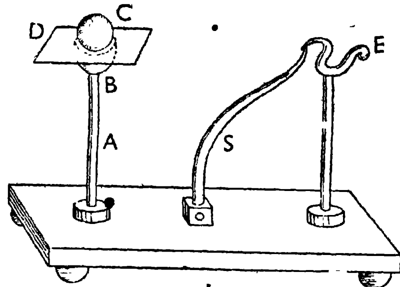
6. প্রথম সূত্র : বাহির হইতে প্রযুক্ত (impressed) বল দ্বারা কোন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে বাধ্য না হইলে অচল বস্তু চিরকাল অচল অবস্থায় থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরল রেখায় চলিবে।

প্রথম সূত্রের প্রথম অংশ বস্তুর **জড়তা** বা **জাড্য** (inertia) ধর্ম বিবৃত করে। বস্তুমাত্রই জড়তা প্রবণ। স্থির বস্তু আপনা হইতে চলিতে পারে না, আবার সচল বস্তু আপনা হইতে থামিতে পারে না। উভয় ক্ষেত্রে স্থির বা সচল অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে বাহ্যিক বল প্রয়োগের প্রয়োজন।

7. জাড্য দুই প্রকার, যথা: (i) **স্থিতি জাড্য** (inertia of rest), (ii) **গতি জাড্য** (inertia of motion)।

(i) **স্থিতি জাড্য :** নিশ্চল বস্তু চিরকালই নিশ্চল থাকিবে যতক্ষণ না কোন বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয়। বস্তুর স্থির অবস্থায় থাকিবার এই ধর্মকে **স্থিতি জাড্য** বলে। টেবিলের উপর একখানি পুস্তক রাখ। উহাকে না সরাইলে উহা চিরকাল টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিবে।

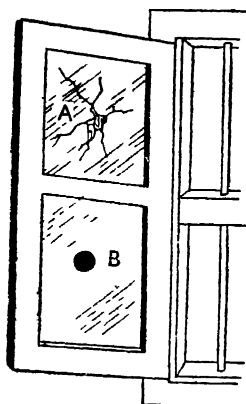
একটি লম্ব (vertical) ভাবে প্রোথিত দণ্ড A-র উপর একটি বাটি B বসানো আছে। বাটির উপর শক্ত কার্ডবোর্ড D এবং উহার উপর একটি লোহার বল C বসানো আছে। ধাতব স্প্রিং S-কে এক দিকে টানিয়া E আংটায় আটকাইয়া রাখা হয়। এখন আংটা সরাইলে স্প্রিং কার্ডবোর্ডকে হঠাৎ জোরে আঘাত করিবে এবং উহা দ্রুত সরিয়া যাইবে। স্থিতি জাড্যের জন্য বলটি সরিবে না। নীচের কার্ডবোর্ড সরিয়া যাওয়ায় বলটি বাটিতে পড়িবে।



চিত্র ৪ : স্থিতি জাড্যের দৃষ্টান্ত।

জানালার কাচের উপর নিকট হইতে হাতে করিয়া লোহার বল ছুড়িলে কাচটি চৌচির হইয়া ফাটিয়া যাইবে (A)। কিন্তু দূর হইতে বন্দুকের সাহায্যে গুলি ছুড়িলে কাচে গুলি এত দ্রুত বেগে আঘাত করে যে আঘাত প্রাপ্ত স্থানটি গুলির সহিত বেগে বাহির হইয়া যায় এবং পার্শ্ববর্তী স্থান স্থিতি জাড্যের জন্য অচল

থাকে ; ফলে কাচে ফাটলহীন গর্ত (B) হয়। যাত্রীসহ স্থির গাড়ী বা অশ্ব হঠাৎ বেগে চলিতে আরম্ভ করিলে যাত্রীর গাড়ী-সংলগ্ন দেহের নিম্ন অংশ গাড়ীর বা অশ্বের গতি প্রাপ্ত হয় এবং গাড়ী বা অশ্বের সহিত আগাইয়া চলে কিন্তু দেহের উপরের অংশ স্থিতি জাড্যের জন্য স্থির থাকে ; সেইজন্য যাত্রী পশ্চাতে হেলিয়া পড়ে।



চিত্র 4 : A ফাটলযুক্ত গর্ত, B ফাটলহীন গর্ত।

(ii) **গতি জাড্য :** গতিশীল বস্তু অনন্তকাল একই গতিতে একই অভিমুখে চলিতে থাকে যতক্ষণ না কোন বাহ্যিক বল উহার গতিকে বাধা দেয়। বস্তুর সচল থাকিবার এই ধর্মকে **গতি জাড্য** বলে। সাধারণতঃ আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখি না। একটি বলকে মাটির উপর গড়াইয়া দিলে বায়ুর ও মাটির ঘর্ষণজনিত বাধা ও পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য উহা কিছুক্ষণ চলিবার পর থামিয়া যায়। আকাশে জ্যোতিষ্ক কোন বাধা পায় না বলিয়া উহারা চিরকাল গতিশীল আছে।

চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে আরোহীর দেহও গাড়ীর সমান গতিপ্রাপ্ত হয়। অসাবধানে সোজাভাবে নামিবার সময় আরোহীর পদদ্বয় মাটির সংস্পর্শে আসিয়া স্থির হয় কিন্তু দেহের উপরিভাগ গতি জাড্যের জন্য সম্মুখ দিকে আগাইয়া যায়, ফলে আরোহী আছাড় খাইতে পারে। আরোহী যদি গাড়ীর গতির দিকে মুখ করিয়া পিছনে হেলিয়া নামে তবে তাহাকে আছাড় খাইতে হয় না। বেগে ধাবমান গাড়ী বা অশ্ব হঠাৎ থামিলে উহাতে আরোহীর দেহের নিম্নভাগ নিশ্চল হইলেও উপরিভাগ গতি জাড্যের জন্য চলন্ত অবস্থা বজায় রাখিতে চেষ্টা করে ; সেইজন্য আরোহী সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

8. বল (Force) : প্রথম গতিসূত্রের দ্বিতীয় অংশ **বলের সংজ্ঞা** নির্দেশ করে। কোন স্থির বস্তু নিজে নড়িতে পারে না বা সচল বস্তু নিজে থামিতে পারে না। একটি স্থির বলকে ঠেলিয়া দিলে উহা সোজাভাবে একই দিকে চলিতে আরম্ভ করে। আবার প্রতি সেকেণ্ডে 4 ফিট গতিযুক্ত বলকে সজোরে আঘাত করিলে উহার গতি বৃদ্ধি পায়। আবার পূর্বগামী বলকে আঘাত করিয়া পশ্চিমগামী করা যায়। একটি বল গড়াইয়া আসিতেছে,

উহাকে পা দিয়া আটকানো যায়। এই সব ক্ষেত্রে যাহা প্রয়োগ করা হইল তাহাকে **বল** বলে। গতির উৎপত্তি বা বেগের পরিবর্তনের বা বেগ বন্ধ করার কারণ বল-প্রয়োগ। আবার একটি প্রকাণ্ড পাথরকে ধাক্কা দিলেও উহা নড়ে না। এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বল বস্তুর স্থির অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাইতে না পারিলেও ঘটাইবার চেষ্টা করে। **যাহা কোন বস্তুর স্থির অবস্থান বা সমগতির অভিমুখ ও পরিমাণ পরিবর্তন করে বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করে তাহাকে বল বলে।** বলের প্রয়োগ-বিন্দু, পরিমাণ ও অভিমুখ থাকে।

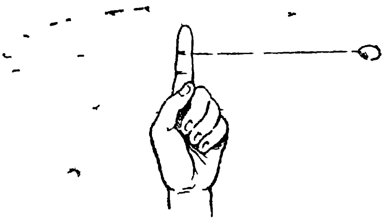
বলের দৃষ্টান্ত :

(i) পৃথিবী সকল বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে টানে অর্থাৎ উহাকে গতিশীল করে। এই বলকে **অভিকর্ষ** (Gravity) বলে।

(ii) চুম্বক লোহাকে টানে ; উহাকে **চৌম্বক** বল (Magnetic force) বলে। এই বল বৃহৎ লোহার বস্তুকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টানিয়া লইয়া যায়।

(iii) টেবিলের উপর দিয়া বই টানিলে **ঘর্ষণ** বল (Frictional force) অনুভব করা যায়। উহা বই-এর গতিকে বাধা দেয়।

(iv) একটি ঢিলকে সুতা দিয়া বাঁধিয়া জোরে বৃত্তপথে ঘুরাইলে দুইটি বলের উদ্ভব হয়। একটি বল সুতার মধ্য দিয়া ঢিলকে হাতের দিকে টানে, হাতের উপর টান অনুভব করা যায়। এই বলকে **অভিকেন্দ্র বল** (Centripetal force) বলে। এই বলের জন্য ঢিল হাতকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকার পথে ঘোরে। আর একটি বল সুতার মধ্য দিয়া ঢিলকে কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে টানে। এই বলকে **অপকেন্দ্র বল** (Centrifugal force) বলে। অপকেন্দ্র বল অভিকেন্দ্র বলের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে, এই বলের জন্য ঢিলটি পলাইবার চেষ্টা করে এবং সুতা সটান থাকে।



চিত্র 5 সুতা দিয়া ঢিল বাঁধিয়া হাতে ঘোরানো হইতেছে।

বলের একক : F. P. S. প্রণালী অনুসারে যে বল এক পাউণ্ড ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া এক ফুট/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে তাহাই বলের একক। এই একককে **পাউণ্ডাল** (Poundal) বলে। C. G. S. প্রণালী অনুসারে যে

বল এক গ্রাম ভরের উপর ক্রিয়া করিয়া এক সেন্টিমিটার/সেকেণ্ড^2 ত্বরণ উৎপন্ন করে তাহাই বলের একক। এই একককে **ডাইন** (Dyne) বলে। 1 পাউণ্ডাল = 13825·7 ডাইন।

9. **দ্বিতীয় সূত্র: কোন বস্তুর ভরবেগের** (momentum) **পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সহিত সমানুপাতিক হয় এবং বল যে অভিমুখে ক্রিয়া করে ভরবেগের পরিবর্তনও সেই অভিমুখে হয়।**

এই সূত্র হইতে আমরা বিভিন্ন বলের পরিমাণ করিতে এবং বল ও ত্বরণের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করিতে পারি। এই বিষয়ে তোমরা উচ্চতর শ্রেণীতে জানিতে পারিবে।

10. **তৃতীয় সূত্র: প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে।**

যখন একটি বস্তু A অপর একটি বস্তু B-এর উপর বল প্রয়োগ করে তখন B বস্তুও A বস্তুর উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে। টেবিলের উপর বই লম্বভাবে নীচের দিকে চাপ দেয়; টেবিলও বইকে উপর দিকে ধাক্কা দেয়। উহারা সমান হয় বলিয়া বই টেবিলের উপর স্থির থাকে। টেবিলের উপর ঘুষি দিলে টেবিলও সমান বেগে প্রত্যাঘাত করে। কামানের গোলা সামনে ছুটিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে কামানও গোলার সমান ভরবেগে পিছনে হটিয়া আসে।

11. **কার্য:** যখন শ্রমিক মোট বহন করে, যখন ঘোড়া গাড়ী টানে, যখন একটি বালক ঢিল ছোড়ে, যখন হাতী শুঁড় দিয়া কাষ্ঠ বহন করে তখন সকলেই কার্য করে। এই সকল উদাহরণে বল-প্রয়োগের ফলে বস্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়। প্রতি মুহূর্তে আমরা চতুর্দিকে কার্যের নানা দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে যদি বস্তু গতিশীল হয় অর্থাৎ বস্তুটি বলের ক্রিয়ার অভিমুখে সরিয়া যায় তবে বলা হয় **বল কার্য করিতেছে।** যদি বস্তুটি বলের ক্রিয়ার বিপরীত অভিমুখে সরিয়া যায় তবে বলা হয় **বলের বিরুদ্ধে কার্য হইতেছে।** ঘোড়া গাড়ী টানিলে, হাতী কাষ্ঠ বহন করিলে—উহারা কার্য করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে বস্তু বলের অভিমুখে সরিয়া যায়। আবার গাড়ী টানিবার সময় ঘোড়া ঘর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কার্য করে। মানুষ বোঝা উপরে তুলিবার সময় অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করে।

বল-প্রয়োগে যদি বস্তু না সরে তবে কোন কার্য হয় না। তুমি একটি ভারী পাথরকে যথাসাধ্য ঠেলিয়া ক্লান্ত হইলে কিন্তু পাথর একটুও নড়িল না। উহাতে কোন কার্য হইল না। বলের মান ও বলের প্রয়োগবিন্দু যতটা সরে সেই দূরত্বের গুণফল হইল কার্যের মাপ।

12. কার্যের একক : চরম (Absolute) একক : F. P. S. প্রণালীতে এক পাউণ্ডাল বল এক ফুট ক্রিয়া করিলে যে কার্য হয় তাহাই কার্যের একক। উহাকে **ফুট পাউণ্ডাল** (Foot Poundal) বলে। C. G. S. প্রণালীতে এক ডাইন বল এক সেণ্টিমিটার ক্রিয়া করিলে যে কার্য হয় তাহাই কার্যের একক। উহাকে **আর্গ** (Erg) বলে। এই প্রণালীতে কার্যের ব্যবহারিক একককে **জুল** (Joule) বলে। 1 জুল $= 10^7$ আর্গ।

1 পাউণ্ডাল = 13825·7 ডাইন; 1 ফুট = 30·48 সেন্টিমিটার; 1 ফুট পাউণ্ডাল = 30·48 × 13825·7 আর্গ = $4{\cdot}214 \times 10^5$ আর্গ।

13. শক্তি : যে ব্যক্তি অধিক কার্য করে তাহাকে আমরা শক্তিশালী ব্যক্তি বলি। যে পশু ভারী কার্য করে তাহাকে শক্তিশালী পশু বলি। হাতী শুঁড়ের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ মাটি হইতে টানিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে পারে। সেইজন্য হাতীকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পশু বলি। শক্তি সাধারণতঃ পদার্থের মধ্যে কার্যের প্রেরণা যোগায়। **কার্য করিবার ক্ষমতাকে শক্তি বলে।**

মাটিতে একটি ইট স্থির আছে, উহাকে ছাদে তোলা হইল; ইটে শক্তি সঞ্চারিত হইল। উহা ছাদ হইতে মাথায় পড়িলে মাথা ফাটিয়া যায় অর্থাৎ উহা কার্য করে। বন্দুক হইতে কাঠের উপর গুলি ছুড়িলে গুলিতে গতিশক্তি সঞ্চারিত হয় এবং উহা কাঠের ভিতর প্রবেশ করে অর্থাৎ কার্য করে। গুলি স্থির অবস্থায় কোন কার্য করে না। প্রবহমান বায়ুর শক্তি আছে। উহা যন্ত্র চালায় এবং নৌকা ঠেলিয়া লইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে শক্তি খরচ না করিয়া একখণ্ড তৃণকেও আমরা সরাইতে পারি না।

কার্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হয়। জীবের দেহে খাদ্যের উপাদানের সহিত নিঃশ্বাসে গৃহীত বায়ুর অক্সিজেন যে রাসায়নিক ক্রিয়া করে, তাহাতে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপই জীবের কার্য করিবার শক্তি সরবরাহ করে।

কার্যের একক ও শক্তির একক এক। অর্থাৎ, F. P. S. প্রণালীতে শক্তির একক ফুট পাউণ্ডাল এবং C. G. S. প্রণালীতে শক্তির একক আর্গ।

অনুশীলনী

1. স্থিতি ও গতি কাহাকে বলে ?
2. দ্রুতি ও বেগ কাহাকে বলে ?
3. নিউটনের প্রথম গতিসূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
4. জাড্য কাহাকে বলে ? জাড্য কয় প্রকারের ?
5. কেন হয় বল। (i) বন্দুকের গুলির আঘাতে জানালায় ফাটলহীন গর্ত হয় কেন ? (ii) চলন্ত ট্রাম হইতে সোজাভাবে নামিলে সম্মুখ দিকে আছাড় খাইতে হয় কেন ? (iii) অশ্ব হঠাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে অশ্বারোহী পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া যায় কেন ?
6. নিউটনের তৃতীয় সূত্র বিবৃত কর।
7. কার্য বলিতে কি বুঝ ব্যাখ্যা কর।
8. শক্তি বলিতে কি বুঝ ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

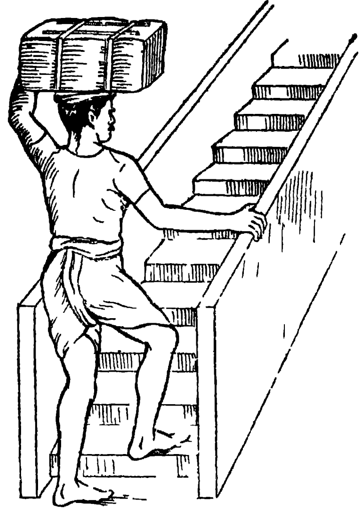
কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ? (What makes work hard ?)

14. **কষ্টের কারণ কি ?:** যখন গরু মহিষ মালবোঝাই গাড়ী টানে, যখন মজুর সিঁড়ি দিয়া উপরে ইট তোলে, যখন কোন ব্যক্তি একটি অচল লোহার রোলারকে ধাক্কা মারিয়া সচল করে, অথবা গতিশীল তেলের পিপাকে থামায় তখন উহারা ক্লান্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেকের কার্য করিতে কষ্ট হয়। কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ? প্রত্যেক কার্য করিবার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু বাধা অতিক্রম করিতে হয়। বাধা অতিক্রম করিবার জন্য বল-প্রয়োগ প্রয়োজন। বল প্রয়োগ করিতে হইলে দেহের পেশীকে সঞ্চালিত করিতে হয়। উহার ফলে আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করি।

কার্যের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ তিন প্রকার বাধা দেখা যায়, যথা—(ক) **পৃথিবীর আকর্ষণ** বা **অভিকর্ষ** বা **পদার্থের ওজন** (weight), (খ) **ঘর্ষণ**, (গ) **জাড্য**।

15. **অভিকর্ষ** (Gravity): একটি ফল বোঁটা হইতে খসিয়া নীচের দিকে পড়ে কেন ? নিউটন প্রমাণ করেন যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ-বলের নাম **মহাকর্ষ** (Gravitation)। উহার বিষয় পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইবে। এই নিয়ম অনুসারে পৃথিবী সমুদয় বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই বিশেষ আকর্ষণ-

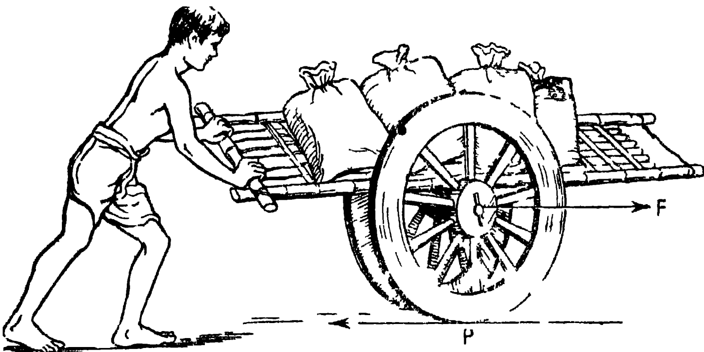
বলকে **অভিকর্ষ** বলে। কোন বস্তুকে পৃথিবী যে পরিমাণ বলের সহিত আকর্ষণ করে সেই বলের মোট পরিমাণকে ঐ বস্তুর **ওজন** বলে। এই আকর্ষণের জন্যই ফল বোঁটা হইতে খসিয়া নীচের দিকে পড়ে। আবার কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে তুলিতে হইলে পৃথিবীর এই আকর্ষণজনিত বাধা অতিক্রম করিতে হয়। বস্তুটির ওজন যত অধিক হইবে উহাকে উপরে তুলিতে তত অধিক অভিকর্ষজনিত বাধা অতিক্রম করিতে হইবে এবং তদনুরূপ আমাদের কষ্ট হইবে।



চিত্র 6 : অভিকর্ষের বিরুদ্ধে ইট তুলিতে কষ্ট হইতেছে।

অভিকর্ষের উপকারিতাও আছে। অভিকর্ষ না থাকিলে ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িত না। মাটি হইতে লাফ দিলে আমরা আকাশে উঠিয়া যাইতাম।

16. ঘর্ষণ (Friction) : একটি বলকে মসৃণ মেঝের উপর দিয়া গড়াইয়া দিলে উহা বহুদূর যায়। কিন্তু উহাকে অমসৃণ রাস্তায় গড়াইয়া দিলে অল্প দূরে গিয়াই থামিয়া যায়। উহার কারণ কি? একটি বস্তু A-র উপর দিয়া অপর



চিত্র 7 ঠেলা গাড়ীর চাকার কেন্দ্রে এবং চাকার ও মাটির স্পর্শতলে ঘর্ষণজনিত বাধা সৃষ্টি হয়। উহাতে গাড়ী ঠেলিতে কষ্ট হয়।

বস্তু B-কে টানিলে স্পর্শতলে (surface of contact) B-এর গতিরোধক বলের উদ্ভব হয়। উহাকে **ঘর্ষণ-বল** বলে। স্পর্শতলের অমসৃণতার জন্য ঘর্ষণ-বলের

উদ্ভব হয়। কোন কঠিন পদার্থের তলদেশ যত মসৃণ হয় তত কম ঘর্ষণ-বলের উদ্ভব হয়। ঘর্ষণের জন্য সকল সচল পদার্থের গতি বাধা প্রাপ্ত হয়। বরফ বা শ্যাওলার উপর চলিতে পা পিছলাইয়া যায়। কারণ উহারা অধিক মসৃণ বলিয়া গতিরোধক সামান্য ঘর্ষণ-বল উদ্ভূত হয়। কলতলায় অনবরত জল পড়িয়া শ্যাওলা জন্মায়। সেইজন্য কলতলায় আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বরফের উপর বালি ছড়াইয়া দিলে ঘর্ষণ-বলের উদ্ভব হয়। মাল বোঝাই গাড়ী সাধারণ পাকা রাস্তায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যতটা পরিশ্রম হয় পিচঢালা রাস্তায় ততটা পরিশ্রম হয় না। আবার ঘর্ষণ-বলের প্রয়োজনও আছে। ঘর্ষণ-বল না থাকিলে আমরা মাটির উপর দিয়া হাঁটিতে পারিতাম না, গাছে উঠিতে পারিতাম না, দড়িতে গিট দিতে পারিতাম না, গাড়ীর চাকা চলিত না। ঘর্ষণ-বলের অভিমুখ স্পর্শতলের সমান্তরাল ও গতির বিপরীতমুখী হয়।

ঘর্ষণ বল কমাইবার জন্য লোহার মসৃণ রেলের উপর ট্রাম বা ট্রেন চলাচল করে এবং গাড়ীর চাকা গোলাকার থাকে। যন্ত্রপাতির চাকায় ভেসলিন বা পিচ্ছিল-কর তৈল (lubricating oil) দিতে হয়। তুলা-যন্ত্রে অ্যাগেটের ক্ষুরধার (knife edge) ও সাইকেল চাকার অক্ষের (axle) চারিধারে শক্ত স্টীলের বল (ball bearing) থাকে। উড়োজাহাজের গতি বায়ুর ঘর্ষণে বাধা পায়। সেইজন্য উহার দেহ এমনভাবে নির্মিত হয় যে উহার গায়ে যথাসম্ভব কম বায়ু লাগে।


চিত্র 8 : পিপার স্থিতিজাড্যের জন্য পিপাকে নড়াইতে কষ্ট করা হইতেছে।

17. জাড্য (Inertia) ঃ জাড্যের আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে অচল বস্তুকে সচল করিতে কিংবা সচল বস্তুকে থামাইতে জাড্যের বাধা অতিক্রম করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেহের পেশীকে কার্য করিতে হয়। একটি স্থির আলকাতরার পিপাতে স্থিতিজাড্য থাকে

উহাকে গড়াইয়া লইয়া যাইতে হইলে বল প্রয়োগ করিতে হয় কিন্তু উহা একবার গড়াইতে আরম্ভ করিলে পূর্বের মত বল প্রয়োগ করিতে হয় না। আবার গতিশীল পিপার গতি-জাড্য-থাকে। উহাকে থামাইতে হইলে উহার গতির বিপরীত দিকে বল প্রয়োগ করিলে পিপা কিছুদূর গিয়া থামিবে। উভয় ক্ষেত্রে জাড্যজনিত বাধা অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া কার্য করিতে কষ্ট হয়।

1. কার্য করিতে কষ্ট হয় কেন ?
2. অভিকর্ষ কাহাকে বলে ?
3. ঘর্ষণ কাহাকে বলে ? ঘর্ষণের উপকারিতা কি ?
4. কেন হয় বল :— (i) কোন জিনিস একতলা হইতে দোতালায় তুলিতে কষ্ট হয় কেন ? (ii) শ্যাওলার উপরে পা পিছলায় কেন ? (iii) স্থির ভারী বস্তুকে সরাইতে কষ্ট হয় কেন ?
5. ঘর্ষণ কমাইবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হয় ?

তৃতীয় পাঠ

মাধ্যাকর্ষণ

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র (Newton's Laws of Gravitation) ও অভিকর্ষজ ত্বরণ (Acceleration due to gravity)

18. **মাধ্যাকর্ষণ:** নিউটন আপেল ফলের পতন ও গ্রহের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত সূত্র আবিষ্কার করেন :—

বিশ্বে ছোট-বড় সকল বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ-বল বস্তুদ্বয়ের ভরের গুণফলের **সমানুপাতে** (directly) ও উহাদের দূরত্বের বর্গফলের **ব্যস্তানুপাতে** (inversely) পরিবর্তিত হয়। এই আকর্ষণ-বলকে **মহাকর্ষ** বা **মাধ্যাকর্ষণ** বলে। এই সূত্রকে **মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র** বলে।

যদি দুইটি বস্তুর ভর M ও m হয় এবং উহাদের দূরত্ব d হয় এবং উহাদের আকর্ষণ-বল F হয়, তবে $F \propto \frac{Mm}{d^2}$

$F = G.\frac{Mm}{d^2}$ এখানে G = মহাকর্ষীয় নিত্য সংখ্যা।

যদি $M = m = 1$ এবং $d = 1$ তবে $G = F$ হয়। ইহার অর্থ এই যে দুইটি একক ভর বিশিষ্ট বস্তু একক দূরত্বে অবস্থিত হইলে উহাদের আকর্ষণ-বলের পরিমাণকে মহাকর্ষীয় নিত্য সংখ্যা বলে। উহার মান C.G.S. পদ্ধতিতে $6{\cdot}6576 \times 10^{-8}$। মহাকর্ষের সূত্র সর্বত্র প্রযোজ্য। আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি ভারতীয় জ্যোতির্বিদগণ বহু পূর্বেই যে এইরূপ আকর্ষণের কথা জানিতেন উহার বহু প্রমাণ আছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন নিউটনের সূত্রের কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। ইহার বিষয় পরে পড়িবে।

19. অভিকর্ষ (Gravity)ঃ পৃথিবী ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বা উহার নিকটস্থ অন্য যে কোন বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-বলকে **অভিকর্ষ** বলে। উহা মহাকর্ষের একটি বিশেষ নাম। পার্থিব যে কোন বস্তুর ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় নগণ্য। সেইজন্য পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ আমরা বুঝিতে পারি না। এই আকর্ষণের জন্য গাছের বোঁটা হইতে পাকা ফল খসিয়া মাটিতে পড়ে, পাহাড়-পর্বত হইতে পাথরখণ্ড খসিলে উহা নীচের দিকে গড়াইয়া চলে। যে কোন বস্তু অধৃত অবস্থায় থাকিলে উহা অভিকর্ষের জন্য নীচের দিকে পড়ে।

নিউটনের মহাকর্ষ-সূত্র অভিকর্ষের বেলায় প্রযোজ্য। যদি পৃথিবীর ভর $= M$, বস্তুর ভর $= m$, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ $= R$, অভিকর্ষ-বল $= F$ হয়, তবে $F = G.\frac{Mm}{R^2}$

পৃথিবী গোলাকার। সুতরাং উহার ভরকে কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়া ধরা হয় এবং পৃথিবীর আকর্ষণ কেন্দ্রাভিমুখী হয়।

20. নিউটনের সূত্রানুসারে চন্দ্রের গতিঃ কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার গ্রহের ও চন্দ্রের গতি সম্পর্কে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কার করেন, কিন্তু উহারা কেন অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ ঘুরিতেছে তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই। নিউটন মহাকর্ষ আবিষ্কার করিয়া ইহাদের গতির কারণ নির্ণয় করেন।

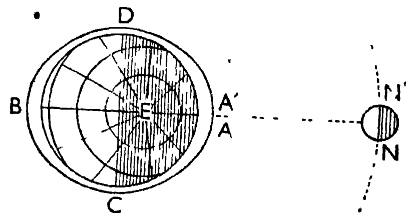
পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর ঘুরিতেছে। পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে মহাকর্ষজনিত বল ক্রিয়া করে। পৃথিবী মহাকর্ষজনিত বল প্রয়োগ না করিলে চন্দ্র মহাশূন্যে চলিয়া যাইত। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে একটি শক্ত সুতার এক প্রান্তে একটি ঢিল বাঁধিয়া সুতার অপর প্রান্ত হাতে ধরিয়া ঘুরাইলে হাত ঢিলের উপর অভিকেন্দ্র-বল সরবরাহ করে। এই বলই ঢিলকে কেন্দ্রের দিকে

আকর্ষণ করে (চিত্র 5)। নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের দ্বিতীয় অংশ বলে যে কোন বস্তুর সমবেগ পরিবর্তন করিতে বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ঢিলটি বৃত্তাকার পথে ঘোরে। সুতরাং প্রতি মুহূর্তে উহার গতির দিক পরিবর্তিত হয়। ঢিলকে বৃত্তপথে ঘুরাইবার জন্য অভিকেন্দ্র-বল ক্রিয়া করে।

পৃথিবীর মহাকর্ষ চন্দ্রের গতির অভিকেন্দ্র-বল সরবরাহ করে। পৃথিবীর চারিদিকে কোন বায়ু না থাকায় চন্দ্রের গতি ঘর্ষণজনিত বাধা পায় না। গতি-জাড্যের জন্য চন্দ্র অনন্তকাল সমবেগে ঘুরিতেছে।

21. জোয়ার-ভাঁটা: প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে দুইবার সমুদ্রজলের স্ফীতি ও পতন হয়। জলের স্ফীতিকে **জোয়ার** (flow tide) ও জলের পতনকে **ভাঁটা** (ebb tide) বলে। জোয়ার-ভাঁটা মহাকর্ষের একটি উত্তম দৃষ্টান্ত।

জোয়ার দুইটি কারণে সংঘটিত হয়। (i) প্রধান কারণ:—সমুদ্রজলের উপর সূর্য ও চন্দ্রের মহাকর্ষ ক্রিয়া করে কিন্তু সূর্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে আছে বলিয়া মহাকর্ষ সূত্রানুসারে চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর অধিক অনুভূত হয়। চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে বা নিকটে আসে সেই অংশ অন্যান্য অংশ অপেক্ষা চন্দ্র দ্বারা অধিক আকৃষ্ট হয়। আবার কঠিন স্থলভাগের অণু অপেক্ষা জল-ভাগের অণুগুলি শিথিল থাকে। তাই জলভাগের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ অধিক ক্রিয়া করে। সুতরাং চন্দ্রের সম্মুখস্থ স্থানের জলরাশি স্ফীত হয় এবং চারিদিকের মহাসাগর হইতে জলরাশি ঐ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়; কারণ মহাসাগরগুলি সব পরস্পর যুক্ত। ফলে পৃথিবীর এই অংশে **মুখ্য** (primary) **জোয়ার** সৃষ্ট হয়। চিত্রে A-স্থানে মুখ্য জোয়ার সৃষ্ট হইয়াছে। উহার বিপরীত দিকের B স্থান পৃথিবীর কেন্দ্র অপেক্ষা চন্দ্র হইতে 4000 মাইল অধিক দূরে অবস্থিত। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণ B-স্থান অপেক্ষা কেন্দ্রের



চিত্র 9 : জোয়ার ভাঁটা।

উপর অধিক থাকে। আবার B-স্থানের জলের নীচের কঠিন স্থলভাগ পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। সুতরাং চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর কেন্দ্র ও

তৎযুক্ত কঠিন B স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে যতটা সরিয়া যায় তদুপরি জলভাগ ততটা সরে না। সুতরাং B স্থানে **গৌণ** (secondary) **জোয়ার** সৃষ্ট হয়।

জোয়ার সৃষ্টির আর একটি কারণ আছে। পৃথিবী নিজ মেরুরেখার উপর সর্বদা আবর্তন করে। সুতরাং জলরাশির উপর একটি কেন্দ্রাভিগ বল্ ক্রিয়া করে। উহার ফলে জলরাশি বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া জোয়ার সৃষ্টিতে কিছুটা সাহায্য করে।

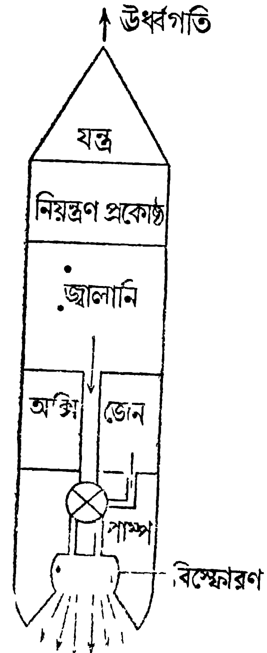
পৃথিবীর মোট জলরাশি নির্দিষ্ট। সুতরাং A ও B স্থানদ্বয়ে জোয়ারের সময় মধ্যবর্তী C ও D স্থান দুইটি হইতে জলরাশি জোয়ারের স্থানে প্রবাহিত হয়। ফলে C ও D স্থানের জল নামিয়া যায় এবং সেখানে **ভাঁটার** সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর পূর্ণ আবর্তনের সময় 24 ঘণ্টা। সুতরাং প্রত্যেক স্থান (মনে কর A স্থান) 24 ঘণ্টার মধ্যে পর পর C, B, D ও A' অবস্থানে আসে। সুতবাং প্রত্যেক স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাঁটা হয়।

অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে একই সরল রেখায় অবস্থান করে। সেইজন্য পৃথিবীর উপর উহাদের মিলিত আকর্ষণ প্রবল হয়। উহাকে **ভরা** বা **তেজ কটাল** (spring tide) বলে। পূর্ণিমায় একদিকে চন্দ্র ও বিপরীত দিকে সূর্য একই সরল রেখায় অবস্থান করে বলিয়া পূর্ণিমাতেও ভরা কটাল হয়। অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সহিত সমকোণে অবস্থান করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যে স্থানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে সে স্থানে ভাঁটা হয়। দুইটি বিপরীত বলের বিরোধিতার জন্য জোয়ারের তীব্রতা কম হয়। এই জোয়ারকে **মরা কটাল** (neap tide) বলে।

22. কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial satellites): বহু প্রাচীনকাল হইতে মানুষ মহাশূন্যের রহস্য জানিবার এবং অন্যান্য গ্রহে ও চন্দ্রে কোন জীব আছে কিনা তাহা জানিবার স্বপ্ন দেখিয়াছে। কিছুকাল হইতে এই বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হইতেছে। প্রথম রুশ বিজ্ঞানী 1957 খ্রীস্টাব্দে চৌঠা অক্টোবর **স্পুটনিক** (sputnik) নামক কৃত্রিম উপগ্রহ বা চন্দ্র মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে উহা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। উহার ভিতরে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতি ছিল। উহার ওজন ছিল 83·6 কিলোগ্রাম। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে 560 মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া উহা ঘণ্টায় 18,000 মাইল বেগে প্রায় 96 মিনিটে

একবার ভূ-প্রদক্ষিণ করে। ঐ বৎসর দোসরা নভেম্বর রাশিয়া দ্বিতীয় স্পুটনিক উৎক্ষেপণ করে। উহা প্রথমটি অপেক্ষা আকারে বৃহত্তর ও ওজনে ছয়গুণ ছিল। 900 মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া উহা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; উহার মধ্যে 'লাইকা' নামক একটি কুকুর ছিল। 1958 খ্রীস্টাব্দে পয়লা ফেব্রুয়ারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক্সপ্লোরার (Explorer) নামক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে উৎক্ষেপণ করে। উহা 200 মাইল উর্ধ্বে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। উহার পর রাশিয়া 'যান্ত্রিক মানুষ' সহ দুইটি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। উহাদের মধ্যে একটির নাম মেচ্‌টা (Mechta)। উহা চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া কৃত্রিম গ্রহে পরিণত হইয়াছে। উহার কক্ষপথ পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যে অবস্থিত। এই সকল উপগ্রহের মধ্যে কোন জীবন্ত মানুষ ছিল না। সর্বাধিক বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন রাশিয়ার **মেজর ইউরি গাগারিন** (Major Yuri Gagarin) উনিই মহাকাশচারী (spaceman) প্রথম মানব। 1961 খ্রীস্টাব্দে বারই এপ্রিল তিনি ভোস্টক (Vostok) নামে মহাকাশযানে উড়িয়া 70 মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় মহাকাশচারী টিটভ 25 ঘণ্টায় 17 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। 1962 খৃস্টাব্দে আগস্ট মাসে রাশিয়ার নিকোলাযেভ ও পোপোভিচ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি 90 ঘণ্টায় 64 বার এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি 71 ঘণ্টায় 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।



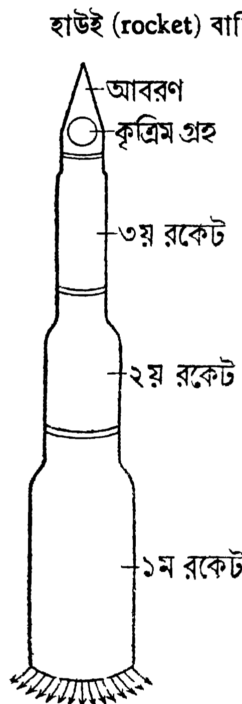
চিত্র 10 : রকেটের ভিতরের যন্ত্রপাতি।

23. কৃত্রিম উপগ্রহের উর্ধ্বগতির কারণ: এখন জিজ্ঞাস্য যে (i) কি প্রকারে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা যায় এবং কেন উহা পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া না আসিয়া মহাকাশে ভাসিতে ভাসিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণকরে; কারণ আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতাএই যে কোন বস্তুকে উর্ধ্বে নিক্ষেপ করিলে উহা কিছুদূর গিয়া মাটিতে ফিরিয়া আসে। (ii) আবার উহা পৃথিবীর আকর্ষণ একেবারে কাটাইয়া

লক্ষ্যহীনভাবে মহাশূন্যে ছুটিয়া যায় না কেন ? প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তে অবশ্য আমরা দেখিতে পাই যে চন্দ্র হইতে পৃথিবীর দূরত্ব 2 লক্ষ 39 হাজার মাইল এবং তাহা পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীতে না নামিয়া উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

গণনায় দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তুকে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে 560 মাইলের ঊর্ধ্বে তুলিয়া পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া উহাকে 7000 হইতে 18000 মাইল বেগ সম্পন্ন করিলে উহা সুতায় বাধা ঢিলের মত অনন্তকাল পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিবে। এই অবস্থায় পৃথিবীর আকর্ষণ অর্থাৎ অভিকেন্দ্র বল যাহা বস্তুকে পৃথিবীর দিকে টানে এবং অপকেন্দ্র বল যাহা বস্তুকে মহাশূন্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করে, উহারা পরস্পরকে প্রশমিত করে বলিয়া বস্তুটি পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে না বা মহাশূন্যেও উধাও হয় না।

হাউই (rocket) বাজির নীচে আগুন দিলে উহার নিম্নদিক দিয়া প্রবলবেগে গ্যাস নির্গত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। সুতরাং বিপরীত প্রতিক্রিয়ার ফলে হাউই ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য রকেট নির্মিত হইয়াছে। রকেটের ভিতর জ্বালানি ও অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরক গ্যাস রকেটের নিম্ন দিক দিয়া বাহির হয়। উহারই প্রতিক্রিয়া রকেটের সহিত যুক্ত উপগ্রহকে ঊর্ধ্বে লইয়া যায়।



চিত্র 11 : তিনটি রকেটসহ উপগ্রহ।

ভূ পৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে যাওয়া যায় ততই বায়ুর ঘনত্ব কমে। সুতরাং বায়ুর ঘর্ষণজনিত তাপও কম হয়। বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া 17000 মাইল বেগে রকেট ছুটিলে বায়ুর ঘর্ষণজনিত প্রচণ্ড তাপে উহা গলিয়া যায়। সেইজন্য তিন পর্যায়ে তিনটি রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন বেগে উপগ্রহ ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়। প্রথম রকেট মাত্র 1700 মাইল বেগে 36 মাইল ঊর্ধ্বে উঠে। এই অল্প বেগের জন্য ঘর্ষণজনিত তাপ কম হয়। দ্বিতীয় রকেট উপগ্রহকে 140 মাইল

ঊর্ধ্বে লইয়া 10000 মাইল বেগ সম্পন্ন করে। তৃতীয় রকেট উপগ্রহকে বায়ুমণ্ডলে 560 মাইলের ঊর্ধ্বে সর্বশেষ স্তরে লইয়া উহাকে পার্শ্বে ধাক্কা দিয়া ঘণ্টায় 17000 মাইল বেগ সম্পন্ন করে। তখন উপগ্রহ রকেটের মাথা ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতে থাকে। প্রথম দুইটি রকেট অভিকর্ষের জন্য ভূ-পৃষ্ঠে নামিয়া আসে। তৃতীয় রকেট উপগ্রহের সঙ্গে ভূ-প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।

অনুশীলনী

1. মহাকর্ষের নিয়ম কি ?
2. অভিকর্ষ কাহাকে বলে ? কোন জিনিসের ওজন থাকে কেন ?
3. চন্দ্র অনন্তকাল ধরিয়া পৃথিবীর চারিদিকে কেন ঘোরে তাহা ব্যাখ্যা কর।
4. জোয়ার-ভাঁটার কারণ কি ? ভরা কটাল ও মরা কটাল কাহাকে বলে ?
5. হাউই কিরূপে ঊর্ধ্বে উঠে ?
6. কৃত্রিম উপগ্রহ কিরূপে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং কোন্ অবস্থায় উহা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এই বিষয়গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ পাঠ

কার্যকে সহজ করিবার সরল যন্ত্রপাতি

(Simple machines to make work easier)

24. যান্ত্রিক সুবিধা : কার্য করিতে হইলে কোন না কোন বাধা অতিক্রম করিতে হয়। সুতরাং কার্য করিতে কষ্ট হয় এবং আমরা ক্লান্তি বোধ করি। এই শারীরিক কষ্টের লাঘব করিবার জন্য ও কাযকে সহজ করিবার জন্য মানুষ বুদ্ধিবলে নানা কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে। এই কৌশলকে যন্ত্র বলে। বর্তমান যুগকে যান্ত্রিক যুগ বলে। যন্ত্র দ্বারা অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে ছোট-বড় বহু কার্য সম্পাদিত হয়। কূপ হইতে শুধু দড়ি দিয়া জল না তুলিয়া কপিকলের সাহায্যে জল তুলিলে, কোদাল দিয়া জমি কর্ষণ না করিয়া ট্রাক্টার দিয়া কর্ষণ করিলে, মাথায় ভারী বোঝা বহন না করিয়া কপিকল বা ক্রেন বা ঢালু তক্তা দ্বারা উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে, লাফ দিয়া

না উঠিয়া মইয়ের সাহায্যে উপরে উঠিলে কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে কার্য সম্পন্ন হয়। দূর স্থানে গমন করিবার জন্য পায়ে হাঁটার পরিশ্রমের দিন শেষ হইয়াছে। এখন যান্ত্রিক যানে চড়িয়া মানুষ জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাতায়াত করিতেছে। দাঁড় না থাকিলে হাত দিয়া নৌকা চালানো কত কষ্টসাধ্য হইত; গাড়ীতে চাকা না লাগাইয়া উহাকে মাটিতে ঘষিয়া টানিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়।

এইরূপ সব যন্ত্রে বল-প্রয়োগ দ্বারা বাধা অতিক্রম করিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট দিকে বল প্রয়োগ করিলে উহা সুবিধামত অন্য স্থানে অন্য দিকে প্রযুক্ত হয়। যন্ত্রের দ্বারা সাধারণতঃ তিন প্রকার সুবিধা পাওয়া যায়:—(i) অল্প বলের দ্বারা বিরাট বাধা অতিক্রম করা, (ii) মন্থর গতিকে দ্রুত গতিতে পরিণত করা, (iii) রৈখিক গতি ও কৌণিক গতির পরস্পর রূপান্তর। সরল যন্ত্রগুলি যথা—লিভার (lever), আনত তল (inclined plane) ও সরল কপি-কল (simple pulleys) দ্বারা প্রথম প্রকার সুবিধা পাওয়া যায়।

প্রযুক্ত বলকে **চেষ্টা** (effort or power) ও অতিক্রান্ত বাধাকে **ওজন** (weight or resistance) বলে। এই সকল যন্ত্রের দ্বারা আমরা যে সুবিধা পাই তাহাকে **যান্ত্রিক সুবিধা** (mechanical advantage) বলে। ওজন ও চেষ্টার অনুপাত দ্বারা যান্ত্রিক সুবিধা মাপা হয়।

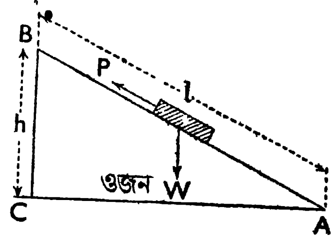
$$\therefore \text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{অতিক্রান্ত বাধা বা ওজন}}{\text{প্রযুক্ত বল বা চেষ্টা}} = \frac{W}{P}$$

$\frac{W}{P}$এর অনুপাত একের অপেক্ষা অধিক হইলে যান্ত্রিক সুবিধা হয়। অনুপাত একের অপেক্ষা কম হইলে যান্ত্রিক অসুবিধা হয়। মনে রাখিবে যন্ত্রে যতটুকু শক্তি দেওয়া হয় উহা তদতিরিক্ত শক্তি সরবরাহ করিতে পারে না।

25. নততল (Inclined plane): কোন মসৃণ সমতল যথা, তক্তা অনুভূমিক তলের সহিত আনত হইলে তাহাকে **নততল** বলে। যে কোন ঢালু জায়গা নততলের কার্য করিতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে একটি ভারী বস্তুকে উহার ওজন অপেক্ষা কম বল-প্রয়োগে উচ্চ স্থানে তোলা যায়।

মনে কর AB একটি নততল; উহা অনুভূমিক রেখা ACএর সহিত BAC কোণে অবস্থিত আছে।

মনে কর নততলের দৈর্ঘ্য $=l$; উচ্চতা $=\mathbf{h}$। P বল-প্রয়োগে W ওজনের ভারী বস্তুকে নততলের A হইতে একেবারে শেষ বিন্দু B পর্যন্ত তোলা হইল। বল দ্বারা কৃত কার্যের পরিমাণ = বল × দূরত্ব $= P \times l$. অন্য ভাবে দেখিলে মনে করা যায় যে W ওজনের ভারী বস্তুকে লম্বভাবে মাটির C বিন্দু হইতে শেষ বিন্দু B পর্যন্ত তোলা হইল। সুতরাং পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বাধার বিরুদ্ধে কৃত কার্যের পরিমাণ $= W \times \mathbf{h}$।



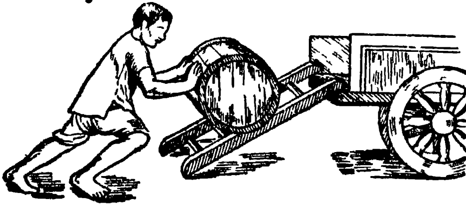
চিত্র 12 : নততল।

B বিন্দুতে দুই কার্যের পরিণতি এক অর্থাৎ B বিন্দু পর্যন্ত AB নততলের সাহায্যে বস্তুকে তোল বা BC লম্বভাবেই তোল, কার্যের পরিমাণ এক।

$$\therefore\ P \times l = W \times h$$

$$\therefore \frac{W}{P} = \frac{l}{h} \quad \therefore \text{ যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ওজন}}{\text{প্রযুক্ত বল}} = \frac{W}{P} = \frac{l}{h}.$$

h অপেক্ষা l সর্বদাই বড়। সুতরাং প্রযুক্ত বল অপেক্ষা ওজন বেশী অর্থাৎ, কম বল-প্রয়োগে অধিক ওজন তোলা যায়। এইজন্য কাঠের তক্তা ফেলিয়া মালগাড়ীতে মাল উঠানো হয়। পাহাড়ে উঠিতে আঁকাবাঁকা পথ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র 13 : আনততল দ্বারা মাল তোলা হইতেছে।

26. লিভার (Lever) : সরল বা বাঁকা শক্ত অনমনীয় দণ্ড যাহা একটি স্থির বিন্দুর চারিদিকে ঘুরিতে পারে তাহাকে **লিভার** বলে। লিভার স্থির বিন্দুতে দৃঢ়সংলগ্ন থাকে এবং ঐ স্থির বিন্দুকে **আলম্ব** (Fulcrum) বলে। আলম্বের একই দিকে বা দুই দিকে দুই বিন্দুতে ওজন বা বাধা, বল বা চেষ্টা এরূপভাবে প্রয়োগ করিতে হয় যে উহারা দণ্ডকে বিপরীত দিকে ঘুরাইতে চেষ্টা করে। আলম্ব-বিন্দু হইতে প্রযুক্ত বলের ও বাধার প্রয়োগ-বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে যথাক্রমে লিভারের **বল-বাহু** (arm) ও **ওজন-বাহু** বলে।

মনে কর AB একটি লিভার, C উহার আলম্ব-বিন্দু, উহার দুই দিকে A ও B বিন্দুতে যথাক্রমে বল ও ওজন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

P বল কর্তৃক কৃত কার্য $= P \times AC$

W ওজন " " " $= W \times BC$

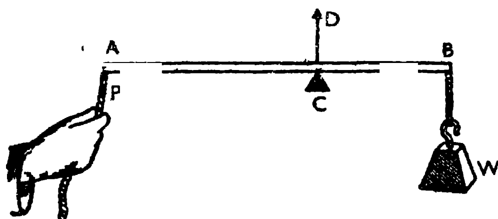
বলের ভ্রামকের (moment of forces) নিয়ম অনুযায়ী এই ভ্রামকদ্বয় পরস্পর সমান।

$$\therefore \quad P \times AC = W \times BC \quad \therefore \frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$$

যান্ত্রিক সুবিধা $\frac{W}{P} = \frac{AC}{BC}$.

27. লিভারের শ্রেণী বিভাগ ঃ বলের ও বাধার প্রয়োগ-বিন্দুর আপেক্ষিক অবস্থানের জন্য লিভারকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা :

(ক) **প্রথম শ্রেণীর লিভার ঃ** এই শ্রেণীর লিভারের মাঝখানে আলম্ব, আলম্বের একপাশে বাধা ও অপর পাশে বল ক্রিয়া করে। প্রযুক্ত বল যে দিকে



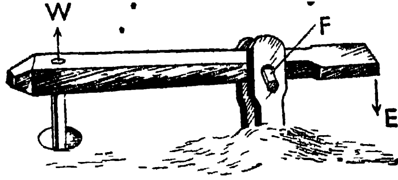
চিত্র 14 : প্রথম শ্রেণীর লিভার।

ক্রিয়া করে প্রতিরোধের বল বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। মনে কর, AB লিভারের P বলের প্রয়োগ-বিন্দু A, W বাধার প্রয়োগ-বিন্দু B এবং C আলম্ব।

সুতরাং উহার যান্ত্রিক সুবিধা $= \frac{W}{P} = \frac{\text{বল-বাহু}}{\text{ওজন-বাহু}}$

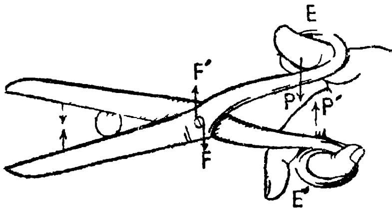
আলম্ব-বিন্দু হইতে বল-বাহু ও ওজন-বাহুর দূরত্ব ইচ্ছামত বাড়ানো বা কমানো যায়। AC বৃহত্তর হইলে কম বল-প্রয়োগে অধিক ওজন উঠানো যায়। AC ক্ষুদ্রতর হইলে কম ওজনের জন্য বেশী বল-প্রয়োগ দরকার হয়।

মাটি কাটার কোদাল, কয়লা তুলিবার বেল্‌চা, দাঁড়িপাল্লার দণ্ড, ঢেঁকি, হাত-পাম্পের হাতল, পেরেক তুলিবার হাতুড়ি (claw-hammer), চাড় দিয়া

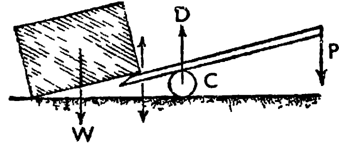


চিত্র 15 : ঢেঁকি।

তুলিবার শাবল—প্রথম শ্রেণীব লিভার। কাঁইচি ও সাঁডাশিতে প্রথম শ্রেণীর দুইটি লিভাব একসঙ্গে কাজ করে।

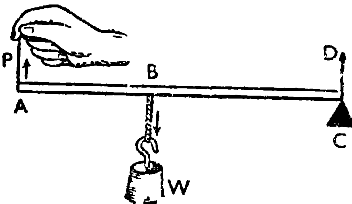


চিত্র 16 : কাইচি।



চিত্র 17 : লিভারের সাহায্যে ভারোত্তোলন।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার : এই শ্রেণীর লিভারে এক প্রান্তে আলম্ব এবং অপর প্রান্তে বল এবং মধ্যে যে কোন স্থানে ওজন ক্রিয়া করে। সুতরাং এই শ্রেণীতে ওজন-বাহু AB অপেক্ষা বল-বাহু AC বৃহত্তর হয়।



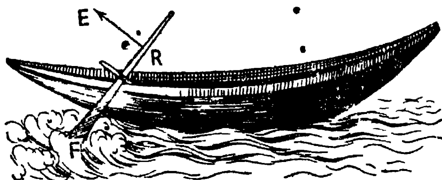
চিত্র 18 : দ্বিতীয় শ্রেণীব লিভার।



চিত্র 19 . এক চাকাব হাতগাড়ী।

সেইজন্য উহার যান্ত্রিক সুবিধা $=\frac{AC}{BC}$। উহা একের চেয়ে বেশী অর্থাৎ কম বল-প্রয়োগে অধিক বাধা অতিক্রম কবা যায়।

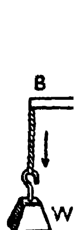
এক চাকার হাতগাড়ী (wheel barrow), চলন্ত নৌকার দাঁড় (দাঁড়ের



চিত্র 20 : চলন্ত নৌকার দাঁড়।

জল-মধ্যস্থিত প্রান্ত আলম্ব), কর্ক ছোট কবার যন্ত্র—দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার। জাঁতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি লিভার এক সঙ্গে কাজ করে।

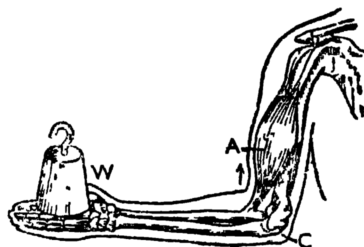
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর লিভারঃ এই শ্রেণীর লিভারে এক প্রান্তে থাকে, অপব প্রান্তে ওজন ক্রিয়া করে। উহাদেব মধ্যে যে কোনও স্থানে বাধা ক্রিয়া করে। উহাদের ক্রিয়া বিপরীতমুখী। এই শ্রেণীতে বল-বাহু AC সর্বদা বাধা-বাহু AB হইতে ক্ষুদ্রতর হয়। সুতরাং উহার যান্ত্রিক সুবিধা



চিত্র 21 : তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

$\frac{AC}{BC}$ এই যন্ত্রে একের চেয়ে কম অর্থাৎ বেশী বল-প্রয়োগে কম বাধা অতিক্রম করা যায়। এই যান্ত্রিক অসুবিধা সত্ত্বেও এই শ্রেণীর লিভারে অন্য সুবিধা পাওয়া যায়।

কয়লা, ছাই, বালি প্রভৃতি তুলিবার বেল্‌চা (shovel), পিয়ানোর প্যাদানি, সাইকেলের পাদানি—তৃতীয় শ্রেণীর লিভার। চিম্‌টা ও বেড়িতে তৃতীয় শ্রেণীর দুইটি লিভার কাজ করে। যখন হাতের তালুতে কোন ভারী জিনিস রাখিয়া কনুইয়ের উপর ভর (W) দিয়া উহাকে তোলা হয় তখন কনুই হইতে হাতের

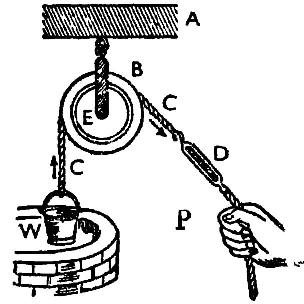


চিত্র 22 : হাতের হাড় তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

মুঠি পর্যন্ত অস্থি তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের কাজ করে। এই ক্ষেত্রে কনুই (C) আলম্ব। পেশীর সংকোচন (A) বল প্রয়োগ করে।

এই তিন শ্রেণীর লিভার বহু যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।

28. কপিকল (Pulleys): কপিকল একটি কাঠের বা ধাতুর গোল চাকা B। উহা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি E অক্ষের চারিদিকে ঘোরে। অক্ষটি একটি A কাঠামোতে (block) আটকানো থাকে। কাঠামো স্থির বা সচল হইতে পারে। চাকার পরিধিতে খাঁজকাটা থাকে। খাঁজের মধ্য দিয়া C দড়ি অতিক্রম করাইলে উহা এদিক-ওদিক সরিয়া যায় না। দড়ির একপ্রান্তে ওজন W বাঁধা থাকে। অপর প্রান্তে P বলপ্রয়োগ করিয়া ওজন তোলা হয় (চিত্র 23)।



চিত্র 23 : স্থির কপিকল।

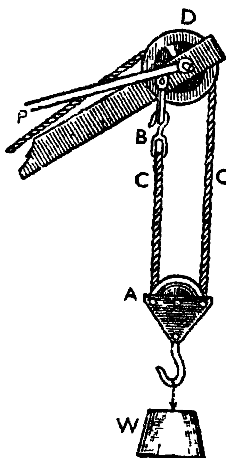
কপিকল প্রথম শ্রেণীর লিভারের কাজ করে। অক্ষের কেন্দ্র আলম্ব। চাকার ব্যাসের দুই প্রান্তে বল P ও ওজন W ক্রিয়া করে। সুতরাং চাকার দুই ব্যাসার্ধই দুই বাহু। গণিত অনুসারে P×চাকার ব্যাসার্ধ=W×চাকার ব্যাসার্ধ। চাকার ব্যাসার্ধ সমান। ∴ যান্ত্রিক সুবিধা$=\frac{W}{P}=1$

একটি কপিকলে যান্ত্রিক সুবিধা নাই। উহার সাহায্যে যতটা ওজন তোলা হয় ঠিক ততটা বল প্রয়োগ করিতে হয়।

যান্ত্রিক সুবিধার পরিবর্তে উহা হইতে অন্য তিনটি সুবিধা পাওয়া যায় যথা:—(i) দড়িটা নীচের দিকে টানিতে হয় বলিয়া উহার ব্যবহারে কষ্টের লাঘব হয়। কূপ হইতে সোজা দড়ি টানিয়া জলপূর্ণ বালতি তুলিতে খুব কষ্ট হয় কিন্তু কপিকলের সাহায্যে সহজে জল তোলা যায়। (ii) কপিকলে নিম্নদিকে বল প্রয়োগ করিতে হয় বলিয়া টানার শক্তি ও দেহের সমস্ত ভার এক সঙ্গে নীচের দিকে ক্রিয়া করে। (iii) মাটিতে দাঁড়াইয়া কোন জিনিস উপরে তোলা যায় বা এদিক-ওদিক সরানো যায়। কপিকলের সাহায্যে পরদা সরানো যায়, পাখা টানা যায়, বড় আলো ঝুলানো যায়।

চলনশীল কপিকলে একাধিক কপিকল থাকে। 24নং চিত্রে দুইটি কপিকল

দেখানো হইয়াছে। A কপিকল চলনশীল। উহার কাঠামোতে W ওজন বাধা আছে। D কপিকল স্থির। C দড়ির এক প্রান্ত B কাঠামোতে আটকানো আছে। দড়িকে প্রথমে চলনশীল A কপিকল পরে স্থির D কপিকলের উপর দিয়া লইয়া উহার অপর প্রান্ত বাহির করিয়া আনা হয়। এই প্রান্তে টান দিয়া অর্থাৎ বল-প্রয়োগ করিয়া ওজন তোলা হয়। W ওজনটি চলনশীল কপিকলের দুই ধারের C দড়ির ঊর্ধ্বমুখী টান T (tension) দ্বারা ভারসাম্যে থাকে, $2T=W$; আবার একই দড়ির টান T সর্বত্র সমান এবং দড়ির টান বলের সমান, সুতরাং $T=P$.



চিত্র 24 : কপিকল।

$$2P=W$$

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{W}{P} = 2.$$

দুইটি কপিকলের সাহায্যে যে কোন বল প্রয়োগে তাহার দ্বিগুণ ওজন তোলা যায়।

অনুশীলনী

1. 'যন্ত্র' বলিতে কি বুঝ কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা কর। 'যান্ত্রিক সুবিধা' ব্যাখ্যা কর।

2. নততল কাহাকে বলে? উহার যান্ত্রিক সুবিধা কি কি?

3. 'লিভারে'র সংজ্ঞা বল। লিভার কয় শ্রেণীর হয়? প্রত্যেক শ্রেণীর তিনটি করিয়া উদাহরণ দাও।

4. চিত্রের সাহায্যে কপিকল বর্ণনা কর। একটি কপিকলের যান্ত্রিক সুবিধা আছে কি?

5. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি কোন্ শ্রেণীর লিভারের অন্তর্গত বল :—

(i) মাটি কাটা কোদাল, (ii) কাঁইচি, (iii) সাঁড়াশি, (iv) ঢেঁকি, (v) জাঁতি, (vi) দাঁড়িপাল্লা, (vii) চলন্ত নৌকার দাঁড়।

6. কম বল-প্রয়োগে অধিক ওজনের বস্তু তোলার যন্ত্রগুলি বল।

প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে Objective Type প্রশ্ন

1. **Recall Type :** ডান দিকের শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(ক) যাহা দ্বারা বস্তুর মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় তাহার নাম —

(খ) যে কোন দুই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের নাম —

2. **Completion Type :** শূন্য স্থান পূরণ করিয়া উক্তি সম্পূর্ণ কর :— বাহির হইতে প্রযুক্ত —(1) দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন করিতে —(2) না হইলে —(3) বস্তু — (4) ও — (5) অবস্থাতেই থাকিবে এবং —(6) বস্তু চিরকাল — (7) সরল রেখায় চলিবে।

—(1),—(2),—(3),—(4),—(5),—(6),—(7)

3. **Alternate Response Type : True or False Type :** নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কতকগুলি সত্য, কতকগুলি ভুল। সত্য উক্তির গায়ে T এবং ভুল উক্তির গায়ে F লিখ :—

(ক) বস্তু আপনা হইতেই চলিতে পারে। (খ) ঘর্ষণ কোন বস্তুর গতিকে বাধা দেয়। (গ) প্রত্যেক শ্রেণীর লিভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়। (ঘ) কপিকল ব্যবহারে আমাদের শক্তির লাঘব হয়। (ঙ) বস্তুর অভিকর্ষজাত ত্বরণ বস্তুর ওজনের ওপর নির্ভর করে। (চ) ভারী ও হাল্কা সকল বস্তুর বেলায় অভিকর্ষজাত ত্বরণ সমান। (ছ) পৃথিবীর কেন্দ্রে সকল বস্তু ওজনশূন্য। (জ) অমাবস্যা তিথিতে ভরা কটাল হয়। (ঝ) অষ্টমী তিথিতে সমুদ্রে জোয়ার হয় না। (ঞ) মার্কিন বৈজ্ঞানিক প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ছোড়েন।

4. **Yes or No Type :** নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যেটির উত্তর **হাঁ** হইবে তাহার গায়ে Y এবং যেটির উত্তর **না** হইবে তাহার গায়ে N লিখ।

(ক) পৃথিবীর আকর্ষণ কি কার্যকে কঠিন করে? (খ) স্থির বস্তুর কি জাড্য থাকে? (গ) কাঁইচি কি দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার? (ঘ) মসৃণ তল অপেক্ষা অমসৃণ তল কি অধিক বাধা দেয়? (ঙ) চন্দ্রের আকর্ষণের জন্যই কি সমুদ্রের জোয়ার হয়? (চ) পূর্ণিমাতে কি মরা কটাল হয়? (ছ) উপগ্রহ কি গ্রহের চারিধারে ঘোরে? (জ) কোন বস্তু ওজনশূন্য অবস্থায় থাকে কি? (ঝ) কোন বস্তুকে উত্তর মেরু হইতে বিষুবরেখাতে লইলে ওজন বাড়িবে কি? (ঞ) গতিশীল বস্তুর জাড্য থাকে কি? (ট) যন্ত্রের দ্বারা অধিক শক্তি লাভ করা যায় কি? (ঠ) কৃতকার্য কি প্রযুক্ত বল ও বলের প্রয়োগ বিন্দুর

অপসারণের দূরত্বের গুণফলের সমান? (ড) নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র কি বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যে প্রযোজ্য?

5. **Association Type :** :: এই চিহ্নের বাম দিকের দুইটি কথার যে সম্পর্ক ডান দিকের দুইটি কথারও সেই সম্পর্ক। সম্পর্ক বজায় রাখিয়া ডান্ দিকের শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) অভিকর্ষ : পৃথিবী :: মাধ্যাকর্ষণ : —

(ii) আনত তলের দৈর্ঘ্য : উচ্চতা :: উত্তোলিত ভার : —

6. **Multiple Choice :** কোন্ উত্তরটি ঠিক বল :—

(i) নির্দিষ্ট অভিমুখে কোন বস্তুর পরিবর্তনের হারকে বলে—দ্রুতি; বেগ, ত্বরণ। (ii) পার্থিব সকল বস্তুর উপর অভিকর্ষজ ত্বরণ সমান; উহা প্রমাণ করেন—নিউটন, টরিসেলি, গ্যালিলিও। (iii) বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কি প্রয়োগ করিতে হয়? শক্তি, বল, বেগ। (iv) জোয়ার ভাঁটা কিসের উপর অধিক নির্ভর করে? পৃথিবীর কেন্দ্রাভিগ বল, সূর্যের আকর্ষণ, চন্দ্রের আকর্ষণ। (v) কোন বস্তুর কার্য করিবার সামর্থ্যকে কি বলে? কার্য, শক্তি, ক্ষমতা। (vi) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ কি? শাবল, নৌকার দাঁড, মানুষের হাত।



দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোক (Light)

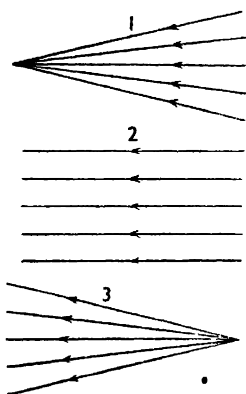
প্রথম পাঠ

আলোক সরল রেখায় গমন করে (Light travels in a straight line), ছায়া (Shadows), গ্রহণ (Eclipses)

29. **আলোকের প্রকৃতি ও গতি :** আলোক এক প্রকার শক্তি। উহা আমাদের চোখের পর্দায় পতিত হইয়া স্নায়ুর দ্বারা আমাদের দর্শনানুভূতিকে জাগ্রত করে। আলোকের উৎস যথা প্রদীপের শিখা হইতে আলোক তরঙ্গের আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই তরঙ্গগুলি প্রতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল বেগে ছুটিয়া যায়। কিন্তু শব্দ-তরঙ্গ এক সেকেণ্ডে মাত্র 332 মিটার যায়। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো পৌছাইতে আট মিনিট সময় লাগে। সমস্ত শক্তির ন্যায় আলোকশক্তিও নিজে অদৃশ্য। কোন বস্তু আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হইলে আমরা তাহাকে দেখিতে পাই। ধূলিশূন্য অন্ধকার ঘরে কোন ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক প্রবেশ করিলে রশ্মির পথ দেখা যায় না। ঘরে ধূলি উড়াইয়া দিলে ধূলিকণা হইতে বিক্ষিপ্ত আলোকে আমরা রশ্মির পথ দেখি। আলোক-তরঙ্গ যে শব্দ-তরঙ্গের চেয়ে অধিক দ্রুতগামী তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় :—(i) দুই মাইল দূরে কালবৈশাখীর আকাশে একসঙ্গেই বজ্রধ্বনি হইলে ও বিদ্যুৎ চমকাইলে আমরা 0·0000108 সেকেণ্ড পরে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলো দেখিতে পাই কিন্তু 10 সেকেণ্ড পরে বজ্রের ধ্বনি শুনিতে পাই। (ii) বৃহৎ দীঘির এক পাড়ে ধোপা আছড়াইয়া কাপড় কাচিলে অপর পাড়ে কাপড় কাঠে পড়িবার একটু পরে শব্দ শোনা যায়।

আলোকতরঙ্গের পথকে **আলোকরশ্মি** (Ray) বলে। আলোকরশ্মির সমষ্টিকে **রশ্মিগুচ্ছ** (Beam or Pencil) বলে। বহু দূর হইতে যেমন সূর্য হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল (চিত্র 25-2) ধরা হয়। আলোকের উৎস হইতে বহির্গত রশ্মিগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই রশ্মিগুচ্ছকে **অপসারী** (divergent-3) **রশ্মিগুচ্ছ** বলে। যখন কতকগুলি রশ্মি একটি বিন্দুতে মিলিত হয় তখন রশ্মিগুচ্ছকে **অভিসারী** (convergent-1) **রশ্মিগুচ্ছ** বলে।

যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক সহজে অতিক্রম করে তাহাদিগকে **স্বচ্ছ** (transparent) বস্তু বলে; যথা কাচ, জল, বায়ু। যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক মোটেই অতিক্রম করে না তাহাদিগকে **অস্বচ্ছ** (opaque) বস্তু বলে; যথা কাঠ, বই। যে সকল বস্তুর মধ্য দিয়া আলোক আংশিকভাবে অতিক্রম করে তাহাদিগকে **ঈষদচ্ছ** (translucent) বলে; যথা তৈলাক্ত কাগজ। স্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়া অন্য বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। অস্বচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়া অন্য বস্তু মোটেই দেখা যায় না। ঈষদচ্ছ বস্তুর মধ্য দিয়া অন্য বস্তু অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। যে বস্তুর বা স্থানের মধ্য দিয়া আলোক গমন করে তাহাকে আলোকের **মাধ্যম** (medium) বলে।

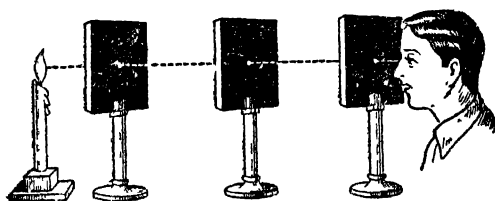


চিত্র 25: বিভিন্ন রশ্মিগুচ্ছ।

30. আলোক সরলরেখায় গমন করে: একই মাধ্যমে আলোক সরল রেখায় গমন করে, উহা কখনও বাঁকিয়া চলে না। যদি কোনও কারণে আলোকের পথের পরিবর্তন হয় (যেমন প্রতিসরণে), তবে নূতন পথেও উহা সরল রেখায় গমন করে। নিম্নলিখিত ঘটনা ও পরীক্ষা দ্বারা আলোকের ঋজু গমন প্রমাণ করা যায়:—

(i) দিনের বেলায় অন্ধকার ঘরের জানালার ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক প্রবেশ করিলে উহার পথকে সরল দেখায়। টর্চের আলোর গতি দেখিয়া বুঝা যায় যে আলোক সরলরেখায় গমন করে।

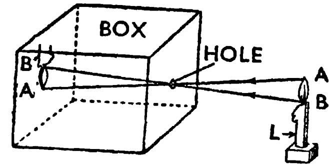
(ii) **কার্ডবোর্ডের পরীক্ষা:** তিনটি সমান আকৃতি বিশিষ্ট কাঠের পর্দার


চিত্র 26: আলোক রশ্মি সরল পথে গমন করে।

ঠিক মাঝখানে একই উচ্চতায় একটি করিয়া ছোট ছিদ্র কর। একটি আলোর

শিখার সম্মুখে একই দিকে তিনটি পর্দা পর পর খাড়া অবস্থায় এমনভাবে রাখ যেন শেষের পর্দার পশ্চাতে চোখ রাখিলে আলো দেখা যায়। এখন একটি সরল দণ্ড দ্বারা তিনটি ছিদ্র যোগ করিলে দেখা যায় ছিদ্র তিনটি একই সরল রেখায় অবস্থিত। এইবার যে কোন একটি পর্দা একটু এপাশ-ওপাশ করিলে আলোক-রশ্মি বিচ্ছিন্ন হয় এবং শিখা দেখা যায় না। আলোক-রশ্মি বাঁকা পথে চলিলে পর্দা ঘুরিয়া চোখে পড়িত।

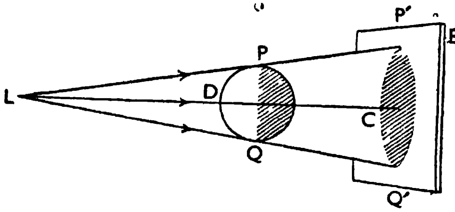
(iii) **সূচীছিদ্র ক্যামেরা** (Pin-hole Camera) : নিম্নলিখিত উপায়ে একটি সূচীছিদ্র ক্যামেরা প্রস্তুত কর। চারিদিক ঘেরা আয়তক্ষেত্রিক বাক্সের সম্মুখ দেওয়ালে একটি ছিদ্র কর এবং পশ্চাতের দেওয়ালে ঘষা কাচের পর্দা রাখ। আলোকের প্রতিফলন বন্ধ করিবার জন্য বাক্সের ভিতরের দেয়ালগুলিতে কালো রং কর। ছিদ্রের সম্মুখে একটি জ্বলন্ত বাতি রাখ। বাতির শিখার প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মনে কর শিখার A ও B বিন্দু হইতে দুইটি রশ্মি সরল রেখায় সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া ঘষাকাচের পর্দায় যথাক্রমে A′ ও B′ বিন্দুতে পড়ে। সুতরাং শিখার সর্বোচ্চ বিন্দু A ও সর্বনিম্ন বিন্দু B প্রতিবিম্বের যথাক্রমে সর্বনিম্ন বিন্দু A′ ও সর্বোচ্চ বিন্দু B′ হইল। উহাদের মধ্যবর্তি সকল অংশ হইতে আলোক-রশ্মি ছিদ্রের মধ্য দিয়া গমন করিয়া A′ ও B′-এর মধ্যে পড়ে। ফলে ঘষাকাচে শিখার একটি উল্টা প্রতিবিম্ব পড়ে। আলোক-রশ্মি সরলরেখায় চলে বলিয়া রশ্মিগুলি ছিদ্রে পরস্পরকে ছেদ করে। উহাতে উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। আলোক-রশ্মি সরলরেখায় গমন না করিলে শিখায় উল্টা প্রতিবিম্ব গঠিত হইত না। উহাই ফটোগ্রাফির মূলকথা।



চিত্র 27 : সূচীছিদ্র ক্যামেরা।

দ্রষ্টব্য : (1) বড় ছিদ্র কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রের সমষ্টি। সুতরাং ছিদ্র বড় করিলে প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশের মধ্য দিয়া উৎপন্ন স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পরস্পরের উপর পড়িয়া অস্পষ্ট হয়; সেইজন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রের ব্যবস্থা। (2) পর্দা স্বস্থানে রাখিয়া লক্ষ্যবস্তুকে দূরে সরাইলে প্রতিবিম্ব আকারে ছোট হয়। (3) আবার লক্ষ্যবস্তুকে যথাস্থানে রাখিয়া পর্দাকে দূরে সরাইলে প্রতিবিম্ব আকারে ছোট হয়। আলোক সরলরেখায় গমন করে বলিয়া এইরূপ হওয়া সম্ভব।

(iv) **ছায়া** (Shadow) : আলোক-রশ্মি সরলরেখায় গমন করে বলিয়া উহারা অস্বচ্ছ বস্তুর বাধা অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং অস্বচ্ছ বস্তুর পশ্চাতের স্থান অন্ধকারময় হয়। এই অন্ধকারময় স্থানকে **ছায়া** বলে। আলোক বাঁকা পথে চলিলে এই অন্ধকার স্থানও আলোকিত হইত।

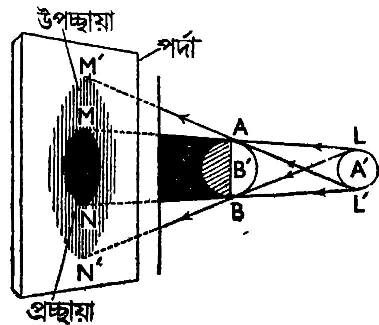


চিত্র 28 : ছায়ার উৎপত্তি।

আলোকের উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তুর আপেক্ষিক আয়তনের উপর ও বস্তু হইতে পর্দার দূরত্বের উপর ছায়ার আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে।

(ক) **আলোকের উৎস বিন্দুবৎ** (Point Source) : মনে কর L আলোকের উৎস, D অস্বচ্ছ বস্তু এবং E পর্দা। L হইতে আলোক-রশ্মি চারিদিকে গমন করে। যে সকল রশ্মি D-এর কিনারা স্পর্শ করিয়া যায় (যেমন LP, LQ) তাহারা আলোক-শঙ্কু (cone of light) উৎপন্ন করে। এই শঙ্কুর মধ্যবর্তী সকল রশ্মিই D দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং পর্দায় গোলাকার C ছায়া উৎপন্ন হয়। ছায়ার আকার অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর হয়। পর্দা দূরে সরাইলে ছায়ার আকার বৃদ্ধি পায় কিন্তু উহা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয় (চিত্র 28)।

(খ) **আলোকের উৎস বিস্তৃত কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু বৃহত্তর** (Extended source but smaller than the obstacle) : মনে কর A′ আলোকের উৎস, B′ গোলাকার অস্বচ্ছ বস্তু। A′ উৎস পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলি আলোক বিন্দুর সমষ্টি ধরা যায়। A ও B বস্তু B′ এর দুইটি প্রান্তীয় বিন্দু। উৎসর L বিন্দু হইতে আগত LA ও LB রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন আলোক-শঙ্কু B′ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া পর্দায় MN′ ছায়া উৎপন্ন করে। একই ভাবে L′

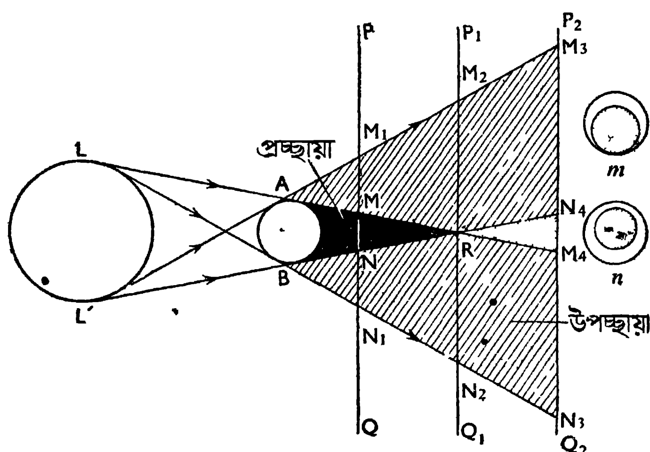


চিত্র 29 : প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া।

বিন্দু হইতে আগত L′A ও L′B রশ্মি দ্বারা উৎপন্ন আলোক-শঙ্কু AB দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া পর্দায় M′N ছায়া উৎপন্ন করে। পর্দায় MN অংশ উৎস হইতে

আদৌ আলো পায় না। সেইজন্য এই অংশ সম্পূর্ণ গাঢ় অন্ধকারে থাকে, উহাকে **প্রচ্ছায়া** (Umbra) বলে। MM′ ও N′N অংশ উৎসর কিছু আলোক পায়। উহারা আংশিক অন্ধকারে থাকে। উহাদিগকে **উপচ্ছায়া** (Penumbra) বলে। . AB বস্তু ও পর্দার দূরত্ব বাড়াইলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া আকারে বড় হয় কিন্তু অস্পষ্ট হয় (চিত্র 29)।

(গ) **আলোকের উৎস বিস্তৃত কিন্তু অস্বচ্ছ বস্তু ক্ষুদ্রতর** (Extended source but greater than the obstacle) : মনে কর LL′ আলোকের উৎস, AB অস্বচ্ছ বস্তু, PQ, P_1Q_1, P_2Q_2 পর্দার বিভিন্ন অবস্থান। বিস্তৃত আলোক LL′ কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর সমষ্টি ধরা যায়।



চিত্র 30 : বিস্তৃত উৎস, ক্ষুদ্রতর বস্তু।

প্রত্যেক বিন্দু হইতে আগত রশ্মি অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া পর্দায় ছায়া উৎপন্ন করে। পূর্বের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও প্রথম পর্দায় M_1M ও NN_1 অংশে উপচ্ছায়া এবং MN অংশে প্রচ্ছায়া উৎপন্ন হয়। আলোকের উৎস গোলাকার বলিয়া প্রচ্ছায়া শঙ্কু আকৃতির হয়।

পর্দাটি ক্রমশঃ দূরে সরাইলে প্রচ্ছায়া ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতব এবং উপচ্ছায়া ক্রমশঃ বৃহত্তর হয়। পর্দাকে P_1Q_1 অবস্থানে লইয়া যাইলে প্রচ্ছায়া বিন্দুতে পরিণত হয় অর্থাৎ সমস্ত ছায়া উপচ্ছায়া হয়। ABR অংশকে প্রচ্ছায়া শঙ্কু (umbral cone) বলে। পর্দাকে আরও দূরে P_2Q_2 অবস্থানে লইয়া যাইলে উপচ্ছায়া আকারে বাড়িবে। এখানে

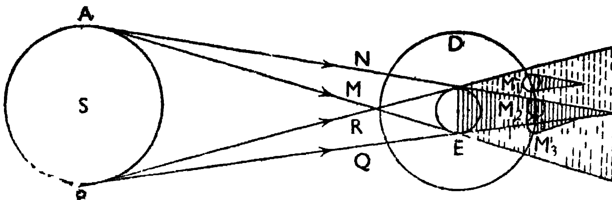
কোন প্রচ্ছায়া থাকিবে না। কিন্তু R বিন্দু হইতে একটি বিপরীত শঙ্কু উৎপন্ন হয়। পর্দার তৃতীয় অবস্থানের M_4N_4 অংশ LL′ উৎসর বাহিরের অংশ হইতে আলোক পাইবে কিন্তু উৎসর মধ্যাংশ হইতে কোন আলোক পাইবে না। সুতরাং M_4N_4 অংশ হইতে উৎসর দিকে তাকাইলে বলয়ের মত উহার মাঝখানটা অন্ধকার ও উহার চতুর্দিক আলোকিত দেখাইবে। চিত্রে পর্দায় RMN শঙ্কুর বাহিরে উপচ্ছায়া পড়িবে। এই অংশ হইতে উৎসকে চিত্রে m-এর মত দেখায়। পর্দাকে আরও সরাইলে উপচ্ছায়া বড় হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের গাঢ়তা কমে। পর্দাকে বহু দূরে লইলে আলো ও ছায়ার পার্থক্য বোঝা যায় না। এরোপ্লেন বা পাখী নীচু দিয়া উড়িলে মাটিতে ছায়া পড়ে কিন্তু ঊর্ধ্বে উড়িলে মাটিতে ছায়া পড়ে না।

(ঘ) উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তু সমান আকৃতির হইলে প্রচ্ছায়া বস্তুর সমান আকৃতির হয়।

31. গ্রহণ (Eclipse): আলোক-রশ্মির ঋজু গমনের আকৃতির দৃষ্টান্ত গ্রহণের উৎপত্তি।

সূর্য হইতে আলোক-রশ্মি চন্দ্র ও পৃথিবীতে পড়ে। চন্দ্র ও পৃথিবী অস্বচ্ছ ও নিষ্প্রভ গোলাকার বস্তু। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে এবং চন্দ্রকে লইয়া পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘোরে। এইরূপ ঘোরাঘুরির সময় যখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে আসে তখন চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া পড়ে। উহাকে **চন্দ্রগ্রহণ** (Lunar eclipse) বলে। আবার যখন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে আসে তখন চন্দ্র সূর্যকে আড়াল করিয়া দেয়, পৃথিবী হইতে সূর্যকে দেখা যায় না। উহাকে **সূর্যগ্রহণ** (Solar eclipse) বলে।

(i) চন্দ্রগ্রহণ: পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে আসে।

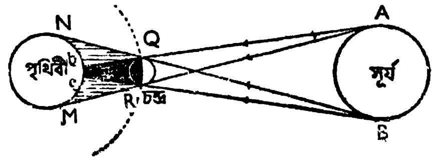


চিত্র 31 : চন্দ্রগ্রহণ।

সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়। উহারা উভয়েই গোলাকার। সেইজন্য পৃথিবীর

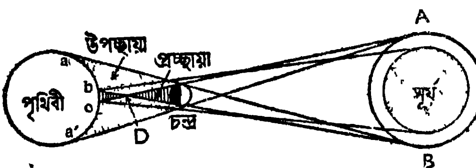
ছায়ায় প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া শঙ্কুর উৎপত্তি হয়। ছায়ার মাঝখানে প্রচ্ছায়া। যখন চন্দ্র প্রচ্ছায়ায় আসিয়া পড়ে তখন চন্দ্রগ্রহণের **পূর্ণগ্রাস** (Total eclipse) হয় (চিত্রে M_2 অবস্থান)। চন্দ্রের কতকাংশ প্রচ্ছায়ায় ও কতকাংশ উপচ্ছায়ায় থাকিলে চন্দ্রের **খণ্ডগ্রাস** (Partial eclipse) হয় (চিত্রে M_3 অবস্থান)। খণ্ডগ্রাসে প্রচ্ছায়ার অন্তর্গত অংশেই গ্রহণ হয়। চন্দ্রের সমস্ত অংশ উপচ্ছায়ায় থাকিলে চন্দ্রে কোন গ্রহণ হয় না। চন্দ্রে সূর্যের একাংশ হইতে আলোক পড়ে বলিয়া এখানে চন্দ্রের উজ্জ্বলতা কম। পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার দৈর্ঘ্য পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং চন্দ্র প্রচ্ছায়ার বাহিরে যায় না বলিয়া উহার বলয়গ্রাস সম্ভব হয় না।

(ii) **সূর্যগ্রহণ**: অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে। সূর্য হইতে আলোক-রশ্মি চন্দ্রে বাধা পাইয়া পৃথিবীতে পড়ে না। পৃথিবী সূর্য হইতে বহুদূরে অবস্থিত এবং আয়তনে অনেক ক্ষুদ্রতর। আবার চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। সেইজন্য চন্দ্রের ছায়াও ক্ষুদ্র হয়। বৃহৎ পৃথিবীর সামান্য অংশ (bc) চন্দ্রের প্রচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে। পৃথিবীর এই অংশ হইতে সূর্যকে মোটেই দেখা যায় না। এই অংশে সূর্যের **পূর্ণগ্রাস গ্রহণ** হয়। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের উপচ্ছায়ার মধ্যে পড়ে সেই অংশ হইতে সূর্যকে আংশিক দেখা যায়। এই অংশে **খণ্ডগ্রাস** সূর্যগ্রহণ হয়।



চিত্র 32 : সূর্যগ্রহণ।

33 নং চিত্রে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া D বিন্দুতে শেষ হইয়া পুনরায় বিপরীত শঙ্কু উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর bc অংশ হইতে সূর্যের মধ্যভাগে একটি অন্ধকারময় গোলাকার অংশ এবং উহার চতুর্দিকে আলোকিত বলয় দেখা যায়। মধ্যের বৃত্তাকার অংশকে **বলয়-গ্রাস** (annular eclipse) বলা হয়। bc অংশের বাহিরের উপচ্ছায়া হইতে খণ্ডগ্রাস দেখা যায়।



চিত্র 33 : বলয় গ্রহণ।

চন্দ্র পৃথিবীর নিকটে আসিলে ও সূর্য দূরে যাইলে সূর্যের পূর্ণগ্রাস হয়। চন্দ্র দূরে যাইলে ও সূর্য নিকটে আসিলে সূর্যের খণ্ডগ্রাস হয়।

পৃথিবীর কক্ষতলের ও চন্দ্রের কক্ষতলের মধ্যে 5° ব্যবধান। উহারা দুই বিন্দুতে ছেদ করে। যে পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় চন্দ্র এই ছেদ-বিন্দুতে বা উহার নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকে শুধু সেই পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ও সেই অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয়।

অনুশীলনী

1. আলোকের সরলরেখায় গমনের কয়েকটি প্রমাণ দাও।

2. চিত্রের সাহায্যে একটি সূচী ছিদ্র ক্যামেরার গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

3. কিরূপে ছায়ার উৎপত্তি হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

4. চিত্রসহ অবস্থাগুলির ব্যাখ্যা কর :—(i) আলোকের উৎস অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর। (ii) আলোকের উৎস অস্বচ্ছ বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

5. গ্রহণের কারণ কি ? চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

6. সূর্যের কয় প্রকার গ্রহণ হয় ?

7. ব্যাখ্যা কর :—(i) পাখী খুব উঁচু দিয়া উড়িলে মাটিতে ছায়া পড়ে না কেন ? (ii) প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ বা প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন ? (iii) চন্দ্রের বলয়গ্রাস হয় না কেন ?

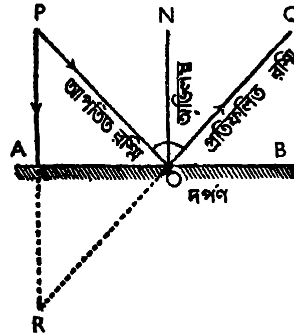


দ্বিতীয় পাঠ

আলোকের প্রতিফলন (Reflection of Light)

সমতলে প্রতিফলন (Reflection at plane surfaces)

32. প্রতিফলন : আলোক-রশ্মি সরল রেখায় এক সমসত্ত্ব* (homogeneous) মাধ্যমের মধ্য দিয়া গমন করিয়া দ্বিতীয় মাধ্যমের মসৃণ ও সমতল পৃষ্ঠে (যথা আয়না, চক্চকে ধাতুর পাত) পতিত হইলে উহা দুই নিয়মে প্রথম মাধ্যমেই ভিন্ন দিকে সরল রেখা পথে ফিরিয়া যায়। এই ঘটনাকে **প্রতিফলন** বলে। মসৃণ পৃষ্ঠকে **প্রতিফলক** (reflector, চিত্রে AB আয়না) বলে। প্রতিফলকে যে রশ্মি পতিত হয় তাহাকে **আপতিত রশ্মি** (incident ray, চিত্রে PO) বলে। প্রতিফলক হইতে যে রশ্মি ফিরিয়া যায় তাহাকে **প্রতিফলিত রশ্মি** (reflected ray, চিত্রে OQ) বলে। প্রতিফলকের যে বিন্দুতে রশ্মি আপতিত হয় তাহাকে **আপতন বিন্দু** (point of incidence, চিত্রে O) বলে। আপতন বিন্দুতে প্রতিফলনের উপর যে লম্ব (perpendicular) টানা যায় তাহাকে **অভিলম্ব** (normal, চিত্রে ON) বলে। আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলন রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণদ্বয় উৎপন্ন করে উহাদিগকে যথাক্রমে **আপতন কোণ** (angle of incidence, চিত্রে PON কোণ) ও **প্রতিফলন কোণ** (angle of reflection, চিত্রে NOQ কোণ) বলে। মনে রাখিবে, আপতিত আলোকের কিয়দংশ প্রতিফলক দ্বারা শোষিত (absorbed) হয়।



চিত্র 34 : আলোকের প্রতিফলন। –

অমসৃণ কাগজ, ছাদ বা দেওয়ালে আলোক-রশ্মি পতিত হইলে উহা চতুর্দিকে এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়ে। এই ঘটনাকে আলোকের **বিক্ষেপণ** (diffusion) বলে। মসৃণ তলে প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হয় কিন্তু অমসৃণ তলে প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হয় না।

* সকল অংশে একই গুণ বিশিষ্ট মাধ্যমকে সমসত্ত্ব মাধ্যম বলে।

33. প্রতিফলনের নিয়ম : (i) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব একই সমতলে থাকে।

(ii) **আপতন কোণ $\angle i$ = প্রতিফলন কোণ $\angle r$**

অভিলম্ব আপতন (Normal incidence) : আপতিত রশ্মি অভিলম্ব-ভাবে আপতিত হইলে উহা অভিলম্বভাবে প্রতিফলিত হয়। কারণ $\angle i = 0$ এবং $\angle r = 0$.

34. আলোকীয় প্রতিবিম্ব (Image) : তোমরা আয়নায় তোমাদের দেহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও। পুকুরের জলে পুকুর পাড়ের গাছের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই সব ক্ষেত্রে আসল বস্তুটি কিন্তু স্বস্থানে থাকে ; অন্যত্র বস্তুটির আর একটি হুবহু একই রূপ আমরা দেখি।

যখন কোন আলোক-বিন্দু হইতে রশ্মিগুচ্ছ বহির্গত হইয়া কোন তল হইতে প্রতিফলনের বা প্রতিসরণের (refraction, পরে দেখ) পর উহাদের অভিমুখ এরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয় যে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত (refracted) রশ্মি প্রকৃত একটি দ্বিতীয় বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা একটি দ্বিতীয় বিন্দু হইতে আসে বলিয়া মনে হয়, তখন এই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর **প্রতিবিম্ব** (বা শুধু বিম্ব) বলে। প্রতিবিম্ব দুই প্রকারের হয়, যথা : **সদ্** প্রতিবিম্ব ও **অসদ্** প্রতিবিম্ব।

সদ্ প্রতিবিম্ব (Real image) : যখন কোন আলোকের উৎস হইতে নির্গত অপসারী রশ্মিগুচ্ছ কোন তলে প্রতিফলনের বা প্রতিসরণের পর নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রকৃতই কোন বিন্দুতে ভিন্ন পথে মিলিত হয়, তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে **সদ্ প্রতিবিম্ব** বলে। অবতল দর্পণে (concave mirror) ও উত্তল লেন্সে (convex lens) প্রতিবিম্ব সদ্ হয়। উহাদের বিষয় পরে জানিতে পারিবে। কোন বস্তু হইতে কোন অপসারী রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সে প্রতিসৃত হইয়া যে বিন্দুতে মিলিত হয়, ঐ বিন্দু বস্তুর সদ্ প্রতিবিম্ব।

অসদ্ প্রতিবিম্ব (Virtual image) : যখন কোন আলোকের উৎস হইতে নির্গত অপসারী রশ্মিগুচ্ছ কোন তলে প্রতিফলনের বা প্রতিসরণের পর নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত দ্বিতীয় বিন্দু হইতে ভিন্ন পথে বাহির হইয়া আসে বলিয়া মনে হয় তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে **অসদ্ প্রতিবিম্ব** বলে। সমতল দর্পণে, উত্তল দর্পণে, অবতল লেন্সে (concave lens) সর্বদাই অসদ্ প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়। 34 নং চিত্রে P বিন্দু হইতে PA ও PO রশ্মি AB সমতল দর্পণে আপতিত হইয়া

যথাক্রমে AP পথে ও OQ পথে প্রতিফলিত হয়। উহাতে মনে হয় R বিন্দু হইতে রশ্মিদ্বয় আসিতেছে ; সুতরাং R বিন্দু P বিন্দুর প্রতিবিম্ব।

সদ্ প্রতিবিম্ব আলোক-রশ্মির প্রকৃত মিলনে উৎপন্ন হয়। উহাকে পর্দায় ফেলা যায় এবং উহা আসল বস্তুর উল্টা আকৃতির হয়। অসদ্ প্রতিবিম্ব কাল্পনিক রশ্মিগুচ্ছের মিলনে উৎপন্ন হয়। উহাকে পর্দায় ফেলা যায় না। উহা আসল বস্তুর ন্যায় সোজা হয়। সূচী-ছিদ্র ক্যামেরার প্রতিবিম্ব আলোকীয় প্রতিবিম্ব নয় কারণ উহাতে রশ্মির প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয় না।

35. প্রতিফলনের নিয়মের পরীক্ষা : একটি কার্ড-বোর্ডের উপর সাদা কাগজ আট (34নং চিত্র)। কাগজের মাঝখানে AB সরল রেখা টান। একটি পাতলা দর্পণের মাঝখানটা সরল রেখার উপর খাড়াভাবে রাখ। দর্পণের সম্মুখে একটু দূরে একটি P পিন পোঁত। দর্পণের ভিতর P পিনের প্রতিবিম্ব R পিন দেখা যায় ; দর্পণের গা ঘেঁষিয়া O পিন পোঁত যাহাতে P পিন হইতে আলোক-রশ্মি PO তির্যকভাবে দর্পণে পড়ে। এখন দর্পণের সম্মুখে Q পিন এমন জায়গায় পোঁত যাহাতে O, Q পিনদ্বয়ের মাথা ও R প্রতিবিম্বের মাথা এক সরল রেখায় দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে Q পিন R প্রতিবিম্বকে ঢাকিয়া রাখে। পিনগুলি তুলিয়া অবস্থান চিহ্নিত কর। দর্পণ তুলিয়া ফেল। পিনের ছিদ্রের জায়গায় অক্ষরগুলি লিখ। O বিন্দুতে AB-এর উপর ON অভিলম্ব টান। এখন PO, OQ, PAR রেখা টান। PO আপতিত রশ্মি, OQ প্রতিফলিত রশ্মি। PON আপতন কোণ, NOQ প্রতিফলন কোণ। চাঁদা (protractor) দিয়া মাপিয়া দেখ আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ। ইহা দ্বিতীয় নিয়ম প্রমাণ করে। অভিলম্ব, আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি সমতল কাগজের উপরে অবস্থিত। ইহা প্রথম নিয়ম প্রমাণ করে।

36. সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (Formation of an image by a plane mirror) : 34নং চিত্রে AB একটি সমতল দর্পণ। উহার সম্মুখে P একটি আলোকিত বিন্দু। P বিন্দুর প্রতিবিম্ব গঠন করিতে হইবে। P বিন্দু হইতে PA রশ্মি অভিলম্বভাবে আপতিত হইয়া একই পথে অর্থাৎ AP পথে প্রতিফলিত হয়। AP প্রতিফলিত রশ্মি। P হইতে নির্গত PO আপতিত রশ্মি OQ পথে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং OQ প্রতিফলিত রশ্মি। এই দুই প্রতিফলিত রশ্মিকে পশ্চাৎদিকে

বর্ধিত করিলে উহারা R বিন্দুতে মিলিত হয়। সুতরাং P বিন্দুর অসদ্ প্রতিবিম্ব R বিন্দু।

O বিন্দুতে দর্পণ AB-এর উপর ON অভিলম্ব টান।

প্রতিফলনের নিয়মানুসারে আপতন কোণ ∠PON = প্রতিফলন কোণ ∠NOQ; PA ও ON উভয়ে দর্পণের উপর লম্ব; উহারা সমান্তরাল। সুতরাং ∠APO = ∠PON এবং ∠PRQ = ∠NOQ।

এক্ষণে △APO ও △AOR-এর মধ্যে

∠APO = ∠ARO (প্রমাণিত)

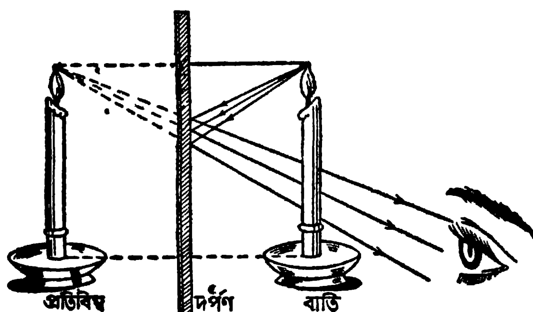
∠RAO = ∠PAO (প্রত্যেকে সমকোণ)

∴ AO সাধারণ বাহু

সুতরাং ত্রিভুজ দুইটি সমান।

∴ PA = AR

অর্থাৎ দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব (Object distance) = প্রতিবিম্বের দূরত্ব (Image distance)। প্রতিবিম্ব সর্বদাই অসদ্ হয় এবং প্রতিবিম্ব দর্পণের উপর অঙ্কিত

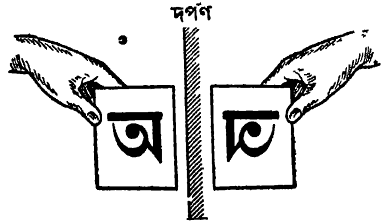


চিত্র 35 : বাতির প্রতিবিম্ব।

অভিলম্বের উপর থাকে। 35নং চিত্রে দর্পণে একটি জ্বলন্ত বাতির প্রতিবিম্ব দেখানো হইয়াছে। উহা দর্পণ হইতে সমদূরত্বে উৎপন্ন হইয়াছে।

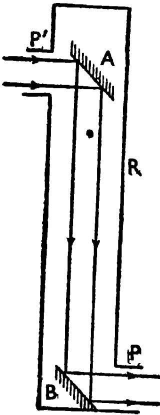
37. প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত : (i) আলোক-রশ্মির পথে দর্পণ ঘুরাইয়া আলোক-রশ্মিকে যে কোন নির্দিষ্ট দিকে ফেলা যায়—উহা আলোক-রশ্মির প্রতিফলনের জন্য সম্ভব হয়। (ii) **পার্শ্বীয় পরিবর্তন (Lateral inversion) :** প্রতিফলনে আসল বস্তুর প্রতিবিম্বে পার্শ্ব পরিবর্তন হয়। আমরা

দর্পণে বাম হাতকে ডান হাত দেখি। কিন্তু মাথা ও পায়ের কোন পরিবর্তন হয় না। 36নং চিত্রে **অ** অক্ষরকে দর্পণে উল্‌টা দেখা যায়। (iii) দুইটি দর্পণ ব্যবহার করিয়া আমরা মাথার পিছন দিক দেখিতে পাই। (iv) যদি পরস্পর সংলগ্ন দর্পণের মসৃণ তলের মধ্যে Q কোণ হয় তবে উহাদের উভয়ের দরুণ মোট



চিত্র 36 : প্রতিফলনে পার্শ্ব পরিবর্তন।

প্রতিবিম্বের সংখ্যা $=\frac{360}{Q}-1$ হইবে। যদি দর্পণের মধ্যে কোণ 90° হয় তবে প্রতিবিম্বের সংখ্যা $=\frac{360^\circ}{90^\circ}-1=3$ হইবে। (v) **পেরিস্কোপ** (Periscope)**:** এই যন্ত্রের একটি R নলের মধ্যে দুইটি সমতল দর্পণ A ও B পরস্পর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। উহারা অনুভূমিকের (horizontal) সঙ্গে 45° কোণে আনত হয়। দূরের কোন বস্তু হইতে আলোক-রশ্মি P′ মুখে প্রবেশ করিয়া উপরের A দর্পণে ও নীচের B দর্পণে দুইবার প্রতিফলিত হইয়া P পথে বাহির হইয়া দর্শকের চোখে পৌঁছায়। দর্শক খালি চোখে সোজাসুজি বস্তুকে দেখিতে না পাইলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পায়। পরিখার মধ্যে লুকাইয়া পেরিস্কোপের সাহায্যে সৈন্যদের গতিবিধি দেখা যায়। খেলার মাঠে ভিড়ের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া পেরিস্কোপের সাহায্যে খেলা দেখা যায়।

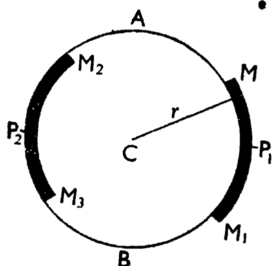


চিত্র 37 : পেরিস্কোপ।

গোলীয় তলে প্রতিফলন (Reflection at a spherical mirror)

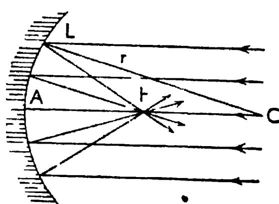
38. সংজ্ঞা : কোন ফাঁপা AB গোলকের বাহির তলের কোন অংশ (MM_1) বা ভিতর তলের কোন অংশ (M_2M_3) মসৃণ ও চক্‌চকে হইলে সেই অংশকে **গোলীয় দর্পণ** (38নং চিত্র) বলে। প্রথম অংশকে **উত্তল দর্পণ** (Convex mirror) এবং দ্বিতীয় অংশকে **অবতল দর্পণ** (Concave mirror)

বলে। দর্পণের মধ্যবিন্দুকে **মেরু** (Pole P_1, P_2) বলে। দর্পণ যে গোলকের অংশ সেই গোলকের কেন্দ্রকে **বক্রতা-কেন্দ্র** (Centre of curvature) এবং ব্যাসার্ধকে **বক্রতা-ব্যাসার্ধ** (Radius of curvature) বলে। বক্রতা-কেন্দ্র ও মেরু সংযোগকারী রেখাকে **প্রধান** বা **মুখ্য অক্ষ** (Principal axis CA, 39ও 40 নং চিত্র) বলে। সকল অক্ষ দর্পণের উপর অভিলম্ব হয়।

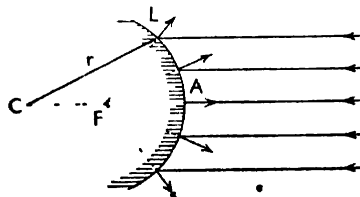


চিত্র 38 . গোলীয় দর্পণ।

প্রধান অক্ষের সমান্তরালে কতকগুলি রশ্মিগুচ্ছ দর্পণের মধ্যবিন্দুর নিকটে আপতিত হইলে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মি সর্বদাই প্রধান অক্ষের উপর একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রকৃতই কেন্দ্রীভূত হয় (অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে) কিংবা



চিত্র 39 : অবতল দর্পণেব প্রধান ফোকস্।



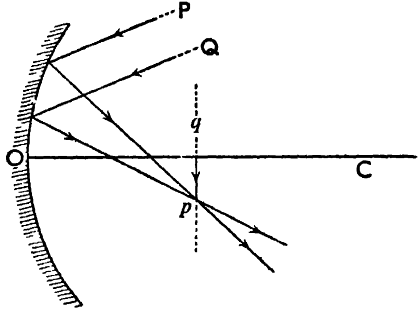
চিত্র 40 : উত্তল দর্পণের প্রধান ফোকস্।

একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে আসে বলিয়া মনে হয় (উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে)। এই নির্দিষ্ট বিন্দুকে **প্রধান** বা **মুখ্য ফোকস** (Principal focus) বলে। 39 নং চিত্রে F অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকস্, 40 নং চিত্রেও F উত্তল দর্পণের মুখ্য ফোকস্। অবতল দর্পণের মুখ্য ফোকস সদ্, উত্তল দর্পণের মুখ্য ফোকস্ অসদ্ হয়। দর্পণের মধ্যবিন্দু A হইতে ফোকস্ পর্যন্ত দূরত্বকে **ফোকস্ দূরত্ব** (Focal length) বলে ; যথা AF।

গণিতের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে ফোকস্ দূরত্ব $f =$ বক্রতা ব্যাসার্ধের অর্ধেক $= \frac{r}{2}$

39. চিত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি, আকৃতি ও অবস্থান নির্ণয় (Graphical determination of images at a spherical mirror) : দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্বের উপর প্রতিবিম্বের

প্রকৃতি, অবস্থান ও বিবর্ধন নির্ভর করে। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে বিষয়গুলি বোঝানো গেল। প্রত্যেক ক্ষেত্রে PQ বস্তুকে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত বলিয়া ধরা হয়। বস্তুর সর্বোচ্চ বিন্দু P হইতে দুইটি রশ্মি টানা হয়। PL রশ্মি অক্ষের সহিত সমান্তরালে টানা হয় বলিয়া উহা প্রতিফলনের পর মুখ্য ফোকস্ F-এর মধ্য দিয়া যায় (সংজ্ঞানুসারে)। PL′ রশ্মি কেন্দ্র C-এর মধ্য দিয়া যায় বলিয়া উহা প্রতিফলনের পর LP′ পথেই প্রতিফলিত হয় কারণ CL′ ব্যাসার্ধ দর্পণের উপর অভিলম্ব। উহাদের ছেদ-বিন্দু p, P বিন্দুর প্রতিবিম্ব হইবে। বস্তুর সর্বনিম্ন বিন্দু Q অক্ষের উপর অবস্থিত। সুতরাং Q-এর প্রতিবিম্ব q প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত হইবে। অতএব PQ-এর প্রতিবিম্ব pq হইবে। প্রতিবিম্ব বাহির করিবার উহাই সাধারণ নিয়ম (42নং চিত্র)।

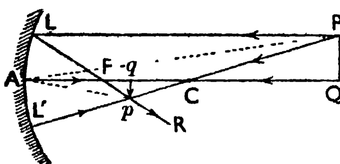


চিত্র 41 : বস্তু অসীমে অবস্থিত।

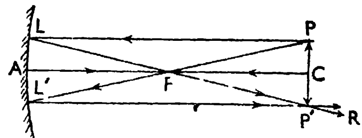
অবতল দর্পণ :

(i) **বস্তু অসীম দূরত্বে অবস্থিত :** অসীম দূরত্বে অবস্থিত কোন বস্তু হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ পরস্পর সমান্তরাল হয়, সুতরাং উহারা প্রতিফলনের পর মুখ্য ফোকসে কেন্দ্রীভূত হয়। এই প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্টা** ও **খুব ক্ষুদ্র** হয় (41নং চিত্র)।

(ii) **বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C ও অসীমের মধ্যে অবস্থিত :** পূর্ব প্রণালী অনুসারে অঙ্কন করিলে P বিন্দুর প্রতিবিম্ব p এবং Q বিন্দুর প্রতিবিম্ব q পাওয়া



চিত্র 42 : বস্তু C ও অসীমের মধ্যে অবস্থিত।



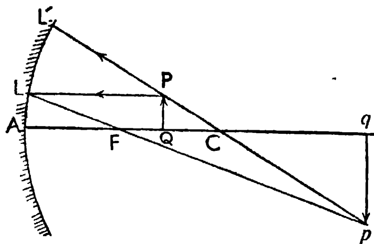
চিত্র 43 : বস্তু C তে অবস্থিত।

যায়। সুতরাং PQএর প্রতিবিম্ব pq হয়। উহা কেন্দ্র C ও মুখ্য ফোকস

F-এর মধ্যে গঠিত হয়। এই প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্‌টা** ও বস্তুর চেয়ে **ছোট** হয় (42 নং চিত্র)।

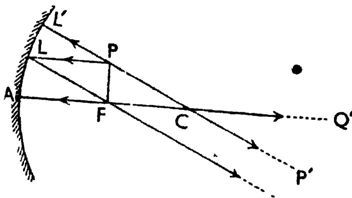
(iii) **বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C-তে অবস্থিত :** PC বস্তু কেন্দ্র C-তে অবস্থিত। পূর্ব প্রণালী অনুসারে অঙ্কন করিলে দেখা যায় PC বস্তুর প্রতিবিম্ব p′C হয়। প্রমাণ করা যায় p′C = PC সুতরাং প্রতিবিম্ব p′C বস্তুর **সমান, সদ্** ও **উল্‌টা**। উহা বক্রতা-কেন্দ্র C-তে গঠিত হয় (43 নং চিত্র)।

(iv) **বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C ও মুখ্য ফোকস্ F--এর মধ্যে অবস্থিত :** মনে কর PQ বস্তু C ও F-এর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব প্রণালী অনুসারে অঙ্কন করিলে দেখা যায় বস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব pq হয় ; প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্‌টা** ও বস্তুর চেয়ে বৃহত্তর হয়। উহা অসীম ও C-এর মধ্যে গঠিত হয় (44নং চিত্র)।

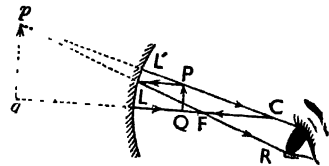


চিত্র 44 : বস্তু বক্রতা-কেন্দ্র C ও মুখ্য ফোকসের মধ্যে অবস্থিত।

(v) **বস্তু মুখ্য ফোকসে অবস্থিত :** উহার অবস্থান (i) নং অবস্থানের বিপরীত। মনে কর, PF বস্তু মুখ্য ফোকস্ F-এ অবস্থিত। PL ও PL′ রশ্মিদ্বয় প্রতিফলনের পর সমান্তরাল হয় অর্থাৎ অসীমে মিশে। প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্‌টা** ও খুব **বৃহত্তর** হয় (45নং চিত্র)।



চিত্র 45 : বস্তু মুখ্য ফোকসে অবস্থিত।

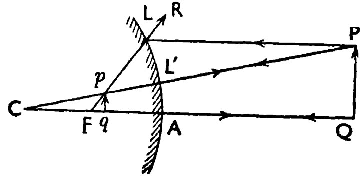


চিত্র 46 : বস্তু মধ্যবিন্দু A ও F-এর মধ্যে অবস্থিত।

(vi) **বস্তু মধ্য-বিন্দু A ও মুখ্য ফোকসের মধ্যে অবস্থিত :** মনে কর, PQ বস্তু অক্ষের উপর অবস্থিত। P হইতে PL ও PL′ রশ্মিদ্বয় প্রতিফলনের পর যথাক্রমে F ও C-এর মধ্য দিয়া যায়। উহারা অপসারী রশ্মি। সেইজন্য উহারা সদ্ প্রতিবিম্ব গঠন করে না। রশ্মিদ্বয়কে পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে p তে

মিশে। P-এর প্রতিবিম্ব p এবং Q-এর প্রতিবিম্ব q ; প্রতিবিম্ব pq **অসদ্, সোজা** ও **বৃহত্তর** হয়। উহা দর্পণের পশ্চাতে গঠিত হয় (46নং চিত্র)।

উত্তল দর্পণ : মনে কর, PQ বস্তু অক্ষের উপর যে কোন স্থানে অবস্থিত। অক্ষের সমান্তরালে PL রশ্মি ও C কেন্দ্রের মধ্য দিয়া PL′ যথাক্রমে LR ও L′P বরাবর যায়। উহারা যথাক্রমে F ও C হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। উহাদিগকে পশ্চাতে বর্ধিত করিলে উহারা p বিন্দুতে ছেদ করে। p, P-এর প্রতিবিম্ব। Q-এর প্রতিবিম্ব q অক্ষের উপর অবস্থিত, সুতরাং PQ-এর প্রতিবিম্ব pq দর্পণের পশ্চাতে গঠিত হয়। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **ক্ষুদ্রতর** হয়।



চিত্র 47 : উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন।

পরীক্ষায় দেখানো যায় যে বস্তু উত্তল দর্পণ হইতে যে কোন দূরত্বে অবস্থিত হউক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই প্রতিবিম্ব অসদ্, সোজা ও ক্ষুদ্রতর হয়।

40. দর্পণের ব্যবহার : সমতল দর্পণ মুখ দেখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারগণ অবতল দর্পণের সাহায্যে কাণ, নাক ও গলার গহ্বরে আলোক ফেলিয়া থাকেন। উহাতে উজ্জ্বল রশ্মিগুচ্ছ পাওয়া যায়। কোন দীপকের পশ্চাতে মসৃণ অবতল দর্পণ রাখিলে উহা প্রতিফলনের কাজ করে। মোটর গাড়ীর সম্মুখের আলোয় (head light), স্টীমারের সন্ধানী আলোয় (search light) আলোকের উৎসর পশ্চাতে অর্ধ বৃত্তাকার অবতল দর্পণ থাকে। মোটর চালকরা পশ্চাতের গাড়ী দেখিবার জন্য উত্তল দর্পণ ব্যবহার করেন। রাস্তার আলোক দূরে বিচ্ছুরিত করিবার জন্য উত্তল দর্পণ ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

1. আলোকের প্রতিফলন ব্যাখ্যা কর। প্রতিফলনের নিয়ম বর্ণনা কর।
2. পিন প্রণালীতে প্রতিফলনের নিয়ম কিভাবে পরীক্ষা করিবে বর্ণনা কর।
3. সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্ব কাহাকে বলে ? উহাদের পার্থক্য কি ?
4. সমতল দর্পণে কিরূপে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

5. প্রমাণ কর যে সমতল দর্পণে দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব = প্রতিবিম্বের দূরত্ব।

6. চিত্রের সাহায্যে একটি সাধারণ পেরিস্কোপ বর্ণনা কর। উহার কাজ কি?

7. নিম্নলিখিতগুলির সংজ্ঞা বল :—(i) অবতল ও উত্তল দর্পণ, (ii) প্রধান অক্ষ, (iii) বক্রতা-কেন্দ্র, (iv) ফোকস্, ফোকস্-দূরত্ব ও (v) পার্শ্বীয় পরিবর্তন।

8. অবতল দর্পণে বস্তুর নিম্নলিখিত অবস্থানে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি ও অবস্থান অঙ্কিত কর :—(i) বস্তু অসীম ও বক্রতা-কেন্দ্রের মধ্যে, (ii) বস্তু ফোকস্-দূরত্বে, (iii) বস্তু ফোকস্-দূরত্ব ও মধ্যবিন্দুর মধ্যে।

9. উত্তল দর্পণে কিরূপে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় পাঠ

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light)

সমতলে প্রতিসরণ

41. **প্রতিসরণ :** আলোক-রশ্মি এক স্বচ্ছ মাধ্যমের (যথা বায়ুর) ভিতর দিয়া সরল রেখায় গমন করিয়া ভিন্ন ঘনাঙ্ক বিশিষ্ট অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে (যথা কাচে) তির্যকভাবে (obliquely) আপতিত হইলে দুই মাধ্যমের বিভাগ-তলে (surface of separation) ঐ রশ্মির অভিমুখ নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিবর্তিত হইয়া দ্বিতীয় মাধ্যমে সরল রেখায় চলে। এই ঘটনাকে আলোকের **প্রতিসরণ** বলে। 48নং চিত্রে বায়ু হইতে কাচে এবং কাচ হইতে বায়ুতে আলোকের দুইবার প্রতিসরণ দেখানো হইয়াছে। প্রথম মাধ্যমের রশ্মিপথকে **আপতিত রশ্মি** (incident ray, PO) ও দ্বিতীয় মাধ্যমের রশ্মিপথকে **প্রতিসৃত রশ্মি** (refracted ray, OQ) বলে। বিভাগ-তলের যে বিন্দুতে আপতিত রশ্মি স্পর্শ করে তাহাকে **আপতন-বিন্দু** (point of incidence; O) বলে। আপতন-বিন্দুতে বিভাগ-তলের উপর অঙ্কিত লম্বকে **অভিলম্ব** (normal, ON) বলে। অভিলম্বের সহিত আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি

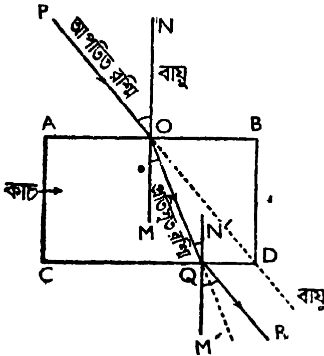
যে কোণদ্বয় উৎপন্ন করে তাহাদিগকে যথাক্রমে **আপতন কোণ** (angle of incidence, ∠ PON) ও **প্রতিসরণ কোণ** (angle of refraction, ∠ MOQ) বলে।

মনে রাখিবে, যদিও আপতন বিন্দুতে রশ্মির পথ বাঁকিয়া যায় তথাপি রশ্মি দুই মাধ্যমেই সরল পথে চলে। PO ও OQ দুইই সরল রেখা।

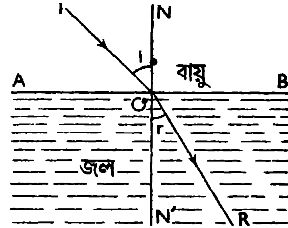
কোন রশ্মি অভিলম্বভাবে আপতিত হইলে উহা অভিলম্বভাবে প্রতিসৃত হয়। অর্থাৎ অভিলম্ব আপতনে (normal incidence) প্রতিসৃত রশ্মির অভিমুখ বদলায় না।

42. প্রতিসরণের নিয়ম (Laws of refraction) :

(ক) আপতিত রশ্মি, বিভাগ-তলে আপতন বিন্দুতে অভিলম্ব ও প্রতিসৃত রশ্মি একই সমতলে থাকে।



চিত্র 48 : আলোকের প্রতিসরণ।

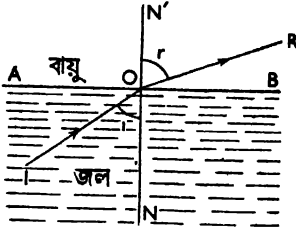


চিত্র 49 : বায়ু হইতে জলে প্রতিসরণ

(খ) দুইটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক-রশ্মির জন্য আপতন কোণের সাইন (Sine) ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত নিত্যসংখ্যা (constant) হয় ; $\frac{\text{Sin } i}{\text{Sin } r} = \mu$. (উচ্চারণ 'মিউ') ; এই নিয়মকে 'Snell' নিয়ম বলে। এই অনুপাতকে **প্রতিসরণাঙ্ক** (Refractive index) বলে। [কোন সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব (Perpendicular) ও কর্ণের (hypotenuse) অনুপাতকে Sine (সংক্ষেপে Sin) বলে।]

এই সূত্রানুসারে নিম্নলিখিত নিয়ম পাওয়া যায় : (i) আলোক-রশ্মি

লঘুতর মাধ্যম (বায়ু) হইতে ঘনতর অন্য মাধ্যমে (জলে) প্রতিসৃত হইলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে সরিয়া আসে অর্থাৎ আপতন কোণ (i) অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ (r) ক্ষুদ্রতর হয় (চিত্র 49)। (ii) আলোক-রশ্মি ঘনতর মাধ্যম (জল) হইতে লঘুতর মাধ্যমে (বায়ুতে) প্রতিসৃত হইলে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়, অর্থাৎ আপতন কোণ (i) অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ (r) বৃহত্তর হয় (চিত্র 50)।



চিত্র 50 : জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণ।

43. প্রতিসরণের নিয়মের পরীক্ষা: টেবিলের উপর পিন দিয়া সাদা কাগজ আঁট। ABCD একটি আয়তাকার কাচফলককে কাগজের উপর রাখ (চিত্র 48)। পেন্সিল দিয়া ফলকের সীমা রেখা টান। AB তলের গা ঘেঁষিয়া O পিন পোঁত। একই দিকে দূরে P পিন পোঁত যাহাতে PO সরল রেখা তির্যকভাবে AB তলে O বিন্দুতে মিশে। কাচফলকের অপর পার্শ্বে CD তল হইতে ফলকের মধ্য দিয়া P ও O পিনকে দেখিয়া CD তলের গা ঘেঁষিয়া Q পিন ও একটু দূরে R পিন এমনভাবে পোঁত যাহাতে P ও O পিনের প্রতিবিম্ব এবং Q ও R পিন এক সরল রেখায় মনে হয়। সব পিনকে কাগজের তলের উপর লম্বভাবে পুঁতিবে। কাচফলক ও পিনগুলি তুলিয়া পিনের ছিদ্রগুলি PO, OQ, OR রেখা দ্বারা যোগ কর। Oতে ও Qতে যথাক্রমে অভিলম্ব NM ও N′M′ টান। বায়ু হইতে কাচে প্রবেশ করিবার সময় PO আপতিত রশ্মি ও OQ প্রতিসৃত রশ্মি। এইবার চাঁদা দিয়া মাপিয়া দেখ আপতন কোণ PON অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ MOQ ক্ষুদ্রতর। তালিকা হইতে এই সকল কোণের Sine-এর মান দেখিয়া μ নির্ণয় করা যায়। দেখা যায় বায়ু μ কাচ = 1·5.

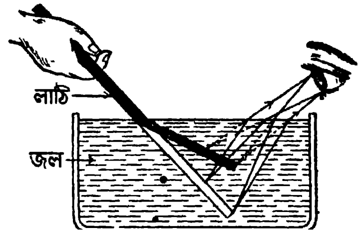
আবার কাচ হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় OQ আপতিত রশ্মি এবং QR প্রতিসৃত রশ্মি। এই ক্ষেত্রেও চাঁদা দিয়া মাপিয়া দেখ প্রতিসরণ কোণ M′QR অপেক্ষা আপতন কোণ OQN′ ক্ষুদ্রতর। ইহা দ্বিতীয় নিয়ম প্রমাণ করে।

P ও O পিন কাগজের তল হইতে সমান উঁচু করিয়া পোঁত। Q ও R পিন এমনভাবে পোঁত যাহাতে সবগুলির মাথা একই সরল রেখায় দেখা যায়।

মাপিয়া দেখ Q ও R পিনের উচ্চতা P ও O পিনের উচ্চতার সমান। ইহা প্রথম নিয়ম প্রমাণ করে।

44. প্রতিসরণের দৃষ্টান্ত : (i) ঘনতর মাধ্যম জল হইতে লঘুতর মাধ্যম বায়ুতে কোন বস্তুকে দেখিলে প্রতিসরণ তল হইতে উহাকে অধিক দূরে বলিয়া মনে হয়। কারণ ঘনতর মাধ্যমে প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায়। জলের মধ্য হইতে তীরের গাছগুলিকে উঁচুতে দেখা যায়।

(ii) ঘনতর মাধ্যমে (জলে) কোন বস্তু রাখিলে লঘুতর মাধ্যম (বায়ু) হইতে উহাকে প্রকৃত অবস্থান হইতে একটু উপরে দেখা যায় কারণ প্রতিসৃত রশ্মি লঘুতর মাধ্যমে অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। সেইজন্য উপর হইতে সোজাভাবে বস্তুর দিকে তাকাইলে উহাদের তল উপরে উঠে বলিয়া মনে হয় অর্থাৎ উহাদিগকে কম গভীর বলিয়া মনে হয়। সব ক্ষেত্রে বস্তু (প্রথম ক্ষেত্রে লঘুতর মাধ্যমে গাছ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘনতর মাধ্যমে চৌবাচ্চার জলের তল) হইতে রশ্মি আপতিত হইয়া বিপরীত মাধ্যমে প্রতিসৃত হইয়া চোখে প্রবেশ করে।

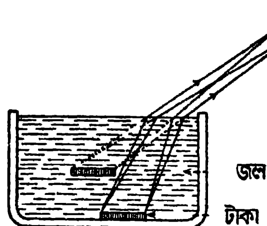


চিত্র 51 : প্রতিসরণে লাঠি বাঁকা দেখা যায়।

(iii) **জলে নিমজ্জিত দণ্ড :** জলে কোন দণ্ড তির্যকভাবে আংশিক নিমজ্জিত রাখিলে নিমজ্জিত অংশকে বাঁকা এবং উপরে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। নিমজ্জিত অংশের প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইয়া ঘনতর মাধ্যম জলের মধ্য দিয়া আসিয়া বিভাগ-তলে প্রতিসৃত হইয়া লঘুতর মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া চোখে প্রবেশ করে। সেইজন্য দণ্ডের নিমজ্জিত অংশকে বাঁকা ও উপরে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দণ্ডকে সোজাভাবে ডুবাইলে উহাকে ছোট দেখায় কিন্তু বাঁকা দেখায় না, কারণ আলোক-রশ্মি লম্বভাবে আপতিত হইয়া লম্বভাবেই প্রতিসৃত হয়।

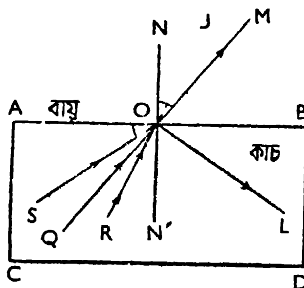
(iv) **জলে নিমজ্জিত মুদ্রা :** একটি খালি পাত্রে একটি টাকা রাখিয়া পাত্রকে এমন অবস্থানে রাখ যেন টাকাটি সবেমাত্র দৃষ্টির বাহিরে থাকে। টাকা হইতে আগত আলোক-রশ্মি পাত্রের গায়ে বাধা পাইয়া চোখে প্রবেশ

করে না। এই অবস্থায় তুমি স্থির থাকিয়া পাত্রকে জলপূর্ণ কর, টাকাটি দেখিতে পাইবে। কেন? পাত্রে জল ঢালায় টাকা হইতে আগত রশ্মি ঘনতর মাধ্যম জল হইতে লঘুতর মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় প্রতিসরণের জন্য অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া গিয়া চোখে পড়ায় টাকাটি উপরে উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য তুমি টাকাটি দেখিতে পাও।



চিত্র 52 : টাকা উঁচুতে দেখায়।

(v) **আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন** (Total Internal Reflection) : আলোক রশ্মি ঘনতর মাধ্যম হইতে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করিলে আপতন কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ বৃহত্তর হয়। আপতন কোণকে বাড়াইতে থাকিলে প্রতিসরণ কোণও বাড়িতে থাকে। আপতন কোণ একটি নির্দিষ্ট মানে (চিত্রে QON′) পৌছিলে প্রতিসরণ কোণ 90° হয় অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মি OB বিভাগতলের গা ঘেঁষিয়া যায়। এই নির্দিষ্ট মানের আপতন কোণকে **সংকট কোণ** (Critical angle, চিত্রে QON′) বলে। আপতন কোণ সংকট কোণের একটু বেশী হইলে (চিত্রে SON′) আলোক-রশ্মির বায়ু মাধ্যমে প্রতিসরণ সম্ভব নয়, কারণ বায়ুতে প্রতিসরণ কোণ 90°-এর অধিক হইতে পারে না। তখন আপতিত রশ্মি জল হইতে জলের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। উহার কোন অংশই প্রতিসৃত হইয়া বায়ুতে যায় না। এই ঘটনাকে আলোকের **পূর্ণ প্রতিফলন** বলে।

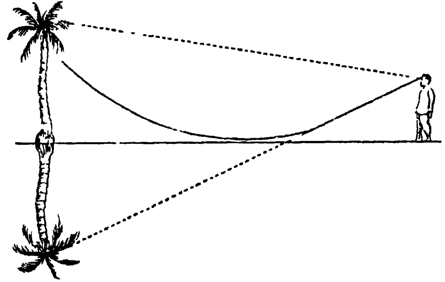


চিত্র 53 : আলোকের পূর্ণ প্রতিফলন।

(vi) নানা কারণে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ও সঙ্গে সঙ্গে ঘনাঙ্ক অনবরত পরিবর্তিত হয়। সেইজন্য দূরের তারা হইতে আগত আলোক-রশ্মির পথ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। উহাকে তারার **ঝিকিমিকি** (twinkling) বলে।

(vii) **মরীচিকা** (Mirage) : মরীচিকা আলোক-রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত। উষ্ণ মরুভূমিতে দিনে সূর্যতাপে উত্তপ্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যতই উপরে উঠা যায় ততই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কমিতে থাকে, ঘনাঙ্ক ও

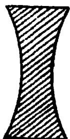
প্রতিসরণাঙ্ক বাড়িতে থাকে। উপর হইতে বায়ুর স্তরগুলি ক্রমশঃ লঘু হয়। সুতরাং মরুভূমিতে দূরের কোন গাছের মাথা হইতে আলোক-রশ্মি নীচের দিকে নামিবার সময় প্রতি স্তরে প্রতিসরণের জন্য উহা অভিলম্ব হইতে দূরে বাঁকিতে থাকে অর্থাৎ উহার আপতন কোণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আপতন কোণ সংকট কোণ অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেই আলোক-রশ্মি একটি স্তরে পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া উপর দিকে উঠিতে থাকে এবং প্রতি স্তরে অভিলম্বের দিকে বাঁকিতে থাকে। পথিকের চোখে শেষ রশ্মি পড়িলে সে উক্ত রশ্মির পশ্চাতে বর্ধিত অংশের অভিমুখে চকচকে বালির নীচে গাছের একটি অসদ্ উল্টা প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়। বায়ুর উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য বায়ুর ঘনাঙ্ক ও প্রতিসরণাঙ্ক প্রতি মুহূর্তে বদলায়। সেইজন্য পথিক প্রতিবিম্বকে কম্পমান দেখে। সুতরাং তৃষ্ণার্ত পথিক প্রতিবিম্বকে জলাশয়ে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব বলিয়া ধারণা করে এবং জল-ভ্রমে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। এই দৃষ্টি বিভ্রমকে **মরীচিকা** বলে।


চিত্র 54 : মরীচিকা।

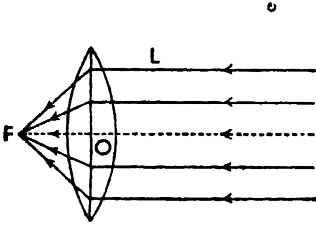
লেন্স

45. সংজ্ঞা : (i) দুইটি গোলীয় বা একটি গোলীয় ও আর একটি সমতল দ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ প্রতিসারক (refracting) মাধ্যমের অংশ বিশেষকে **লেন্স** বলে। (ii) সীমাবদ্ধ তলের দুই বক্রতা-কেন্দ্রের সংযোগে অঙ্কিত রেখাকে লেন্সের **প্রধান-অক্ষ** (Principal axis) বলে। (iii) লেন্স দুই প্রকার : (ক) **উত্তল** (Convex) **লেন্স :** যে লেন্সের মাঝখানটা মোটা ও দুই প্রান্তের দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে তাহাকে **উত্তল** লেন্স বলে। (খ) **অবতল** (Concave) **লেন্স :** যে লেন্সের মাঝখান সরু এবং দুই প্রান্তের দিক ক্রমশঃ মোটা হইয়া গিয়াছে তাহাকে **অবতল** লেন্স বলে।

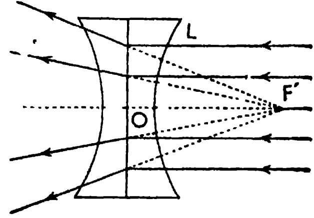

চিত্র 55 : উত্তল লেন্স।


চিত্র 56 : অবতল লেন্স।

(iv) সমান্তরাল সূক্ষ্ম রশ্মিগুচ্ছ প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে লেন্সে আপতিত হইলে প্রতিসরণের পর রশ্মিগুলি উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান



চিত্র 57 : উত্তল লেন্সে আপতিত রশ্মি।

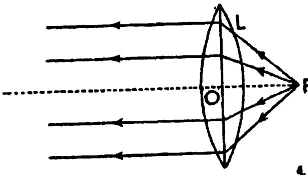


চিত্র 58 : অবতল লেন্সে আপতিত রশ্মি।

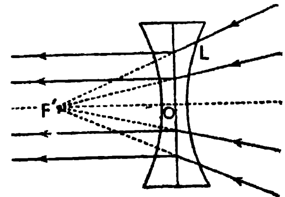
অক্ষের উপর একটি বিন্দুতে মিলিত হয় এবং অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের উপরে একটি বিন্দু হইতে বহির্গত হয় বলিয়া মনে হয়। ঐ বিন্দুকে লেন্সের **মুখ্য ফোকস্** (Principal focus F, F′) বলে।

প্রত্যেক লেন্সের উভয় পার্শ্বে আলোকরশ্মি আপতিত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক লেন্সের দুই পার্শ্বে দুইটি মুখ্য ফোকস্ থাকে। উপরোক্ত মুখ্য ফোকস্কে **দ্বিতীয় মুখ্য ফোকস্** বলে। এই ফোকস্কেই লেন্সের **মুখ্য ফোকস্** বলে।

যদি প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত কোন বিন্দু হইতে নির্গত উত্তল লেন্সে



চিত্র 59 : উত্তল লেন্স।



চিত্র 60 : অবতল লেন্স।

অপসারী রশ্মিগুচ্ছ এবং অবতল লেন্সে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল হয় তবে ঐ বিন্দুকে **প্রথম মুখ্য ফোকস্** বলে।

(v) লেন্সের মধ্যে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দু দিয়া আলোক-রশ্মি গমন করিলে উহা একই দিকে প্রতিস্হত হয় সেই বিন্দুকে **আলোক-কেন্দ্র** (Optical centre, চিত্রে O) বলে।

(vi) আলোক-কেন্দ্র হইতে ফোকস্ পর্যন্ত দূরত্বকে **ফোকস্-দূরত্ব** (Focal length F O ও F′ O) বলে।

সাধারণ পরীক্ষায় লেন্সগুলি খুব সরু ধরা হয় অর্থাৎ দুই তলের ব্যবধান খুব কম ধরা হয়। প্রধান ফোকস্ হইতে সরু লেন্সের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে **ফোকস্-দূরত্ব** বলে।

46. প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় (Graphical construction for Images): কোন বস্তুর কোন বিন্দু হইতে দুইটি বিশিষ্ট রশ্মির পথ আঁকিয়া প্রতিবিম্বের অবস্থান নির্ণয় করা হয় :—

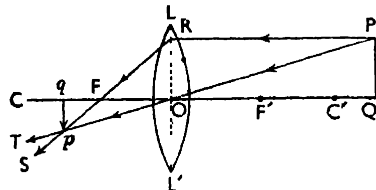
(i) মনে কর PQ বস্তু প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত। লেন্সের আলোক-কেন্দ্র O-র মধ্য দিয়া PO রশ্মি অতিক্রম করিলে প্রতিসরণের পর উহা সোজা OT পথে বহির্গত হয় (চিত্র 61)।

(ii) প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালে PR রশ্মি লেন্সে আপতিত হইলে প্রতিসরণের পর উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে RS পথে মুখ্য ফোকসের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে (চিত্র 61) কিংবা অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে (চিত্র 65) FS পথে মুখ্য ফোকস হইতে আসে বলিয়া মনে হয়।

এই দুই রশ্মি p বিন্দুতে মিলিত হয়। উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে p বিন্দু P বিন্দুর সদ্ প্রতিবিম্ব। অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে p বিন্দু P বিন্দুর অসদ্ প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ প্রতিসৃত রশ্মিদ্বয়কে পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে উহারা মিলিত হয়। p বিন্দু হইতে প্রধান অক্ষের উপর লম্ব pq টানিলে উহা PQ-এর প্রতিবিম্ব হইবে।

লেন্সের প্রতিবিম্ব গঠন

উত্তল লেন্স : (i) মনে কর, LL′ একটি উত্তল লেন্স, O আলোক-কেন্দ্র, F ও F′ প্রথম ও দ্বিতীয় ফোকস, FOF′ প্রধান অক্ষ। C′-এর বাহিরে PQ বস্তু অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। মনে কর P বিন্দু হইতে PR রশ্মি অক্ষের সহিত সমান্তরালে লেন্সে আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর F-এর মধ্য দিয়া RS পথে নির্গত হয়।



চিত্র 61 : বস্তু C′-এর বাহিরে অবস্থিত।

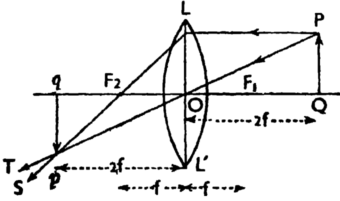
P বিন্দু হইতে অপর একটি রশ্মি PO লেন্সের আলোক কেন্দ্র O-এর মধ্য দিয়া প্রতিসরণের পর OT পথে নির্গত হয়। এই দুই প্রতিসৃত রশ্মি p বিন্দুতে মিলিত হয়; p বিন্দু P-এর প্রতিবিম্ব। Q-এর প্রতিবিম্ব

প্রধান অক্ষের উপর থাকিবে। সুতরাং PQ-এর প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের উপরে লম্ব হইবে। p হইতে অক্ষের উপরে pq লম্ব টান; PQ-এর প্রতিবিম্ব pq। এই প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্‌টা** ও **ক্ষুদ্রতর** হয়। ছবি তোলার ক্যামেরায়, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যে (objective) উত্তল লেন্স এই অবস্থানে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ দুইটি রশ্মি অঙ্কন করিয়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের অবস্থান দেখানো যায় :—

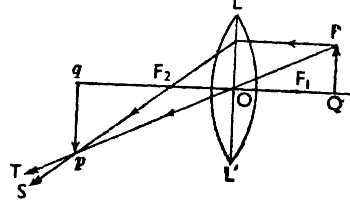
(i) PQ বস্তু অসীমে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব **সদ্, উল্‌টা** ও **খুব ছোট** হয়।

(ii) PQ বস্তু 2f-এ, অর্থাৎ C তে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব pq **সদ্, উল্‌টা** ও **বস্তুর সমান** হয় (চিত্র 62)।

(iii) PQ বস্তু 2f ও f-এর মধ্যে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব PQ **সদ্, উল্‌টা** ও **বৃহত্তর** হয়। ম্যাজিক লণ্ঠনে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিলক্ষ্যে উত্তল লেন্স এই অবস্থানে ব্যবহৃত হয় (চিত্র 63)।



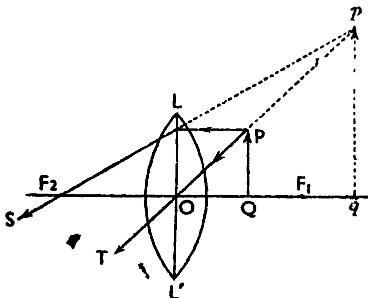
চিত্র 62 : বস্তু C-তে অবস্থিত।



চিত্র 63 : বস্তু 2f ও f-এর মধ্যে অবস্থিত।

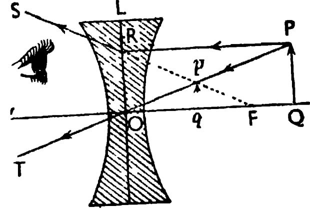
(iv) বস্তু f তে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব **সদ্, উলটা** ও **খুব বড়** এবং **অসীমে অবস্থিত** হয়।

(v) বস্তু f ও লেন্সের মধ্যে অবস্থিত হইলে প্রতিবিম্ব pq **অসদ্, সোজা** ও **বড়** হয়। চশমা, বিবর্ধক কাচ (magnifying glass) এবং দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের অভিনেত্রে (eye-piece) এই অবস্থানে উত্তল লেন্স ব্যবহৃত হয় (চিত্র 64)।



চিত্র 64 : বস্তু f ও লেন্সের মধ্যে অবস্থিত।

অবতল লেন্স : মনে কর, LO অবতল লেন্স, O আলোক-কেন্দ্র। F প্রধান ফোকস, F'Q প্রধান অক্ষ, PQ অক্ষের উপর লম্বভাবে অবস্থিত বস্তু। P বিন্দু হইতে PR রশ্মি অক্ষের সহিত সমান্তরালে লেন্সে আপতিত হইয়া RS পথে প্রতিসৃত হয়। RS-কে পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে F-এর মধ্য দিয়া যায়। P বিন্দু হইতে একটি রশ্মি PO আলোক-কেন্দ্রের মধ্য দিয়া OT পথে বাহির হয়। এই দুই রশ্মিকে পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিলে p বিন্দুতে মিশে। সুতরাং p বিন্দু P বিন্দুর অসদ্ প্রতিবিম্ব। পূর্বের ন্যায় অক্ষের উপর pq লম্ব টান। সুতরাং PQ বস্তুর প্রতিবিম্ব pq। প্রতিবিম্ব **অসদ্, সোজা** ও **ক্ষুদ্রতর** হয়। অবতল লেন্স চশমায় ও উত্তল লেন্সের সহিত নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।



চিত্র 65 : অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠন।

অনুশীলনী

1. আলোকের প্রতিসরণ চিত্রের সাহায্যে বুঝাও।

2. প্রতিসরণের নিয়ম কি কি? উহাদের পিনের সাহায্যে কি প্রকারে প্রমাণ করিবে?

3. কেন হয় বল :— (i) কোন জলপূর্ণ চৌবাচ্চাকে অগভীর মনে হয়। (ii) জলে তির্যকভাবে আংশিক নিমজ্জিত দণ্ডকে বাঁকা ও ছোট দেখায়। (iii) ভুসো মাখানো লোহার বলকে জলে ডুবাইলে উজ্জ্বল দেখায়। (iv) জলের মধ্যে বায়ুর বুদ্‌বুদ্‌কে উজ্জ্বল দেখায়।

4. সংজ্ঞা বল :— (i) আলোক-কেন্দ্র, (ii) মুখ্য ফোকস্, (iii) ফোকস্-দূরত্ব ও (iv) উত্তল লেন্স।

5. মরীচিকা কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ব্যাখ্যা কর।

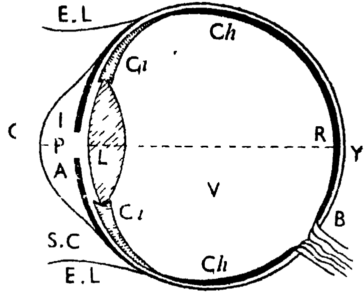
6. উত্তল লেন্সে প্রতিবিম্বের অবস্থান চিত্রের সাহায্যে দেখাও, যখন বস্তু (i) 2f-এ অবস্থিত (ii) f ও 2f-এর মধ্যে অবস্থিত।

7. অবতল লেন্সে চিত্র সাহায্যে আলোকের প্রতিসরণ দেখাও।

চতুর্থ পাঠ

চক্ষু (Eye), অণুবীক্ষণ (Microscope), দূরবীক্ষণ (Telescope)

47. চক্ষুর গঠন : চক্ষু একটি প্রাকৃতিক ক্যামেরা। ক্যামেরার পশ্চাৎ দিকে ফটোগ্রাফিক প্লেটে কোন বস্তুর ছবি উঠে। চক্ষুদ্বয় বস্তুর সদৃ প্রতিবিম্ব অক্ষিপট (retina) নামক আলোক-সুগ্রাহী (sensitive) পর্দায় উৎপন্ন করে। উহার অনুভূতি স্নায়ুতন্ত্রের (nerves) সাহায্যে মস্তিষ্কে পৌঁছায়।



চিত্র 66 : চক্ষুর গঠন।

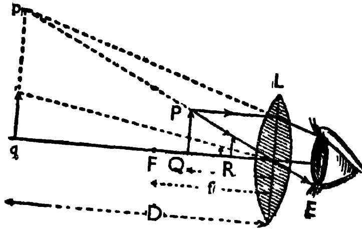
মুখমণ্ডলের নাসিকার দুই পাশে দুইটি **অক্ষি কোটরের** (socket) মধ্যে দুইটি অক্ষি-গোলক (eye-ball) বসানো থাকে। প্রত্যেকের আকার গোল এবং ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। অক্ষি-গোলকের চারিধারে অস্বচ্ছ পেশীসমূহের শক্ত আবরণ থাকে। উহাকে **শ্বেত মণ্ডল** (sclera, S. C) বলে। কেবল শ্বেত মণ্ডলের যে অংশ অক্ষি গোলকের সম্মুখে থাকে তাহা স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল। উহাকে **অচ্ছোদ-পটল** (cornea, C) বলে। অচ্ছোদ-পটল চক্ষুর ভিতর ধূলাবালি প্রবেশ করিতে দেয় না। শ্বেত মণ্ডলের ভিতরের অংশকে **কোরয়েড** (choroid, Ch) বলে। উহার বর্ণ কালো। অচ্ছোদ-পটলের পশ্চাতে একটি স্বচ্ছ কালো পেশী নির্মিত অস্বচ্ছ পর্দা (diaphragm) থাকে। উহাকে **কনীনিকা** (iris) বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের চক্ষুর কনীনিকার বর্ণ বিভিন্ন হয়। এই কনীনিকার বর্ণই চক্ষুর বর্ণ। কনীনিকার মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে। উহাকে **তারা-রন্ধ্র** (pupil, P) বলে। কনীনিকার দুই পাশে সংযুক্ত অনৈচ্ছিক (involuntary) পেশী সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিয়া তারা-রন্ধ্রকে ছোট-বড় করা যায়। তীব্র আলোকে উহা ছোট হয় এবং ক্ষীণ আলোকে উহা বড় হয়। তারা-রন্ধ্রের পশ্চাতে একখানি **উভোত্তল লেন্স** (double convex lens, L) থাকে। উহা পশ্চাৎ দিকে অধিক বক্র। লেন্স তন্তু (suspensory ligament) পেশীর (ciliary muscle, Ci) দ্বারা ভিতরের আবরণের সহিত যুক্ত। পেশীর সাহায্যে লেন্সের বক্রতা (curvature) বাড়ানো বা কমানো যায়। লেন্স ও কনীনিকার মধ্যস্থল এবং লেন্সের

পশ্চাতের অংশ স্বচ্ছ তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। প্রথম তরলকে aqueous humour, (A) এবং দ্বিতীয় তরলকে vitreous humour, (V) বলে। লেন্সের পশ্চাতে কোরয়েডের গায়ে **অক্ষিপট** থাকে। উহাতে লাল অর্ধ-স্বচ্ছ পর্দা থাকে। চক্ষুনার্ভ (optic nerve) হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম নার্ভ এই অংশে ছড়াইয়া থাকে। উহা আলোক সুগ্রাহী, তবে সর্বত্র উহার আলোক সচেতনতা সমান নয়। অক্ষিপটের মাঝামাঝি দুই মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত নিম্ন স্থানের আলোক সচেতনতা সর্বাপেক্ষা অধিক। উহাকে **হলুদে বিন্দু** (yellow spot, Y) বলে। অক্ষিপটের ঠিক নিম্ন অংশকে **অন্ধবিন্দু** (blind spot, B) বলে। এই অংশে প্রতিবিম্ব পড়িলে বস্তুকে দেখা যায় না। অচ্ছোদ পটল হইতে অক্ষিপটের দূরত্ব 21 মি. মি.। চক্ষুকে বন্ধ করিবার জন্য উহার সম্মুখে পাতা থাকে।

48. চক্ষুর ক্রিয়া: অচ্ছোদ পটল, aqueous humour, লেন্স, vitreous humour—সবগুলি মিলিয়া একটি অভিসারী সমবায় গঠন করে। আমরা যখন কোন বস্তুকে দেখি, তখন বস্তু হইতে আলোক-রশ্মি তারা-রন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া উপরোক্ত সমবায়ের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া অক্ষিপটে সদ্, উল্টা ও ছোট প্রতিবিম্ব গঠন করে। চক্ষুনার্ভ এই অনুভূতিকে সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে পাঠায় তখন আমরা বস্তুকে দেখিতে পাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতিবিম্ব উল্টা হইল কিন্তু আমরা উল্টা প্রতিবিম্ব দেখি না কেন? বিশেষ মানসিক অবস্থার (mental interpretation) জন্য উহাকে আমরা সোজা দেখি।

কোন বস্তুকে দেখিতে হইলে উহার প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে পড়া চাই। আবার অক্ষিপটের ও লেন্সের দূরত্ব নির্দিষ্ট; উহা কমে না, বাড়ে না। লেন্সের দূরত্ব একই থাকিলে চক্ষুর সম্মুখে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে পড়িবে না। সুস্থ চক্ষুর লেন্সের সহিত সংযুক্ত পেশী সংকুচিত বা প্রসারিত করিয়া লেন্সের উত্তলতা (convexity) ও সঙ্গে সঙ্গে ফোকস্-দূরত্ব এমনভাবে পরিবর্তন করা যায় যে কোন বস্তু দুইটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে যেখানেই থাকুক না কেন, প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে পড়িবেই। চক্ষুর পেশীর সাহায্যে লেন্সের উত্তলতা ও ফোকস দূরত্বের পরিবর্তনের ক্ষমতাকে **উপযোজন** (accomodation) বলে। যে নিকটতম বিন্দুতে চক্ষু উপযোজনের সাহায্যে কোন বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখে তাহাকে **নিকট** বা **আন্তিক বিন্দু** (near point) বলে। যে দূরতম বিন্দুতে

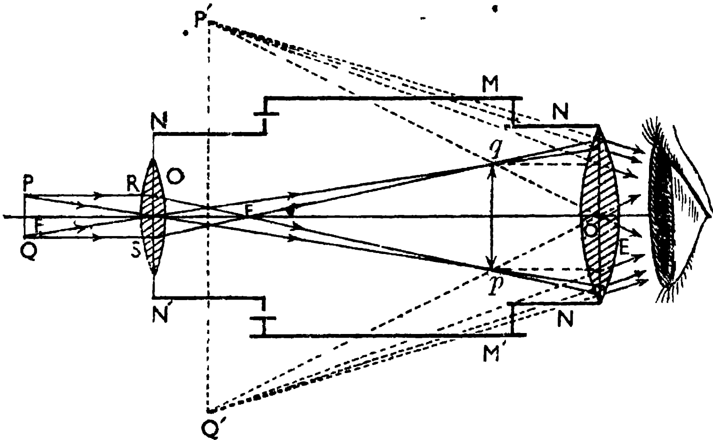
চক্ষু উপযোজনের সাহায্যে কোন বস্তুকে স্পষ্টভাবে দেখে তাহাকে **দূর বা প্রান্তিক বিন্দু** (far point) বলে। চক্ষু হইতে আন্তিক দূরত্বকে **স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব** (least distance of distinct vision) বলে। এই দূরত্ব অপেক্ষা কম দূরত্বে কোন বস্তু অবস্থিত হইলে চক্ষু উপযোজন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াও উহার প্রতিবিম্বকে অক্ষিপটে ফেলিতে পারে না। সুস্থ (normal) চক্ষুর পক্ষে নিকট বিন্দুর দূরত্ব = 25 সে. মি. এবং দূর বিন্দুর দূরত্ব অসীম। দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে **দৃষ্টিপাল্লা** (range of vision) বলে। তোমরা কোন কাগজের লেখা ধীরে ধীরে চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব মাপিতে পার।



চিত্র 67 : সরল অণুবীক্ষণ।

দুই চক্ষুর জন্য অক্ষিপটে দুইটি প্রতিবিম্ব গঠিত হইলেও মস্তিষ্ক দুই প্রতিবিম্বকে এক প্রতিবিম্বে পরিণত করে।

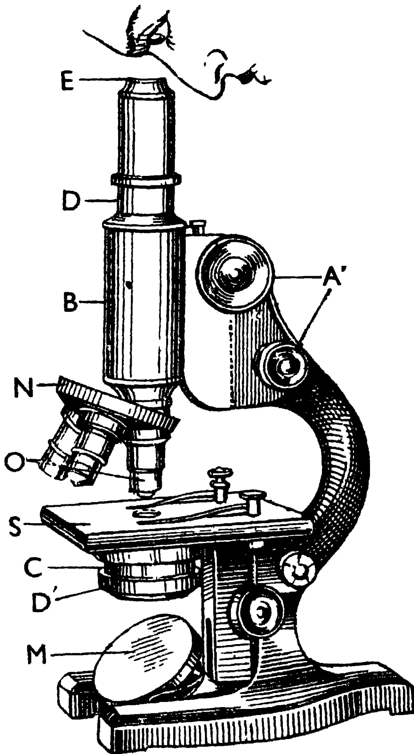
49. অণুবীক্ষণ : সরল অণুবীক্ষণ (Simple microscope) :



চিত্র 68 : যৌগিক অণুবীক্ষণের নীতি।

যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা ক্ষুদ্র বস্তুকে বৃহৎ রূপে দেখিতে পাই তাহাকে **অণুবীক্ষণ** (microscope) বলে।

কোন বস্তু সুস্থ চক্ষুর স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বের (25 সে. মি.) কম দূরত্বে থাকিলে আমরা উহাকে কি প্রকারে স্পষ্ট দেখিতে পাই ? মনে কর চিত্রে এই ন্যূনতম দূরত্ব = D এবং R দূরত্বে বস্তু PQ আছে। E চক্ষুর খুব নিকটে একটি উভোত্তল লেন্স রাখিলে D দূরত্বে PQ বস্তুর একটি সোজা **বিবর্ধিত** প্রতিবিম্ব pq গঠিত হয়। এই প্রতিবিম্ব চক্ষুর লেন্সের পক্ষে বস্তুর কাজ করে এবং pq-এর একটি প্রতিবিম্ব অক্ষিপটে গঠিত হয়। এই উভোত্তল লেন্সকে **বিবর্ধক কাচ** (magnifying glass) বা **সরল অণুবীক্ষণ** বলে। এই যন্ত্র দিয়া হাত ঘড়ির কলকব্জা, হাতের রেখা, ছোট লেখা দেখা যায়। লেন্সটি একটি ধাতব হাতলে লাগানো থাকে।



চিত্র 69 : যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

যৌগিক অণুবীক্ষণ (Compound microscope) :

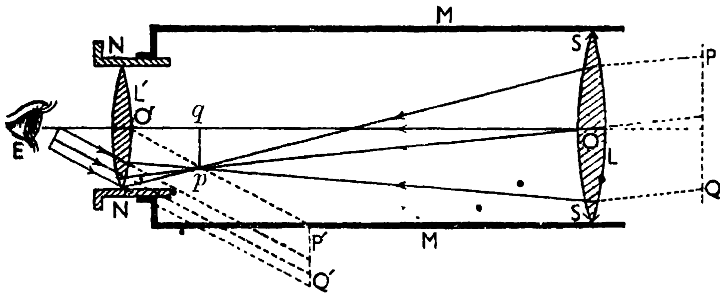
এই যন্ত্রে দুইটি উভোত্তল লেন্স O ও E' দুইটি পিতলের নলের ভিতর বসানো থাকে। এই দুইটি নল সমাক্ষভাবে (coaxially) একটি আর একটির মধ্যে অবস্থিত যাহাতে একটিকে ঢুকাইয়া বা বাহির করিয়া যুক্তনলের দৈর্ঘ্য ছোট-বড় করা যায়। E লেন্সের ফোকস দূরত্ব O লেন্সের ফোকস দূরত্ব অপেক্ষা বৃহত্তর। বস্তু PQ এর একটি বিবর্ধিত সদ্ ও উল্টা pq প্রতিবিম্ব E লেন্সের সম্মুখে গঠিত হয়। এখন E লেন্সকে এমনভাবে এদিক-ওদিক সরাও যাহাতে pq প্রতিবিম্ব E লেন্সে ফোকস দূরত্বের মধ্যে থাকে। E লেন্স কর্তৃক pqর একটি সোজা ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। দর্শক E লেন্সকে

সামান্ত এদিক-ওদিক সরাইয়া এই অসদ্ প্রতিবিম্বকে চক্ষুর স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্বে আনে।

সমস্ত যন্ত্রটি একটি পিতলের দণ্ডের উপর বসানো থাকে। S প্লাটফরমের একটি ছিদ্রের উপর কাচপাতে (glass slide) পরীক্ষাধীন বস্তুকে রাখা হয়। M দর্পণ হইতে উজ্জ্বল প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি প্লাটফরমের ছিদ্র দিয়া বস্তুর উপর পড়িলে বস্তুটি খুব আলোকিত হয়। A স্ক্রুকে ঘুরাইয়া নলের দৈর্ঘ্য কম-বেশী করা হয়।

এই যন্ত্র দিয়া নিকটস্থ ছোট বস্তুকে খুব বড় দেখায়। এই যন্ত্র দিয়া বিভিন্ন জীবাণু, রক্তের উপাদান প্রভৃতি দেখা যায়।

50. দূরবীক্ষণ (Telescope) : এই যন্ত্র দ্বারা বহু দূরের বস্তুর বড় ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব নিকটে দেখা যায়। এই যন্ত্রে দুইটি উভোত্তল লেন্স



চিত্র 70 : দূরবীক্ষণ।

L ও L′ একটি পিতলের নল M-এর ভিতর একই অক্ষ OO′-এর উপর অবস্থিত থাকে। L-এর ফোকস দূরত্ব ও উন্মেষ (aperture) L′-এর ফোকস দূরত্ব ও উন্মেষের অপেক্ষা বড়। L লেন্স S স্ক্রু দ্বারা M-এর এক প্রান্তে আঁটা থাকে। টানা N নলে L′ লেন্স থাকে। N নলকে ভিতরে বা বাহিরে সরাইয়া দুই লেন্সের মধ্যে দূরত্ব বাড়ানো বা কমানো যায়।

বহু দূরের কোন বস্তু হইতে আগত সমান্তরাল PQ রশ্মিগুচ্ছ L লেন্সের মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইয়া উহার প্রধান ফোকসে সদ্, উল্টা ও ক্ষুদ্রতর প্রতিবিম্ব কিন্তু উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব pq গঠন করে। এখন দূরবীক্ষণকে সাধারণ দৃষ্টির জন্য ব্যবস্থিত করিতে হইলে L′কে এমন স্থানে আনা হয় যে উহার প্রধান ফোকস্ pq-এর

উপর পড়ে। সুতরাং pq হইতে নির্গত রশ্মি L′-এর মধ্য দিয়া প্রতিসরণের পর সমান্তরালে চলিয়া যায় এবং L′-এর পশ্চাতে OP′ অভিমুখে সাধারণ চোখ একটি অসদ্ বর্ধিত প্রতিবিম্ব P′Q′ দেখে।

অনুশীলনী

1. মানুষের চক্ষু অঙ্কিত কর। উহার বিশেষ প্রধান অংশগুলির কার্য বর্ণনা কর।

2. চক্ষুর লেন্স, পেশী ও পাতার উপকারিতা কি ?

3. সরল অনুবীক্ষণ কাহাকে বলে চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

4. যৌগিক অনুবীক্ষণের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

5. দূরবীক্ষণের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

পঞ্চম পাঠ

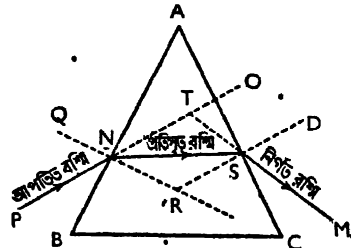
প্রিজম ও আলোকের বিচ্ছুরণ

(Prism and Dispersion of light)

51. প্রিজম: তোমরা ঝাড়লণ্ঠনে ত্রিফলক বা তেশিরা কাচ দেখিয়াছ। উহার আকার প্রিজমের মত। একখানা বই খুলিয়া টেবিলের উপর খাড়া করিয়া রাখিলে প্রিজমের মত দেখায়।

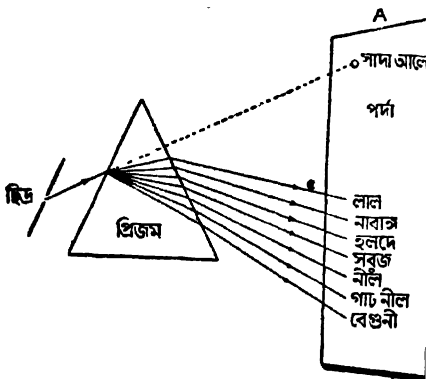
কোন স্বচ্ছ প্রতিসরণকারী (refracting) মাধ্যমের দুইটি আনত আয়তাকার সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ অংশকে **প্রিজম** (71 চিত্রে ABC) বলে। সমতল পৃষ্ঠকে প্রিজমের **প্রতিসারক** তল বলে। দুইটি প্রতিসারক তলের মধ্যবর্তী কোণকে **প্রিজমের কোণ** (∠BAC) বলে। দুই প্রতিসারক তলের মিলন রেখাকে **প্রিজমের প্রান্ত** (edge, AB, AC) বলে। প্রিজমের কোণের বিপরীত তলকে **প্রিজমের ভূমি** (base, BC) বলে। দৈর্ঘ্যের দিকে উহার তিনটি শিরা থাকে, সেইজন্য উহাকে তেশিরা কাচ বলে।

52. প্রিজমের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of light) : ABC কাচের প্রিজমকে বায়ু-মাধ্যমের মধ্যে বসানো আছে। মনে কর PN রশ্মি তির্যকভাবে AB তলে পতিত হইল। AB তলে উহা প্রতিস্থত হইয়া দ্বিতীয় মাধ্যমে NR অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া NS পথে যাইবে। পুনরায় এই প্রতিস্থত রশ্মি দ্বিতীয় মাধ্যম কাচ হইতে বায়ুতে DS অভিলম্ব হইতে সরিয়া SM পথে প্রতিস্থত হইবে। তখন উহা ভূমি BC-র দিকে অধিক বাঁকিবে। PNSM হইল রশ্মির সম্পূর্ণ পথ। প্রিজম না থাকিলে রশ্মি PNTO পথে যাইত।



চিত্র 71 : প্রিজমের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণ।

53. আলোকের বিচ্ছুরণ : একটি সূক্ষ্ম লম্ব (vertical) ছিদ্রের (slit) মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি বা অন্য কোন সাদা আলোকের রশ্মি প্রবেশ করাইয়া একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর স্থাপিত প্রিজমের প্রতিসারক তলে নিক্ষেপ কর যেন আলোক-রশ্মি দুইবার প্রতিস্থত হইয়া পিছনে অবস্থিত একটি পর্দায় প:ড।

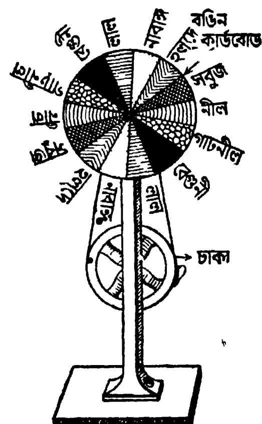


চিত্র 72 : প্রিজমের মধ্য দিয়া আলোকের বিচ্ছুরণ।

প্রিজম হইতে নির্গত রশ্মি বিচিত্র বর্ণের আলোকে বিশ্লিষ্ট হয় এবং বিশ্লিষ্ট আলোকরশ্মি বিভিন্ন কোণে ভূমির দিকে বাঁকিয়া যায়। এই বিশ্লিষ্ট রশ্মিগুলিকে মোটামুটি সাতটি বর্ণে বিভক্ত করা যায়। পর্দায় উহারা আলোক-পটিতে পরিণত হয়। পর্দার উপর হইতে নিচের দিকে পর পর **লাল** (red), **কমলা** (orange), **হলুদে** (yellow), **সবুজ** (green), **নীল** (blue), **গাঢ় নীল** (indigo), **বেগুনী** (violet) বর্ণের পটি দেখা যায়। উল্টা দিক

হইতে বর্ণের ইংরেজী নামের আদি অক্ষর লইয়া Vibgyor শব্দ গঠিত হইয়াছে। এই শব্দ মনে রাখিলে বর্ণের নামগুলি পর পর ধরা যায়। নিউটন 1667 খৃস্টাব্দে এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে সাদা আলো মৌলিক নহে, উহা সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকের সমন্বয়ে গঠিত। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, বেগুনী বর্ণের আলোকের বিসরণ (deviation) সর্বাপেক্ষা বেশী এবং লাল বর্ণের বিসরণ সর্বাপেক্ষা কম। এই সকল বর্ণের সমাবেশ আমরা রামধনুতে দেখিতে পাই। সাদা আলোকের এইরূপ বিভিন্ন বর্ণের আলোকে বিশ্লেষণকে **বিচ্ছুরণ** বলে। রঙিন পটিকে **বর্ণালি** (Spectrum) বলে। বিশ্লিষ্ট সূর্যালোকের পটিকে **সৌর বর্ণালি** বলে।

54. সাদা আলোর পুনরুৎপাদন (Reproduction of white light): ভিন্ন ভিন্ন সাতটি বর্ণ হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে সাদা বর্ণ উৎপন্ন হয়। এক ফুট ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার কার্ডবোর্ডকে চারিটি সমান অংশে ভাগ কর। সৌর বর্ণালিতে সাতটি বর্ণ যে অনুপাতে জায়গা দখল করে সেই অনুপাতে কার্ডবোর্ডের প্রত্যেক ভাগ সাতটি বিভিন্ন বর্ণে রঙিন কর। কার্ডবোর্ডকে জোরে ঘুরাইলে প্রতিটি বর্ণ পৃথকভাবে দেখা যায় না। সমস্ত কার্ডবোর্ডকে সাদা মনে হইবে। কার্ডবোর্ডের দ্রুতগতির জন্য আমাদের অক্ষিপটে সাতটি বর্ণের অনুভূতি একের সঙ্গে অপরে মিশিয়া যায়। সেইজন্য কার্ডবোর্ডকে সাদা দেখায়।

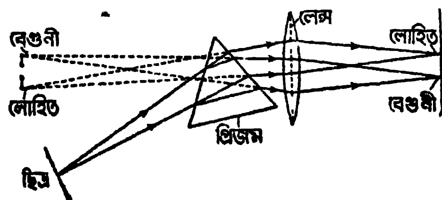


চিত্র 73 : সাতবর্ণের সমাবেশে সাদা আলোর অনুভূতি।

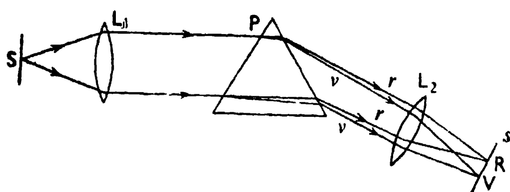
55. শুদ্ধ বর্ণালি প্রস্তুতি: উপরোক্ত উপায়ে উৎপন্ন বর্ণালিতে একটি বর্ণের উপর অপর বর্ণ আংশিক ভাবে আসিয়া পড়ে। এইরূপ বর্ণালিকে অশুদ্ধ বর্ণালি (Impure spectrum) বলে। শুদ্ধ (Pure) বর্ণালিতে বিভিন্ন বর্ণগুলি পরস্পর মিশ্রিত থাকে না।

S সরু ছিদ্রের মধ্য দিয়া নির্গত উজ্জ্বল সাদা আলোকের পথে একটি উত্তল লেন্স এমনভাবে রাখ যাহাতে S ছিদ্র উত্তল লেন্সের ফোকসে থাকে এবং লেন্স হইতে প্রতিসৃত রশ্মি P প্রিজমে সমান্তরালে পড়ে। প্রত্যেক রশ্মিই বর্ণালি

উৎপাদন করে। আবার প্রিজম হইতে প্রতিসৃত ও বিচ্ছুরিত রশ্মি L_2 উত্তল লেন্সে পড়ে। উহাকে প্রিজম ও পর্দার মধ্যে এমনস্থানে রাখ যাহাতে এই



চিত্র 74 : শুদ্ধ বর্ণালি প্রস্তুতি।



চিত্র 75 : শুদ্ধ বর্ণালি প্রস্তুতি।

লেন্স বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলিকে পর্দায় কেন্দ্রীভূত করে। এইভাবে পর্দায় শুদ্ধ বর্ণালি উৎপন্ন হয়।

56. বর্ণতত্ত্ব : প্রকৃতির চারিদিকে আমরা বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাই। পাতা সবুজ, আকাশ নীল, বেগুন নীল, সিঁদুর লাল, কালি কালো, কাগজ সাদা। বিভিন্ন পদার্থের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের কারণ কি? নিউটন স্থির করেন যে বর্ণ পদার্থের কোন বিশিষ্ট ধর্ম নয় অর্থাৎ পদার্থের নিজস্ব বর্ণ নাই। পদার্থের বর্ণ নির্ভর করে উহার বিভিন্ন বর্ণের আলোক শোষণ করিবার বা আলোক প্রতিফলন বা প্রতিসরণ করিবার ক্ষমতার উপর। কাচ স্বচ্ছপদার্থ। নীল কাচে সাদা আলো আপতিত হইলে নীল কাচ সাদা আলোক বিশ্লেষণ করিয়া নীল বর্ণের আলো ভিন্ন অন্য সকল বর্ণের আলো শোষণ করিয়া লয়; কেবল নীল আলো স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়া আমাদের চোখে পড়ে, আমরা কাচকে নীল দেখি।

হল্‌দে জবা অস্বচ্ছ পদার্থ। হল্‌দে জবার উপর সাদা আলো আপতিত হইলে হল্‌দে জবা সাদা আলোকে বিশ্লেষণ করিয়া হল্‌দে বর্ণ ভিন্ন অন্য সকল বর্ণ শোষণ করিয়া লয়। কেবল হল্‌দে আলো অস্বচ্ছ জবার পৃষ্ঠদেশ হইতে বিক্ষিপ্ত বা প্রতিফলিত হইয়া চোখে পড়ে।

সাদা কাগজ সাদা আলোর কোন বর্ণই শোষণ করে না। উহা সাতটি বর্ণই প্রতিফলন করে। সেই প্রতিফলিত সাতটি বর্ণ একত্র মিলিয়া সাদা বর্ণের অনুভূতি জাগায়। সকল বর্ণের সমাবেশই সাদা বর্ণের কারণ।

কালো কালি সাদা আলোর সব বর্ণই শোষণ করে, কোন বর্ণই প্রতিফলন করে না। সেইজন্য উহাকে কালো দেখি। সকল বর্ণের অনুপস্থিতিই কালো বর্ণের কারণ।

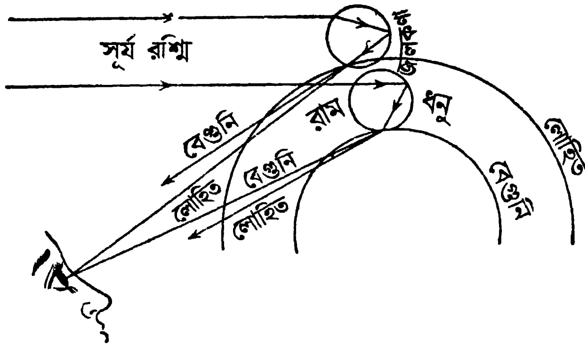
হলদে জবাকে সাদা আলোয় হলদে দেখায়। উহা ঐ পদার্থের প্রকৃত বর্ণ। হলদে জবাকে লাল বর্ণের আলোকে আলোকিত ঘরে রাখিলে উহাকে কালো দেখাইবে, কারণ ঘরের মধ্যে আছে কেবল লাল আলো। হলদে জবা হলদে আলো ভিন্ন সব বর্ণের আলো শোষণ করে। সুতরাং ঘরের লাল আলো ফুলে পডিবামাত্র উহা শোষিত হয় এবং ফুল হইতে কোন আলোই প্রতিফলিত হয় না। বর্ণের অভাবের জন্য ফুলকে কালো দেখায়; আবার হলদে জবাকে হলদে আলোয় রাখিলে উহাকে আরও উজ্জ্বল দেখায়।

নীল কাচ ও লাল কাচ পর পর রাখিয়া লাল কাচের পশ্চাৎ হইতে কোন বস্তুকে দেখিলে উহাকে কালো দেখায় কেন ? নীল কাচ নীল আলো ভিন্ন এবং লাল কাচ লাল আলো ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের আলোকে উহাদের ভিতর দিয়া যাইতে দেয় না। সুতরাং বস্তু হইতে সাদা আলো প্রথমে নীল কাচে আপতিত হইলে উহা কেবল নীল আলোকে আসিতে দেয়। নীল আলো আবার লাল কাচে আপতিত হইলে উহা লাল কাচ দ্বারা শোষিত হয়। সেইজন্য বস্তু হইতে কোন আলো আসিবে না। বর্ণের অভাবে বস্তুকে কালো দেখাইবে।

57. রামধনু (Rainbow) : বায়ুমণ্ডলে ভাসমান বৃষ্টির ফোঁটার বা ফোয়ারার জলকণায় সূর্যালোক আপতিত হইলে সূযরশ্মি জলকণা দ্বারা প্রতিফলিত, প্রতিসৃত ও বিচ্ছুরিত হইয়া আকাশে যে সৌর বর্ণালির সৃষ্টি করে তাহাকে **রামধনু** বলে। জলকণা প্রিজমের কাজ করে কিন্তু এই কাজের জন্য জলকণাগুলি একটু বড হওয়ার প্রয়োজন। বৃষ্টির পূর্বে ও পরে জলকণা একটু বড থাকে। সেইজন্য বৃষ্টির পূর্বে ও পরে রামধনু দেখা যায়।

সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে জলবিন্দুর উপর আপতিত হইলে লালবর্ণের আলো সর্বাপেক্ষা কম এবং বেগুনী বর্ণের আলো সর্বাপেক্ষা বেশী বিচ্ছুরিত হয়। জলকণার সম্মুখ-তলে সূর্যরশ্মি প্রতিসৃত ও বিচ্ছুরিত হইয়া জলকণার মধ্যে ঢোকে এবং বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলি জলবিন্দুর পশ্চাৎতলে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়া পুনরায়

প্রতিসৃত হইয়া বাহির হয়। প্রতিফলনের জন্য বিশ্লিষ্ট বর্ণগুলির ক্রমবিন্যাস উল্টাইয়া যায়। সুতরাং রামধনুতে সর্বোপরি লোহিত বর্ণ, সর্ব নিম্নে বেগুনী বর্ণ



চিত্র 76 : রামধনু।

থাকে। সূর্যরশ্মি জলকণার ভিতর একবার প্রতিফলিত হইলে স্পষ্ট **মুখ্য** (Primary) **রামধনু,** দুইবার প্রতিফলিত হইলে অস্পষ্ট **গৌণ** (Secondary) **রামধনু** দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. প্রিজমের মধ্য দিয়া আলোকের প্রতিসরণ চিত্র দ্বারা দেখাও।
2. শুদ্ধ বর্ণালি কাহাকে বলে? উহাকে কিরূপে গঠন করা যায়?
3. পদার্থের বর্ণের কারণ কি? লাল ফুল সাদা আলোয় লাল এবং সবুজ আলোয় কালো দেখায় কেন?
4. সাদা আলোর বিচ্ছুরণ প্রিজমের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।
5. রামধনুর উৎপত্তির কারণ কি?
6. সাত বর্ণের সমাবেশে সাদা আলোর গঠন কি প্রকারে দেখা যাইবে?

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে Objective Type প্রশ্নাবলী

1. **Recall type :** সকলের শেষে শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) আমাদের মনে হয় আমরা আলোক দেখি কিন্তু বাস্তবিক আলোক— ।

(খ) ছায়ার যে অংশে উৎসর সকল অংশ হইতে আলোক পৌঁছায় না তাহার নাম— ।

2. **Completion type :** শূন্যস্থান পূরণ কর :—

দুইটি দর্পণের প্রতিফলক তলের মধ্যবর্তী
—(1) বদলাইলে উহাদের দ্বারা গঠিত —(1)
—(2) সংখ্যা বদলান যায়। উহারা —(2)
সমান্তরাল হইলে—(3)টি প্রতিবিম্ব
দেখা যায়। উহারা সমকোণে থাকিলে —(3)
—(4) টি প্রতিবিম্ব হয়। —(4)

3. **Association type :**

. চিহ্নের পূর্বে দুইটি শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক :: চিহ্নের পরেও দুই শব্দের মধ্যে কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক ; শূন্য স্থানের সম্পর্ক বাহির কর।

অবতল দর্পণ : উত্তল দর্পণ :: সদ্ ফোকস্ :— ?
উত্তল লেন্স : পর্দা :: চক্ষুর লেন্স :— ?

4. **Alternate Response type :**

True or False type : সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও।

1. পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে আসিলে সূর্যগ্রহণ হয়।
2. আলোক সরলপথে গমন করে।
3. প্রতিফলনে আপতন কোণ প্রতিফলন কোণ অপেক্ষা বড়।
4. সূচী-ছিদ্র ক্যামেরায় উল্টা প্রতিবিম্ব দেখা যায়।

Yes or No type : হাঁ কি না উত্তর দাও :—

1. সাত বর্ণে রঞ্জিত চাকতিকে জোরে ঘুরাইলে সাদা দেখায় কি ?
2. আলোক-রশ্মি লঘুতর মাধ্যম হইতে ঘনতর মাধ্যমে যাইলে অভিলম্ব হইতে দূরে বাঁকিয়া যায় কি ?

5. **Multiple choice type :**

জলে লাঠি ডুবাইলে বাঁকা দেখায়, কারণ—

(i) লাঠির নিমজ্জিত অংশ হইতে আলোক প্রতিফলিত হয়।
(ii) লাঠির নিমজ্জিত অংশ হইতে আলোক প্রতিসৃত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

তাপ (Heat)

প্রথম পাঠ

তাপের উৎস (Sources of Heat)

58. তাপের প্রকৃতি : এক খণ্ড লৌহকে বৈশাখ মাসে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দিলে উহা হাতে উষ্ণ লাগে। উহাকে রাত্রে বাহিরে রাখিলে হাতে শীতল লাগে। অতএব দুই অবস্থায় লৌহে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। কোন শক্তি ব্যতীত বস্তুর অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। শীতল লৌহে কিছু শক্তির সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া উহা উষ্ণ হইয়াছে। এই শক্তি হইল **তাপ**। শীতোষ্ণতার বাহ্যিক কারণ তাপ-শক্তি।

অণুর গতীয় শক্তি হইতে তাপ উদ্ভূত হয়। কোন বস্তুকে উষ্ণ করার অর্থ উহার অণুর গতি বৃদ্ধি করা। আবার কোন বস্তুকে শীতল করার অর্থ উহার অণুর গতি হ্রাস করা।

59. তাপের উৎস (Sources of Heat) : নিম্নলিখিত উৎস হইতে তাপশক্তি সরবরাহ হয় :—

(i) **সূর্য (Sun) :** সূর্য তাপের কেন, সমস্ত পার্থিব শক্তিরই মূল ও প্রধান উৎস। সূর্য হইতেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরা তাপ পাইয়া থাকি। সূর্যের উপাদান গুলির পরমাণুর-বিভাজনের (atomic fissure) ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অনবরতঃ তাপ শক্তি উদ্ভূত হয়; উহা তাপের একটি বিরাট কারখানা। সূর্যতাপের ফলে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ ঘটে। সুতরাং সূর্যতাপ-না থাকিলে পৃথিবী মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত হইত।

(ii) **রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical reaction) :** কয়লা, কাঠ, পেট্রোল প্রভৃতি জ্বালাইলে উহাদের উপাদানের সহিত বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিরূপে উদ্ভূত হয়।

(iii) **তড়িৎ উৎস (Electricity) :** সরু তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত হইলে উহা খুব উষ্ণ হয় এবং প্রচুর তাপ উদ্ভূত হয়। এই নীতির সুযোগ লইয়া তড়িৎ-ইস্ত্রি, তড়িৎ-উনান প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

(iv) **যান্ত্রিক উৎস** (Mechanical source) : দুইখানি পাথর ঠুকিলে ঘর্ষণের ফলে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়। পাথরের চাকতি ঘুরাইয়া লৌহের অস্ত্রপাতি শান দিবার সময় পাথরের সহিত লৌহের ঘর্ষণে তাপ উৎপন্ন হয় এবং আগুনের ফুল্‌কি বাহির হয়।

অনুশীলনী

1. তাপ এক প্রকার শক্তি—উদাহরণ দ্বারা বোঝাও।
2. আমরা কি উপায়ে তাপ পাইয়া থাকি ?
3. কি বা কেন হয় বল :—(i) দুইটি পাথর ঠুকিলে (ii) কয়লা পুড়াইলে (iii) সরু তারের মধ্যে তড়িত প্রবাহিত করাইলে।
4. তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য কি ?

দ্বিতীয় পাঠ

তাপের ফল (Effects of Heat)

60. **তাপের ফল** : তাপশক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় অদৃশ্য। উহার ফল দ্বারা আমরা উহাকে অনুভব করি। বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে নিম্নলিখিত ফলগুলি দেখা যায় :—

(i) **আয়তন-বৃদ্ধি** : কোন বস্তু কঠিন, তরল বা বায়বীয়—যাহাই হউক উহাতে তাপ প্রয়োগ করিলে সাধারণতঃ উহার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তাপ অপসারণ করিলে সাধারণতঃ বস্তুর আয়তন হ্রাস পায়।

(ii) **উষ্ণতা-বৃদ্ধি** : কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং তাপ অপসারণ করিলে উষ্ণতা হ্রাস পায়।

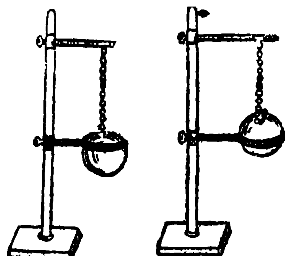
(iii) **অবস্থার পরিবর্তন** : কোন কঠিন বস্তুতে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগ করিলে উহা পর পর তরলে ও গ্যাসে পরিণত হয়। যেমন, তাপ-প্রয়োগে বরফ হইতে জল, জল হইতে বাষ্প পাওয়া যায়। তাপ অপসারণে গ্যাস হইতে তরল এবং তরল হইতে কঠিন অবস্থা পাওয়া যায়। যেমন, তাপ অপসারণে জলীয় বাষ্প হইতে জল, জল হইতে বরফ পাওয়া যায়।

(iv) **বাহ্যিক গুণের পরিবর্তন** : কোন কোন বস্তুতে তাপ-প্রয়োগে উহাদের স্থিতি-স্থাপকতা, তড়িৎ-তাপ-পরিবহন ক্ষমতা প্রভৃতি বাহ্যিক গুণের পরিবর্তন হয়। অনেক পদার্থকে অধিক উত্তপ্ত করিলে উহারা ভাস্বর (incandescent) হয়।

(v) **রাসায়নিক পরিবর্তন :** তাপ-প্রয়োগে অনেক বস্তুর গঠনমূলক পরিবর্তন হয়। চিনি তাপ-প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট হয়, আবার অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন তাপ-প্রয়োগে সংযুক্ত হইয়া জল হয়। কোন কোন বস্তু তাপ-প্রয়োগে জ্বলিয়া উঠে। যথা, কাঠে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার'উপাদান কারবন ও হাইড্রোজেন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়।

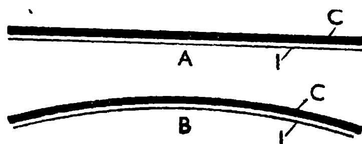
61. কঠিন বস্তুর প্রসারণ (Expansion of Solids) : প্রায় সব বস্তুই তাপ-প্রয়োগে প্রসারিত হয়। কঠিন পদার্থ দৈর্ঘ্যে, ক্ষেত্রফলে ও আয়তনে প্রসারিত হয়। তরল ও গ্যাস কেবল আয়তনে 'প্রসারিত হয়।

পরীক্ষা (i) একটি পিতলের আংটা একটি দণ্ডের সহিত বন্ধনী দিয়া আটকাও। একটি পিতলের বল শিকলের সাহায্যে একটি ক্ল্যাম্প (clamp) হইতে ঝুলাইয়া দাও। একই উষ্ণতায় বলটি ঠিক আংটার গা ঘেঁষিয়া গলিয়া যায়। আংটা হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া বলকে উত্তপ্ত কর। উহা তাপে প্রসারিত হয়। এইবার শীতল আংটার উপর রাখিলে উহা আংটায় আটকাইয়া থাকে। উহাকে Gravesand's Ball 'nd Ring পরীক্ষা বলে।

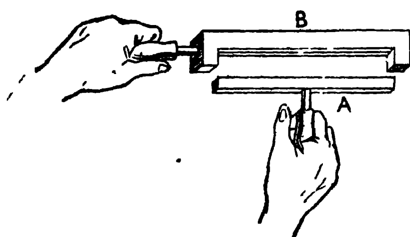


চিত্র 77 : কঠিন বস্তুর প্রসারণ।

(ii) **দ্বিধাতব পাত** (Bi-metallic strips) : দুইটি ধাতব পাত, যথা পিতল (C) ও লৌহ (I) পাত এক সঙ্গে পেরেক দিয়া আঁটিয়া (rivet) যুক্ত কর। সাধারণ উষ্ণতায় উহা সোজা থাকিবে। কিন্তু উত্তপ্ত করিলে পিতলের পাত বাহিরের দিকে এবং লৌহ পাত ভিতরের দিকে বাঁকে। আবার বরফের মধ্যে রাখিলে উহারা উল্টা দিকে বাঁকিবে। অর্থাৎ পিতল লৌহের চেয়ে তাপে অধিক প্রসারিত হয় এবং শৈত্যে অধিক সংকুচিত হয়।



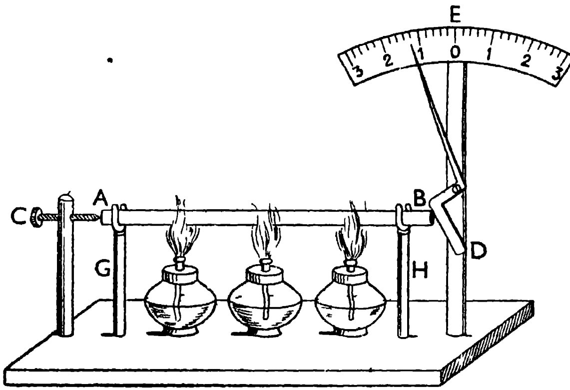
চিত্র 78 : দ্বিধাতব পাত।



চিত্র 79 : A দণ্ড তাপে বাড়িয়া যায়।

A ধাতব দণ্ড B পাতের খাপের মধ্যে শীতল অবস্থায় ঠিক ঘা ঘেষিয়া যায় কিন্তু A-কে গরম করিলে প্রসারিত হয় তখন খাপের মধ্যে আর যায় না।

(iii) **ফার্গুসনের পরীক্ষা :** চিত্রে AB দণ্ডকে দুইটি গোঁজ G ও H-এর উপর বসানো আছে। উহার বামে A প্রান্তে C স্ক্রু স্পর্শ করিয়া আছে এবং ডান প্রান্ত B একটি বাঁকানো শলাকার নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া আছে। শলাকার



চিত্র 40 : ফার্গুসন পরীক্ষা।

অপর প্রান্ত একটি E স্কেলের উপর ঘুরিতে পারে। দণ্ডকে উষ্ণ করিলে উহা দৈর্ঘ্যে বাড়ে কিন্তু উহার বাম দিক স্ক্রু দিয়া আটকানো থাকায় উহা ঐ দিকে বাড়িতে পারে না। উহা ডান দিকে বাড়িয়া শলাকার শেষপ্রান্তকে স্কেলের উপর বিপরীত দিকে ঠেলিয়া দেয়।

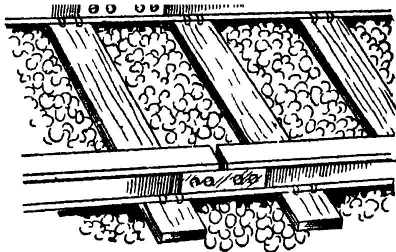
62. কঠিন বস্তুর প্রসারণের দৃষ্টান্ত : (i) গরম চিমনির উপর শীতল জল পড়িলে উহার সেই অংশ হঠাৎ সংকুচিত হয়। বাকী অংশ তাপে প্রসারিত থাকে। অসমান প্রসারণ ও সঙ্কোচনের জন্য চিমনি ফাটিয়া যায়। এইরূপ দিবারাত্রিতে উত্তাপের পার্থক্যের জন্য পাহাড়-পর্বতের প্রস্তরের কতক অংশ ধ্বসিয়া যায়।

(ii) বোতলের মুখে কাচের ছিপি আঁটিয়া যাইলে বোতলের মুখের বাহিরটা রুমাল দিয়া কয়েকবার ঘষিলে বা একটু গরম করিলে মুখের আয়তন একটু বাড়ে এবং ছিপি সহজেই খুলিয়া যায়।

(iii) রেল-বীম চাকার ঘর্ষণে ও সূর্যের তাপে বিস্তৃত হয়। সেইজন্য দুইটি

রেল-বীমের জোড়ামুখে ফাঁক রাখা হয় যাহাতে রেলগুলি ফাঁকের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে। উহারা পরস্পরকে ঠেলিয়া বাঁকিয়া যায় না।

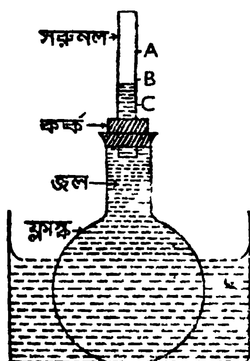
(iv) গরুর গাড়ীর কাঠের চাকার পরিধির চেয়ে লৌহের বেড়ের পরিধি একটু ছোট হয়। বেড়কে প্রথমে খুব উষ্ণ ও প্রসারিত করিয়া চাকায় লাগাইয়া জল ঢালিয়া শীতল করিলে বেড সংকুচিত হইয়া চাকায় জোরে আঁটিয়া বসে।


চিত্র 81 : রেল-বীমের জোড়ামুখে ফাঁক থাকে।

(v) মোটা কাচপাত্রে হঠাৎ গরম জল ঢালিলে পাত্রের ভিতর ও বাহির সমানভাবে প্রসারিত হয় না, কারণ কাচ তাপের কুপরিবাহী। সেইজন্য অনেক সময়ে পাত্র ফাটিয়া যায়।

63. তরল পদার্থের প্রসারণ (Expansion of Liquids) :

পরীক্ষা : একটি সরু গলা বিশিষ্ট ফ্লাস্ক রঙিন জলে পূর্ণ কর। ফ্লাস্কের মুখে ছিপি লাগাও। ছিপির মধ্য দিয়া দুই মুখ খোলা সমান ছিদ্রবিশিষ্ট সরু নল প্রবেশ করাও। মনে কর জলতল নলের মাঝখানে B দাগে আসিয়াছে। এইবার ফ্লাস্ককে অপর একটি বড় পাত্রের ফুটন্ত জলে বসাও। ফ্লাস্কের ভিতরকার জল গরম হইবার পূর্বে ফ্লাস্ক গরম জলের সংস্পর্শে আসিয়া আয়তনে বাড়ে। সেইজন্য এই বাড়তি স্থান পূর্ণ করিবার জন্য জলতল নামিয়া C দাগে আসে। আবার একই উষ্ণতায় কঠিন বস্তু অপেক্ষা জল আয়তনে অধিক প্রসারিত হয়। সেইজন্য কিছু পরে যখন কঠিন কাচ ও জল একই উষ্ণতায় আসে তখন জলতল পূর্বের B দাগ ছাপাইয়া A দাগ পর্যন্ত উপরে উঠে। এই ক্ষেত্রে **জলের প্রকৃত (real) প্রসারণ = জলের আপাত (apparent) প্রসারণ + পাত্রের প্রসারণ।**



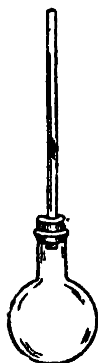
চিত্র 82 : তরলের প্রসারণ।

অবশ্য জলের বেলায় এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হয়। তাপ প্রয়োগে জলের আয়তন 0°C হইতে 4°C পর্যন্ত কমে এবং তৎপরে উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়তন বাড়ে।

64. গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণ (Expansion of gases) : তাপ প্রয়োগে গ্যাসের আয়তন বাড়ে।

পরীক্ষা : (i) একটি বায়ুপূর্ণ ফ্লাস্কের মুখে ছিপি লাগাও। ছিপির মধ্য দিয়া একটি বাঁকানো নির্গম-নল লাগাও। এই নলের শেষ প্রান্ত জলের মধ্যে রাখ। ফ্লাস্কে অতি সামান্য তাপ দাও। ফ্লাস্কের বায়ু প্রসারিত হইয়া জলের মধ্য দিয়া বুদ্বুদের আকারে বাহির হইয়া আসে।

(ii) পার্শ্বের চিত্রে প্রদর্শিত বায়ুপূর্ণ ফ্লাস্কের মুখে কর্কের ভিতর দিয়া একটি সরু নল লাগাও। পূর্ব হইতে নলে এক ফোঁটা রঙিন জল লও। ফ্লাস্কের উপর হাত ঘষিলে ঘর্ষণের তাপেই ফ্লাস্কের বায়ু প্রসারিত হইয়া নলের জলকে উপরে ঠেলিয়া তোলে।

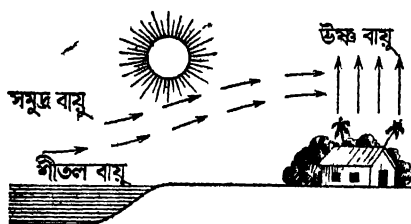

চিত্র 83 : তাপে বায়ু আয়তনে বাড়ে।

দৃষ্টান্ত : (i) রৌদ্রে ছিপিযুক্ত খালি বোতল কিছুক্ষণ রাখিলে তাপে বোতলের বায়ুর আয়তন বৃদ্ধির জন্য অনেক সময়ে ছিপি সশব্দে ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

(ii) রবারের ফানুসে বায়ু প্রবেশ করাইয়া সামান্য তাপ দিলে উহার ভিতরকার বায়ুর আয়তন-বৃদ্ধির জন্য ফানুস ফুলিয়া উঠে।

(iii) **বায়ুপ্রবাহ :** বায়ু তাপে প্রসারিত ও হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় ; আবার সেই স্থানের শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য চারিদিক হইতে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই প্রণালীতে **বায়ুপ্রবাহ** সৃষ্ট হয়।

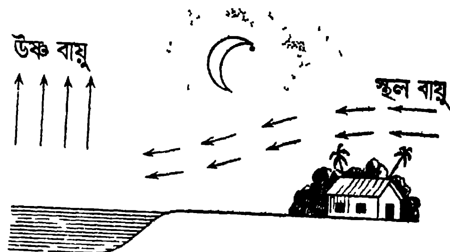
সমুদ্র-বায়ু : জলের ও স্থলের উত্তপ্ত হইবার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাপে জলভাগ অপেক্ষা স্থলভাগ দ্রুত ও সহজে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। মধ্যাহ্নের দিকে একই উষ্ণতায় সাগরের জল অপেক্ষা নিকটবর্তী স্থল অধিকতর দ্রুত উত্তপ্ত হয়।



চিত্র 84 : সমুদ্র-বায়ু।

এই সঙ্গে জলের উপরকার বায়ু অপেক্ষা স্থলের উপরকার বায়ু অধিক উত্তপ্ত ও হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এই আংশিক শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য এই সময় সাগরের উপর হইতে শীতল বায়ু স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **সমুদ্র-বায়ু** (Sea breeze) বলে।

স্থল-বায়ুঃ রাত্রি বেলায় সমুদ্রের তীরবর্তী স্থান জলভাগ অপেক্ষা দ্রুত শীতল হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ স্থলের উপরকার বায়ু সমুদ্র-বায়ুর ন্যায় শীতল হইয়া আসে এবং সমুদ্র-বায়ু বন্ধ হইয়া যায়। ধীরগতিতে ঠাণ্ডা হইবার ফলে রাত্রে জলভাগ অধিক উষ্ণ হইয়া পড়ে। ফলে জলের উপরকার বায়ু উপরে উঠিয়া যায়। এই আংশিক শূন্যতা পূরণের জন্য স্থলভাগ হইতে বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **স্থল-বায়ু** (Land breeze) বলে। এই দুইটি বিশিষ্ট বায়ুর জন্য সমুদ্রতীরের স্থানগুলিতে শীতোষ্ণতার পার্থক্য কম হয়।



চিত্র 85 : স্থল-বায়ু।

1. তাপের সাধারণ উৎস কি? উষ্ণতা বলিতে কি বুঝ?

2. কোন বস্তুতে তাপ-প্রয়োগ করিলে কি কি ফল উৎপন্ন হয়?

3. তাপ-প্রয়োগে কি হয় বল :—(i) অ্যালকোহলে তাপ-প্রয়োগ করিলে (ii) খড়িমাটিকে খুব উত্তপ্ত করিলে (iii) দুইটি বিভিন্ন ধাতুর জোড় মুখে তাপ প্রয়োগ করিলে।

4. কঠিন বস্তুর আয়তন তাপ-প্রয়োগে বৃদ্ধি হয়—ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখাও।

5. কারণ বল :—(i) দুই রেল-বীমের মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কেন? (ii) গরুর গাড়ীর চাকায় লাগাইবার সময় বেড়কে উষ্ণ করা হয় কেন? (iii) মোটা কাচপাত্রে গরম জল ঢালিলে ফাটে কেন?

6. সমুদ্র-বায়ু ও স্থল-বায়ুর উৎপত্তির কারণ বল।

7. একটি সরু নলের মধ্যে এক ফোঁটা রঙিন জল টানিয়া লও। জল সমেত নলকে অনুভূমিকভাবে কর্কের মুখে ঢোকাও। ফ্লাস্কের গায়ে কয়েকবার হাত ঘর্ষণ কর। কি হইবে বল।

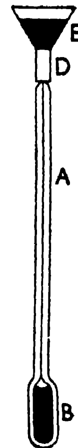
তৃতীয় পাঠ

থার্মমিতি (Thermometry)

65. তাপ ও উষ্ণতা : তাপ বলিতে কোন বস্তুতে তাপ শক্তির মোট পরিমাণ বুঝায়। কিন্তু উষ্ণতা বলিতে তাপমান বস্তুর বিশেষ অবস্থা নির্দেশ করে, যাহার উপর উহাতে বা উহা হইতে তাপ-চলাচল নির্ভর করে। একটি লোহিত-তপ্ত লৌহ বলকে এক বালতি গরম জলে ফেলিলে তাপ লৌহ বল হইতে জলে প্রবাহিত হইতে থাকে, যতক্ষণ বলের উষ্ণতা কমিয়া এবং জলের উষ্ণতা বাড়িয়া উভয়ের উষ্ণতা সমান না হয়। এখানে যদিও জলের মোট তাপ বলের মোট তাপ হইতে অধিক কিন্তু জলের উষ্ণতা বলের উষ্ণতা হইতে কম বলিয়া বল হইতে তাপ জলে প্রবাহিত হয়। জল যেমন উচ্চতলে অবস্থিত পাত্র হইতে নিম্নতলে অবস্থিত পাত্রে প্রবাহিত হয়, যদিও নিম্নতলে অবস্থিত পাত্রে অধিক জল থাকিতে পারে, সেইরূপ তাপ সব সময়েই উচ্চ উষ্ণতা হইতে নিম্ন উষ্ণতায় প্রবাহিত হয়।

66. পারদ-থার্মমিটার : আমরা গায়ে হাত দিয়া জ্বর দেখি। এই উপায়ে মোটামুটি দেহের উষ্ণতা বোঝা যায়। কিন্তু স্পর্শশক্তির সাহায্যে সঠিক উষ্ণতা মাপা যায় না। এইজন্য বিশেষ যন্ত্রদ্বারা উষ্ণতা মাপা হয়। সাধারণতঃ তাপে পারদের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা উষ্ণতা মাপা হয়।

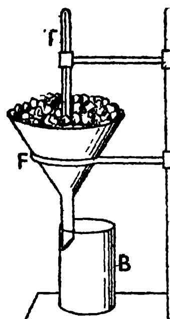
যে যন্ত্র দিয়া উষ্ণতা মাপা যায় তাহাকে **থার্মমিটার** (Thermometer) বলে। যে থার্মমিটারে পারদ ব্যবহৃত হয় তাহাকে **পারদ-থার্মমিটার** বলে।



চিত্র 86 : থার্মমিটারের নলে পারদ ভর্তিকরণ।

67. পারদ-থার্মমিটার নির্মাণ (Construction of a mercury thermometer) : (i) সমান সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট কৈশিক কাচ নলের (capillary tube, A) একপ্রান্ত আগুনে গলাইয়া ও অপর প্রান্তে ফুঁ দিয়া একটি বালব (bulb, B) তৈয়ার কর। নলের খোলা মুখে D রবার নল দিয়া একটি ফানেল E লাগাও। ফানেলে পারদ ঢাল। নলের ছিদ্র খুব সরু হওয়ায় নলের মধ্যে পারদ যায় না।

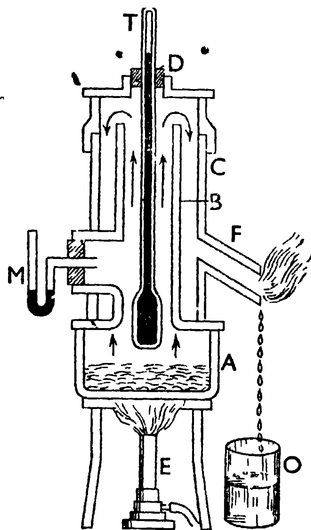
এইবার বালবকে একটু গরম কর। বালবের কিছু বায়ু পারদের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। বালব শীতল হইলে কিছু পারদ নলে ঢুকিবে। এইরূপ পর্যায়ক্রমে বালবকে গরম ও শীতল করিলে বালবটি ও নলটি ক্রমে পারদপূর্ণ হইয়া উঠিবে। এখন বালবকে উত্তপ্ত কর যতক্ষণ না পারদ ফোটে। নলের ভিতরকার বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। এই সময় নলের খোলামুখ তীব্র আগুনে গলাইয়া বন্ধ কর। এখন বালব ও নলে কেবল পারদের বাষ্প থাকে। এইভাবে যন্ত্রটি থার্মমিটারের রূপ গ্রহণ করিল।



চিত্র 87 : থার্মমিটারে হিমাঙ্ক নির্ণয়।

এইবার নলের গায়ে দুই **মানবিন্দুর** (fixed point) দাগ কাটিতে হইবে। T থার্মমিটারকে বন্ধনীর সাহায্যে F ফানেলের মধ্যে রাখিয়া উহার চারিধারে বরফখণ্ড চাপিয়া দাও। উহাকে কিছুক্ষণ এই ভাবে রাখিলে পারদ-স্তম্ভ সঙ্কুচিত হইয়া এক জায়গায় স্থির হইবে। এই স্থানে নলের গায়ে উখা দিয়া দাগ কাট। এই দাগই থার্মমিটারের **হিমাঙ্ক** (Freezing point) বা **অধোবিন্দু** (Lower fixed-point)।

এইবার T থার্মমিটারকে **হিপ্‌সোমিটার** (Hypsometer) নামক যন্ত্রের তামার পাত্র Aর মুখে D কর্কের মধ্য দিয়া ঢোকাও যাহাতে থার্মমিটারের বালব A পাত্রের জলের উপরে থাকে। তামার পাত্রের সহিত জোড়া দীর্ঘ ও প্রশস্ত B নলের চারিদিকে আবরণ (jacket) C থাকে। A পাত্রের জল ফুটাও। স্টীম (100° উষ্ণতায়) B নলের মধ্য দিয়া উঠিয়া C আবরণের মধ্যে যায় এবং সেখান হইতে F নল দিয়া বাহির হইয়া যায়। এই প্রকারে B নলের বাষ্প বাহিরের বায়ুর দ্বারা শীতল হয় না। M ম্যানোমিটার দ্বারা বাহিরের বায়ুর



চিত্র 88 : স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়।

চাপ ও স্টীমের চাপের পার্থক্য বোঝা যায়। সাধারণ বায়ুর চাপে (760 মিঃ মিঃ) জলের যে স্ফুটনাঙ্ক (boiling point) তাহাই **উর্ধ্ব বিন্দু** (Upper fixed point)। কিছুক্ষণ স্টীমে থাকিলে থার্মমিটারের পারদ-স্তম্ভ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠিয়া স্থির থাকে। পূর্ব পদ্ধতিতে এই স্থানেও দাগ কাট।

68. উষ্ণতার স্কেল (Scale of temperature) : দুইটি মান বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানকে কতকগুলি সমান অংশে ভাগ করা হয়। উহাকে **স্কেল** বলে। প্রত্যেক ভাগকে **ডিগ্রি** বলে। দুইটি প্রধান স্কেল প্রচলিত আছে ; যথা, **সেন্টিগ্রেড** (Centigrade) ও **ফারেনহিট** (Fahrenheit).

সেন্টিগ্রেড স্কেলে হিমাঙ্ককে 0° ও স্ফুটনাঙ্ককে 100° ধরিয়া মধ্যবর্তী অংশকে 100টি সমান ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়। নলের ব্যাস সর্বত্র সমান বলিয়া এক ডিগ্রির উষ্ণতা পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য দ্বারা মাপা হয়। প্রত্যেক ডিগ্রিকে 1°C লেখা হয়। এই স্কেল সর্বত্র বৈজ্ঞানিক কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ফারেনহিট স্কেলে হিমাঙ্ককে 32° ও স্ফুটনাঙ্ককে 212° ধরিয়া মধ্যবর্তী স্থানকে 180টি সমান ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ডিগ্রিকে 1° F লেখা হয়। এই স্কেল ডাক্তার ও আবহবিদগণ ব্যবহার করেন।

দেখা যায়, $1\ C = \frac{9}{5}°F$.

অঙ্ক : সেন্টিগ্রেড ও ফারেনহিট স্কেলে একই মানযুক্ত উষ্ণতা নির্ণয় কর।

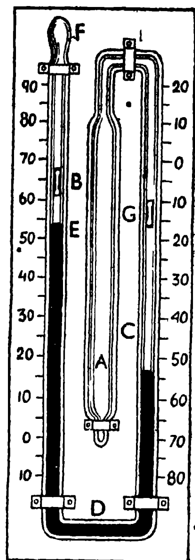
মনে কর, এই মান $= m$ $\therefore \frac{m-32}{9} = \frac{m}{5}$

$$5m - 160 = 9m \therefore m = -40 \quad \therefore -40\ C = -40°F.$$

69. গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার (Maximum and Minimum thermometer) : আবহ নির্ণয়ের কাজে সারা দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্ণয় করা বিশেষ প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির পক্ষে সারাদিন পারদের প্রসারণ বা সংকোচন লক্ষ্য করা এক প্রকার অসম্ভব। সেইজন্য এই ব্যাপারে স্বয়ংক্রিয় গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ থার্মমিটার ব্যবহার করা হয়।

সিক্সের থার্মমিটার (Six's thermometer) গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ—দ্বিবিধ থার্মমিটারের সমবায়ে গঠিত। এই যন্ত্রে একটি সমান ছিদ্রবিশিষ্ট U-আকারের কাচনলের এক প্রান্তে একটি দীর্ঘ বালব A ও অপর প্রান্তে একটি ছোট বালব F আছে। সমস্ত নলটি খাড়াভাবে কাঠের ফ্রেমে আটকানো থাকে। A বালব ও U নলের C পর্যন্ত অংশ এবং E হইতে বাকী U-নলের অংশ ও F

বালবের কিয়দংশ অ্যালকহলে পূর্ণ থাকে। F বালবের বাকী অংশে অ্যালকহলের বাষ্প থাকে। C হইতে E পর্যন্ত U নলের অংশ বিশুদ্ধ পারদে পূর্ণ থাকে। A বালবের অ্যালকহলের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখিয়া উষ্ণতা মাপা হয়। পারদ-স্তম্ভের দুই প্রান্তের উপর G ও B দুইটি স্টীলের হালকা সূচক (index) ভাসে, দুইটি স্প্রিং দুইটি সূচককে নলের গায়ে চাপিয়া ধরে এবং ঘর্ষণে উহারা নলের গায়ে আটকাইয়া থাকে। উহাদিগকে বাহির হইতে চুম্বকের আকর্ষণে পারদ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে আনা হয়। U-নলের দুই বাহুতে দুইটি স্কেল থাকে। C বাহুর স্কেলে উপর হইতে নীচের দিকে অংশাঙ্কন বাড়ে এবং E বাহুর স্কেলে নীচ হইতে উপর দিকে উহা বাড়ে।



চিত্র 89 : সিক্সের থার্মমিটার।

উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে A বালবের অ্যালকহলের আয়তন বাড়ে এবং পারদ-স্তম্ভের C প্রান্তকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয়। সুতরাং পারদ-স্তম্ভের E প্রান্ত উপরিস্থিত অ্যালকহলকে বালবের খালি স্থানে ঠেলিয়া দেয়। ফলে উহাতে সংলগ্ন B সূচককেও উপরে ঠেলিয়া তোলে কিন্তু C বাহুর G সূচক যথাস্থানে থাকিয়া যায়। উষ্ণতা-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে A বালবের অ্যালকহলের আয়তন হ্রাস পায়। ফলে পারদ-স্তম্ভের C প্রান্ত উপরে উঠে এবং উপরের G সূচককে ঠেলিয়া তোলে। E প্রান্ত নীচে নামে কিন্তু E বাহুর B সূচক যথাস্থানে থাকিয়া যায়। পুনরায় উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই G সূচককে পশ্চাতে ফেলিয়া C প্রান্ত নামে। এইরূপে E বাহুর B সূচকের অবস্থান সর্বোচ্চ বা গরিষ্ঠ উষ্ণতা ও C বাহুর G সূচকের অবস্থান সর্বনিম্ন উষ্ণতা নির্দেশ করে।


চিত্র : 90।

70. ডাক্তারি থার্মমিটার (Clinical Thermometer) : শরীরের উত্তাপ দেখিবার জন্য এই বিশেষ থার্মমিটার নির্মিত হয়। জীবিত মানুষের দেহের উষ্ণতা 95°F—110°F পর্যন্ত

উঠানামা করে। সুতরাং এই থার্মমিটারে 95°—110°F পর্যন্ত অংশাঙ্কন করা থাকে। মানুষের সুস্থ দেহের উষ্ণতা 98°F ডিগ্রিতে একটি চিহ্ন দেওয়া থাকে। এই থার্মমিটারে বালবের একটু উপরে নলের অংশে খুব সরু ভাঁজ (constriction) করা থাকে। উত্তপ্ত দেহের সংস্পর্শে থার্মমিটার রাখিলে প্রসারণ বল (expansive force) দ্বারা পারদ সরু অংশ দিয়া উপরে উঠে কিন্তু দেহ হইতে থার্মমিটার সরাইলে উপরের পারদ সরু অংশের ভিতর দিয়া নীচে নামিতে পারে না। বালবকে নীচের দিকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলে উপরের পারদ বালবে চলিয়া যায়।

অনুশীলনী

1. থার্মমিটার দ্বারা উষ্ণতা মাপার নীতি ব্যাখ্যা কর।
2. থার্মমিটারের নির্মাণ কৌশল বর্ণনা কর।
3. থার্মমিটারে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক কি প্রকারে নির্ধারণ করিবে ?
4. ডাক্তারী থার্মমিটার নির্মাণের বিশেষত্ব কি ?
5. কোন দিনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে ?

চতুর্থ পাঠ

অবস্থান্তর (Change of State)

71. বিভিন্ন অবস্থান্তর : যে কোন বস্তু উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধিতে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় তিন প্রকার অবস্থার যে কোন অবস্থায় আসিতে পারে। তাপ-বৃদ্ধিতে কঠিন তরলে পরিণত হয়। এই অবস্থান্তরকে **গলন** (Fusion বা Melting) বলে, যথা বরফ তাপে জলে পরিণত হয়। অধিকতর তাপ-বৃদ্ধিতে তরল বাষ্পে পরিণত হয়। এই অবস্থান্তরকে **বাষ্পীভবন** (Vaporisation) বলে, যথা জল তাপ-বৃদ্ধিতে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। বিপরীত ক্রমে তাপ-হ্রাসে বাষ্প তরলে পরিণত হয়। এই অবস্থান্তরকে **তরলীভবন** (Liquefaction বা Condensation) বলে, যথা জলীয় বাষ্প তাপ-হ্রাসে জলে পরিণত হয়। আবার তরল তাপ-হ্রাসে কঠিনে পরিণত হয়। এই অবস্থান্তরকে **কঠিনীভবন** (Solidification বা Freezing) বলে ; যথা জল তাপ-হ্রাসে বরফে পরিণত হয়।

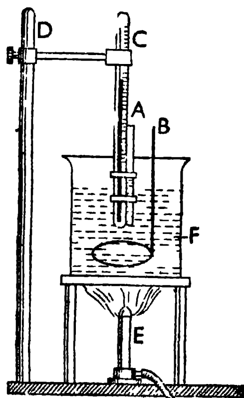
কতকগুলি কঠিন বস্তু যথা কাঠ, কয়লা প্রভৃতি তাপ-প্রয়োগে অবস্থান্তরের

পূর্বেই রাসায়নিকভাবে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। অবস্থান্তরের সময় বস্তু হয় তাপ শোষণ করে, না হয় তাপ ত্যাগ করে।

72. গলনাঙ্ক (Melting point): মোমে তাপ দিলে উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কে পৌছাইলে উহা গলিতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ গলন শেষ না হয় ততক্ষণ উহার উষ্ণতা স্থির থাকে যদিও উহাতে তাপ সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই উষ্ণতাকে **গলনাঙ্ক** বলে। সাধারণ বায়ুর চাপে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কঠিন বস্তু গলিয়া তরলে পরিণত হয় তাহাকে **গলনাঙ্ক** বলে। বিভিন্ন কঠিনের গলনাঙ্ক বিভিন্ন হয়। দস্তার (Zinc) গলনাঙ্ক 419°C বলিলে বুঝায় যে সাধারণ বায়ুর চাপে খানিকটা দস্তা লইয়া তাপ প্রয়োগ করিলে উহার উষ্ণতা বাড়িতে বাড়িতে যখন 419°C-এ পৌছিবে তখন দস্তা গলিতে আরম্ভ করিবে এবং সমস্ত দস্তা যতক্ষণ গলিয়া না যায় ততক্ষণ উষ্ণতা 419°C-তে স্থির থাকে।

কাচ, মোম, ঝাল (solder), লোহা প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন বস্তু গলিবার পূর্বে নরম (plastic বা viscous) অবস্থায় আসে। উহাদের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক নাই।

হিমাঙ্ক (Freezing point): সাধারণ বায়ুর চাপে যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন তরল বস্তু কঠিনে পরিণত হয় তাহাকে **হিমাঙ্ক** বলে। কঠিনের হিমাঙ্ক ও গলনাঙ্ক এক হয়।



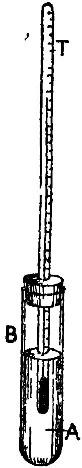
চিত্র 91 : গলনাঙ্ক নির্ণয়।

73. গলনাঙ্ক নির্ণয় (Determination of melting point):

পরীক্ষা: কেশের ন্যায় সরু ছিদ্রবিশিষ্ট 10 সে: মি: দীর্ঘ A নলের এক মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ কর। এই নলকে কৈশিক নল (Capillary tube) বলে। কঠিনকে ভালরূপ গুঁড়া করিয়া নলে অল্প গুঁড়া প্রবেশ করাও। নলকে C থার্মমিটারের সঙ্গে রবার দিয়া বাঁধিয়া তেপায়ার উপর স্থাপিত F জলগাহে বা তৈলগাহে (water bath বা oil bath) সাবধানে ডুবাও যেন নলের খোলা মুখ জলের উপরে থাকে। থার্মমিটারকে D বন্ধনী দিয়া একটি দণ্ডে আটকাও। জল বা তৈলকে E বুনসেন দীপ দ্বারা উত্তপ্ত কর এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ক B (stirrer)

দিয়া জল বা তৈলকে নাড়িতে থাক। যে উষ্ণতায় অস্বচ্ছ কঠিন স্বচ্ছ তরলে পরিণত হয় তাহা লক্ষ্য কর। তাপ বন্ধ কর। যে উষ্ণতায় স্বচ্ছ তরল পুনরায় অস্বচ্ছ কঠিনে পরিণত হয় তাহা লক্ষ্য কর। এই দুই উষ্ণতার—গলনাঙ্কের ও হিমাঙ্কের গড় ফল গলনাঙ্ক হইবে। এই দুই উষ্ণতার পার্থক্য $\frac{1}{2}$°র অধিক হয় না। সমস্ত কঠিন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় গলিলে বুঝিতে হইবে যে কঠিন বিশুদ্ধ আছে। কঠিন কম পরিমাণে পাওয়া যাইলে এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কঠিন অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইলে 92 নং চিত্রের মত যন্ত্রে পরীক্ষা করিতে হয়। B যন্ত্রের মোটা নলে কঠিনকে (A) গুঁড়া করিয়া রাখিয়া উহার মধ্যে T থার্মমিটার ঢুকাইয়া তাপে কঠিনকে গলাইতে হয়।

যে কঠিন গলনে আয়তনে বাড়ে, চাপ-বৃদ্ধিতে উহার গলনাঙ্ক বাড়ে। যে কঠিন গলনে আয়তনে কমে, চাপ-বৃদ্ধিতে উহার গলনাঙ্ক কমে।



চিত্র 92 : গলনাঙ্ক নির্ণয়।

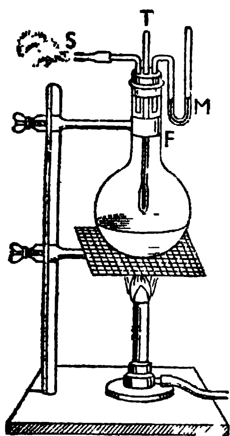
74. বাষ্পীভবন (Evaporation) ও স্ফুটন (Boiling বা Ebullition) : দুইটি বিভিন্ন উপায়ে তরল বাষ্পে পরিণত হয়।

(i) **বাষ্পীভবন :** কোনও চওড়া পাত্রে খানিকটা জল রাখিলে উহা কয়েক দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে অদৃশ্য বাষ্পে পরিণত হয়। অ্যালকহল, ইথার দ্রুত উবিয়া যায়। সর্ব উষ্ণতায় কেবল তরলের উপরিভাগ হইতে তরলের বাষ্পে পরিণতিকে **বাষ্পীভবন** বলে।

(ii) **স্ফুটন :** একটি F ফ্লাস্কের অর্ধেক জলে ভর্তি কর। ফ্লাস্কের মুখ তিনটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি দিয়া বন্ধ কর। মধ্যের ছিদ্র দিয়া T থার্মমিটার, পার্শ্বের একটি ছিদ্র দিয়া S বাষ্প নির্গমন-নল, অপরটি দিয়া M চাপ-মাপক U-নল প্রবেশ করাও। চাপ-মাপক U-নলের দুই বাহুর অর্ধেকটায় পারদ থাকে। U-নলের দুই বাহুতে পারদ-স্তম্ভের দৈর্ঘ্যের পার্থক্য ভিতরকার বাষ্পের চাপের সমান হয়।

ফ্লাস্ককে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর। প্রথমে জলের নিম্ন স্তর উষ্ণ ও হাল্কা হইয়া উপরে উঠে এবং উপরের ভারী ও শীতল স্তর নীচে নামে। এইরূপে সমস্ত জল উষ্ণ হইতে থাকে। জলে দ্রবীভূত বায়ু প্রথমে ফ্লাস্কের গায়ে জমে, তৎপরে জল হইতে বাহির হইয়া যায়। জলের নিম্ন স্তর 100°C তে পৌঁছিলে

জল হাল্‌কা স্টীমে পরিণত হয়। এই স্টীম উপরে উঠিতে উঠিতে উপরের শীতল জলের সংস্পর্শে আবার ঘনীভূত হইয়া যায়। এই সময় চুরচুর শব্দ (simmering noise) হয়। স্টীমের পরিত্যক্ত লীন তাপ উপরের জলকে উষ্ণ করে। সমস্ত জলের উষ্ণতা 100°Cতে পৌছিলে সোঁ সোঁ শব্দ বন্ধ হয় এবং জলের সমস্ত অংশ হইতে স্টীম উঠিতে থাকে। এই অবস্থাকে **স্ফুটন** বলে। দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত জল স্টীমে পরিণত না হয় ততক্ষণ থার্মমিটারে উষ্ণতা নির্দিষ্ট থাকে যদি চাপ নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট উষ্ণতাকে **স্ফুটনাঙ্ক** (boiling point) বলে।



চিত্র 93 : স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়।

এই অবস্থায় দেখা যায় U-নলের দুই বাহুতে পারদ একই তলে আছে অর্থাৎ ফ্লাস্কের ভিতর বাষ্পের চাপ = বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপ। থার্মমিটারের উষ্ণতা 100°C তে দেখা যায়। বাষ্প নির্গমন পথ আংশিক ভাবে বন্ধ করিলে ভিতরের বাষ্পের চাপ বাড়ে এবং থার্মমিটারে উষ্ণতা বাড়িতে দেখা যায়। সুতরাং জলের উপর চাপ বাড়াইলে স্ফুটনাঙ্ক বাড়ে। বিভিন্ন তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন।

75. বাষ্পীভবন ও স্ফুটনের পার্থক্য : (i) বাষ্পীভবন ধীর পদ্ধতি, উহা যে-কোন উষ্ণতায় ঘটে। উষ্ণতা-বৃদ্ধির সঙ্গে উহার হার বাড়ে। স্ফুটন দ্রুত পদ্ধতি, উহা একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ঘটে। (ii) বাষ্পীভবন কেবল তরলের উপরিতল হইতে ঘটে। স্ফুটন তরলের সমস্ত অংশ হইতে ঘটে।

76. লীন তাপ (Latent Heat) : কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন বস্তু গলিতে আরম্ভ করিলে তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যতক্ষণ উহার গলন শেষ না হয় ততক্ষণ থার্মমিটারে উহার উষ্ণতা নির্দিষ্ট থাকে। এই তাপ কি কাজে লাগে ? এই তাপশক্তি কঠিনের অণুগুলির আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া কঠিনকে তরলে পরিণত করে। এই তাপ শক্তি উষ্ণতা-বৃদ্ধির কাজে লাগে না। আবার তরল যখন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় ফুটিতে থাকে তখন তাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যতক্ষণ সমস্ত তরল বাষ্পে পরিণত না হয় ততক্ষণ উষ্ণতা নির্দিষ্ট থাকে। এই ক্ষেত্রে তাপ তরলের অণুগুলির আকর্ষণের বিরুদ্ধে কার্য করিয়া তরলকে বাষ্পে পরিণত করে। এই দুই ক্ষেত্রে বস্তু অবস্থান্তরের সময়

তাপ গ্রহণ করে। এইবার বিপরীতক্রমে বাষ্পকে তাপ হ্রাস দ্বারা তরলে পরিণত করিলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (স্ফুটনাঙ্কে) বাষ্প তরলে পরিণত হয় এবং যতক্ষণ সমস্ত বাষ্প তরল না হয় তাপহ্রাস সত্ত্বেও ততক্ষণ উহার উষ্ণতা কমে না। আবার তরলের তাপ-হ্রাস করিলে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় (হিমাঙ্কে) উহা কঠিন হইতে আরম্ভ করে এবং যতক্ষণ সমস্ত তরল কঠিনে পরিণত না হয় ততক্ষণ তাপ-হ্রাস সত্ত্বেও উষ্ণতা কমে না। এই দুই ক্ষেত্রে বস্তু অবস্থান্তরের সময় তাপ ত্যাগ করে।

বস্তুর অবস্থান্তরের সময় উহা যে তাপ গ্রহণ করে বা ত্যাগ করে তাহা থার্মমিটার দ্বারা ধরা যায় না। সেইজন্য এই তাপকে **প্রচ্ছন্ন** বা **লীন তাপ** (Latent Heat) বলে। "বরফের লীন তাপ 80 ক্যালরি প্রতি গ্রামে"—উহার অর্থ 0°C উষ্ণতায় এক গ্রাম বরফকে 0°C উষ্ণতায় এক গ্রাম জলে পরিণত করিতে 80 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন। "স্টীমের লীন তাপ 536 ক্যালরি প্রতি গ্রামে"—উহার অর্থ 100°C উষ্ণতায় এক গ্রাম জলকে 100°C উষ্ণতায় এক গ্রাম স্টীমে পরিণত করিতে 536 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন।

77. বাষ্পীভবনের হার পরিবর্তনের কারণ:

(i) **তরলের প্রকৃতি:** তরলের স্ফুটনাঙ্ক যত কম হয় তত দ্রুত তরল বাষ্পীভূত হয়; যথা ইথার অ্যালকোহল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(ii) **তরলের উষ্ণতা:** তরলের উষ্ণতা যত বাড়ে উহা তত দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে জল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(iii) **তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল:** তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে তরল তত দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। চওড়া পাত্র যথা থালা হইতে তরল দুধ দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(iv) **বায়ুর চাপ:** তরলের উপর চাপ যত কমে তরল তত দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। অনুপ্রেষ পাতনে তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(v) **বায়ুর শুষ্কতা:** তরলের উপরের বায়ুতে যত কম জলীয় বাষ্প থাকে তরল তত দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

(vi) **বায়ু-চলাচল:** তরলের উপরিস্থিত বায়ুকে অপসারিত করিলে তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়।

78. বাষ্পীভবনে শৈত্যোৎপাদন (Cold caused by evaporation): তরলের বাষ্পীভবনে লীন তাপ প্রয়োজন। অন্য

কোন উৎস হইতে তাপ না পাইলে তরল নিজ দেহ বা তরল সংলগ্ন অন্য কোন বস্তু হইতে তাপ টানিয়া লয়। ঐ সকল বস্তু শীতল হইয়া পড়ে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় :—

(i) গায়ে ঘাম থাকিলে পাখার বাতাসে ঘাম দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। ঘাম দেহ হইতে লীন তাপ গ্রহণ করে। দেহ শীতল হয়।

(ii) জ্বরের সময় মাথায় জলপটি দিয়া বাতাস করিলে একই কারণে দেহের উষ্ণতা কমে।

(iii) গরমের দিনে জানালা বা কপাটে ভিজা খসখস টাঙাইলে জল ঘরের বাতাসের লীন তাপ সংগ্রহ করিয়া বাষ্পীভূত হয়। সুতরাং ঘরের বাতাস শীতল হয়।

(iv) মাটির কলসীর গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র (pores) থাকে। ছিদ্র দিয়া জল চোঁয়াইয়া বাহির হয় এবং বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পীভবনের জন্য লীন তাপ জল হইতে সরবরাহ হয়। সেইজন্য মাটির কলসীতে জল শীঘ্র শীতল হয়। ধাতব পাত্রের গায়ে এইরূপ ছিদ্র থাকে না। সেইজন্য ধাতব পাত্রে জল শীতল হয় না।

79. ইথারের বাষ্পীভবনে বরফ উৎপাদন : একখণ্ড কাঠের খাঁজের ভিতর কয়েক ফোঁটা জল রাখ। জলের উপর একটি তামার পাত্র রাখ। তামা তাপের সুপরিবাহী। পাত্রে কিছু ইথার ঢালিয়া দাও। হাঁপরের সাহায্যে ইথারের মধ্য দিয়া দ্রুত বায়ু চালনা কর। ইথার দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। নীচের জল জমিয়া বরফ হয়। বরফের জন্য কাঠে পাত্র আটকাইয়া যায়।

দ্রুত বাষ্পীভবনে শৈত্যোৎপাদনের নীতির উপর হিমায়ক যন্ত্রগুলি নির্মিত হয়। তরল অ্যামোনিয়া, কারবন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি তরলের দ্রুত বাষ্পীভবন করিয়া **হিমায়ক** প্রস্তুত করা হয়।

অনুশীলনী

1. ঘনীভবন, বাষ্পীভবন, স্ফুটন, গলন প্রণালীগুলি বর্ণনা কর।
2. স্ফুটন ও বাষ্পীভবনের পার্থক্য কি ?
3. স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
4. গলনাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

5. কেন হয় বল :—

(i) মাটির কলসীর জল শীতল হয়।

(ii) জ্বরের সময় মাথায় জলপটি দিলে দেহ শীতল হয়।

(iii) গ্রীষ্মকালে জানালায় সিক্ত খস খস দিলে ঘর শীতল হয়।

6. ইথারের বাষ্পীভবনে শৈত্যোৎপাদনের পরীক্ষা বল।

পঞ্চম পাঠ

তাপ কি প্রকারে চলাচল করে (How heat travels)

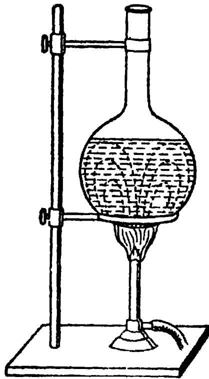
80. তাপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে তিন প্রকারে চলাচল করে :

(1) **পরিবহন (Conduction) : যে প্রক্রিয়া দ্বারা একই বস্তুর উষ্ণতর অংশ হইতে শীতলতর অংশে কিংবা উষ্ণ বস্তু হইতে তৎসংলগ্ন অন্য শীতল বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিবহন বলে।** একটি ধাতব স্কেলের এক প্রান্ত স্পিরিট ল্যাম্পে ধরিয়া অপর প্রান্ত হাতে ধর। কিছুক্ষণ পরে অপর প্রান্ত এত উষ্ণ হইবে যে উহাকে হাতে ধরা যাইবে না। তাপ কি প্রকারে অপর প্রান্তে পৌছিল? ধাতব স্কেল অসংখ্য অণুর সমষ্টি। আগুনের সংস্পর্শে তাপে অণুগুলির স্পন্দন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত বেগ পার্শ্বের অণুগুলিকে জোরে ধাক্কা দেয়। সুতরাং উহাদের গতি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উহারা উষ্ণ হয়। এইরূপে অণুর গতির দ্বারা তাপশক্তি স্কেলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌছায় কিন্তু প্রথমে স্কেলের যে দাগ যেখানে থাকে পরেও সেখানেই থাকে অর্থাৎ অণুগুলি স্থান ত্যাগ করে না। কঠিন বস্তু এই উপায়ে উত্তপ্ত হয়।

(2) **পরিচলন (Convection) : যে প্রক্রিয়া দ্বারা বস্তুর উত্তপ্ত অণুগুলি উষ্ণতর স্থান হইতে শীতলতর স্থানে গমন করিয়া তাপ সঞ্চালিত করে তাহাকে পরিচলন বলে।** তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ এইরূপে তাপ পরিচালনা করে।

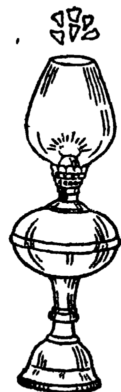
তরলের পরিচলন : একটি গোল ফ্লাস্ক অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি কর। ফ্লাস্কের তলায় জলের মাঝখানে একটু রঙ ফেলিয়া দাও। ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে

গরম কর। তলায় রঙিন জল প্রথমে উত্তপ্ত, প্রসারিত ও হাল্‌কা হইয়া সূতার ন্যায় সরু পথে উপরে উঠে এবং উপরের শীতল জল তাপ ছাড়িয়া ভারী হইয়া ফ্লাস্কের গায়ের পাশ দিয়া নীচে নামে। সুতরাং ফ্লাস্কে একটি উর্ধ্বগামী উষ্ণ জলস্রোত এবং নিম্নগামী শীতল জলস্রোতের উৎপত্তি হয়। সমস্ত জল একই উষ্ণতায় না আসা পর্যন্ত এইরূপ চলে। জলের কণাগুলি তাপ সঞ্চালন করে।


চিত্র 94 : তরলের পরিচলন।

গ্যাসের পরিচলন : যে কোন উত্তপ্ত বস্তুর (যথা তপ্ত লোহার হাতা, জ্বলন্ত হ্যারিকেন) কিছু উপরে হাত রাখিলে আমরা গরম বোধ করি। আগুনের স্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত ও হাল্‌কা হইয়া উপরে উঠে এবং পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবাহিত হয়। জ্বলন্ত ল্যাম্পের উপর পাতলা কাগজের টুকরা ছাড়িয়া দিলে উষ্ণ ও হাল্‌কা বায়ুর সঙ্গে উহারা উপরে উঠিয়া যায়।

(3) **বিকিরণ (Radiation) : যে প্রক্রিয়া দ্বারা তাপ কোন মাধ্যমকে উত্তপ্ত না করিয়া এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হয় তাহাকে বিকিরণ বলে।** সূর্য পৃথিবী হইতে নয় কোটি মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত। উহাদের মধ্যে কয়েক শত মাইল বায়ুস্তর ব্যতীত অনন্ত শূন্যতা (vacuum) আছে। সুতরাং সূর্যের তাপ কোন জড় মাধ্যম ব্যতীতই বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে পৌঁছায়। আগুনের পার্শ্বে দাঁড়াইলে বিকিরণ প্রণালীতেই তাপ আমাদের গায়ে লাগে।


চিত্র 95 : উষ্ণ বায়ু কাগজের টুকরাকে উপরে তুলিতেছে।

81. **তিন প্রক্রিয়ার পার্থক্য :** (i) পরিবহন ও পরিচলনে যে কোন জড় মাধ্যমের ভিতর দিয়া তাপ সঞ্চালিত হয়। বিকিরণে তাপ কোন জড় মাধ্যম ব্যতীতও যাইতে পারে।

(ii) পরিবহনে অণুগুলি স্থান ত্যাগ করে না। পরিচলনে মাধ্যম ব্যতীতও যাইতে পারে।

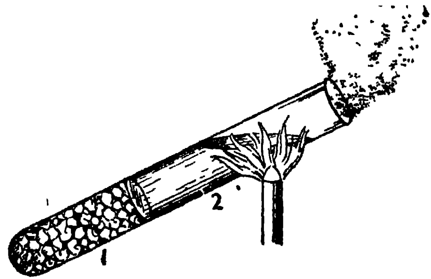
(iii) পরিবহন ও পরিচলন ধীর প্রক্রিয়া। বিকিরণ দ্রুত প্রক্রিয়া।

82. পরিবাহিতা (Conductivity): কোন বস্তুর তাপ সঞ্চালনের ধর্মকে **পরিবাহিতা** বলে। সকল বস্তুর এই ধর্ম সমান পরিমাণে থাকে না। যে সকল বস্তু খুব শীঘ্র ও সহজে তাপ সঞ্চালন করে তাহাদিগকে তাপের **সুপরিবাহী** (good conductor) বলে; যথা লোহা, তামা, রূপা প্রভৃতি সব ধাতু। যে সকল বস্তু শীঘ্র ও সহজে তাপ পরিবহন করে না তাহাদিগকে তাপের **কুপরিবাহী** (bad conductor) বলে। যথা গ্যাস, কাঠ, পশম, কাচ।

83. তরলের ও গ্যাসের পরিবাহিতা: পারদ ও গলিত ধাতু ব্যতীত সকল তরলের এবং গ্যাসের পরিবাহিতা খুব কম।

জলের তাপ পরিবাহিতা খুব কম। পরীক্ষা দ্বারা এই সত্যতা প্রমাণ করা যায়।

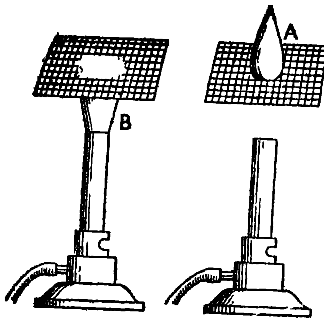
পরীক্ষা: একটি দীর্ঘ পরীক্ষা-নলের তলার দিকে তামার তারে জড়াইয়া এক খণ্ড বরফ আটকাইয়া রাখ। উহাতে জল ঢাল। পরীক্ষা-নলকে কাত করিয়া নলের উপর দিক উত্তপ্ত কর। দেখ, নলের উপর দিকে জল ফুটিতেছে কিন্তু নীচের বরফ গলিতেছে না। অর্থাৎ জল তাপের কুপরিবাহী বলিয়া তাপ উপর দিক হইতে নীচের দিকে যাইতে অনেক সময় লয়।



চিত্র 96: জলের নিম্ন তাপ-পরিবাহিতা।

84. পরিবাহিতার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত: (i) পশম, সুতা, ফ্লানেল, পশুর লোম সবই তাপের কুপরিবাহী; তবে কেন আমরা পশম ও ফ্লানেলকে শীত নিবারণের জন্য ব্যবহার করি? পশম ও ফ্লানেলের আঁশ খুব আল্‌গাভাবে থাকে এবং উহাদের ফাঁকে ফাঁকে অধিক বায়ু স্থির অবস্থায় আটকাইয়া থাকে। সুতরাং বায়ুতে পরিচলন স্রোত বহে না। আবার বায়ু তাপের কুপরিবাহী। এই দুই কারণে শীতকালে শরীরের তাপ বাহিরে আসিতে পারে না এবং আমাদের দেহ গরম থাকে। আবার যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয় সে স্থানে ঠাসবুনান বস্ত্র ব্যবহার করিলে শীত লাগে না।

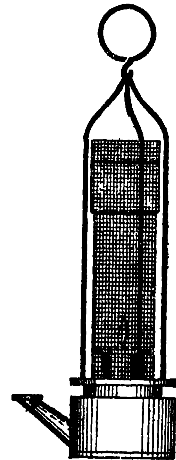
উড়োজাহাজের চালক ঠাসবুনান বস্ত্র ব্যবহার করে। (ii) রাত্রে বাহিরে একই উষ্ণতায় বিভিন্ন বস্তু যথা, লোহা ও কাঠ থাকিলে হাতে লোহা বেশী শীতল বোধ হয় এবং দিনে রৌদ্রে থাকিলে লোহা বেশী উষ্ণ বোধ হয় কেন? লোহা কাঠ অপেক্ষা তাপের সুপরিবাহী। সুতরাং লোহা রাত্রে হাত হইতে বেশী তাপ পরিবহন করে এবং দিনে উহা হইতে বেশী তাপ দেহে প্রবেশ করে। সেইজন্য লোহা দিনে হাতে গরম লাগে, রাত্রে শীতল লাগে। এই কারণে ধাতুর কেটলিতে কাঠের হাতল লাগানো থাকে। কাঠের হাতল ধরিলে হাতে তাপ লাগে না। বরফ কম্বল বা কাঠের গুঁড়া দিয়া ঢাকা থাকে। গুঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে বায়ু থাকে। বায়ু ও কাঠ দুই-ই তাপের কুপরিবাহী। (iii) ধাতু তাপের সুপরিবাহী। গ্যাসের শিখার উপর তার জালি ধরিলে তাপ তারের ভিতর দিয়া দ্রুত পরিবাহিত হইয়া বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং উপরের গ্যাস জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে উপযুক্ত তাপ পায় না এবং উপরের গ্যাস জ্বলে না।



চিত্র 97 : তামার তাপ-পরিবাহিতা অধিক।

তার-জালির উপর জ্বলন্ত কাঠি ধরিলে গ্যাস জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং উপরে গ্যাস-প্রবাহ আছে উহা বোঝা যায়। আবার দীপের একটু উপরে তার-জালি ধরিয়া গ্যাস খুলিয়া তার-জালির উপর গ্যাস জ্বালাইলে একই কারণে গ্যাসের নীচের শিখা তার জালির নীচে নামে না।

(iv) **Davy-এর নিরাপত্তা বাতি :** কয়লা-খনিতে নানা কারণে মার্সগ্যাস উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রণে আগুন লাগিলে বিস্ফোরণ ঘটে। অন্ধকার কয়লাখনিতে আলো ব্যতীত কার্য করা অসম্ভব। ধাতব তারের সুপরিবাহিতার সুযোগ লইয়া ডেভি (Davy) নিরাপত্তা বাতি নির্মাণ করেন। এই বাতিতে কাচের চিমনির পরিবর্তে মোটা

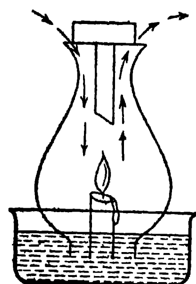

চিত্র 98 : Davy-এর নিরাপত্তা বাতি।

তারের জালি ব্যবহার করা হয়। ভিতরের শিখার তাপ তারজালির মধ্য দিয়া দ্রুত পরিবাহিত হইয়া বায়ুতে ছড়াইয়া পড়ে। বাহিরের গ্যাস-মিশ্রণ জ্বলনাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। সামান্য মিশ্রণ তার-জালির মধ্য দিয়া নীল শিখার সহিত ভিতরে জ্বলে। খনির খনকরা তখন সাবধান হয়।

(v) পাতলা ও মোটা কাগজের ছোট ঠোঙায় জল রাখিয়া জলকে ফুটাইলে পাতলা কাগজের ঠোঙা পোড়ে না, মোটা কাগজের ঠোঙা পুড়িয়া যায়। পাতলা কাগজ মোটা কাগজ অপেক্ষা তাপের সুপরিবাহী।

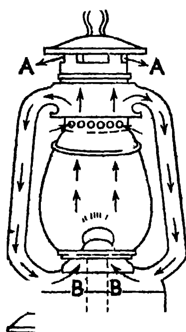
85. গ্যাসের পরিচলন:

(i) (ক) একটি চওড়া পাত্রের মাঝখানে জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া পাত্রে জল ঢাল। বাতি চিমনি দিয়া ঢাকিয়া দাও। চিমনির নীচ দিয়া চিমনিতে বায়ু ঢোকে না। অক্সিজেনের অভাবে বাতি নিভিয়া যায়।



চিত্র 99 : চিমনিতে বায়ুপ্রবাহ।

(খ) পুনরায় বাতি জ্বাল। চিমনির মুখে মাঝখানে T আকারের মোটা কার্ডবোর্ড রাখিয়া পুনরায় চিমনিকে পূর্ব স্থানে রাখ, বাতি জ্বলিতে থাকে। কেন এরূপ হয়? কার্ডবোর্ড রাখায় চিমনির ভিতর দুইটি বায়ুস্রোতের সৃষ্টি হয়—কার্ডবোর্ডের এক পাশ দিয়া একটি অন্তর্মুখী নিম্নগামী শীতল ও ভারী বায়ুর স্রোত এবং অপর পাশ দিয়া একটি বহির্মুখী ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ ও হাল্কা বায়ুর স্রোত। সুতরাং চিমনির ভিতর অক্সিজেনের অভাব হয় না। এক গোছা জ্বলন্ত ধূপ চিমনির উপর ধরিলে ধোঁয়া কার্ডবোর্ডের এক দিক দিয়া ঢোকে ও অপর দিক দিয়া বাহির হয়।



চিত্র 100 : হ্যারিকেন লণ্ঠন।

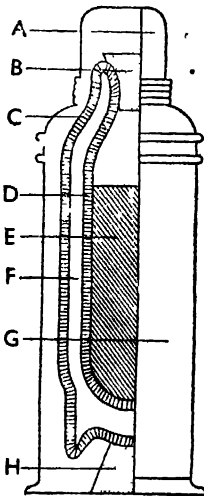
(ii) হ্যারিকেনে, উনানে বা কারখানার চুল্লীতে নীচের দিকে বাহির হইতে ভারী ও শীতল বায়ু প্রবেশের পথ থাকে এবং উপরের দিকে ভিতর হইতে উষ্ণ ও হাল্কা বায়ু বাহির হইবার পথ থাকে। হ্যারিকেনের নীচের ছিদ্র বন্ধ করিলে অক্সিজেনের অভাবে শিখা নিভিয়া যায়।

(iii) **ঘরে বায়ু চলাচল (Ventilation)**—ঘরে অধিক লোক থাকিলে

লোকের দেহ হইতে ও নিঃশ্বাস বায়ু হইতে তাপ বহির্গত হয়। নিঃশ্বাস বায়ুতে বিষাক্ত গ্যাস থাকে; ঘরে আগুন জ্বালিলেও ঘরের বায়ু উষ্ণ ও বিষাক্ত হয়। দরজা ও জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ভারী, শীতল ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং ঘরের উপর দিকের ঘুলঘুলি বা ফাঁক দিয়া উষ্ণ, হাল্কা, বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে ঘরে আগুন জ্বালানো হয় এবং দরজা জানালা খুলিয়া রাখিলে অধিক শৈত্যে স্বাস্থ্যহানি হয়। সেইজন্য ঘরের নীচের দেওয়ালেও ঘুলঘুলি বা ছিদ্র থাকে।

জনবহুল ও রুদ্ধ গৃহে আমরা অস্বস্তি বোধ করি কেন? পূর্বে ধারণা ছিল অক্সিজেনের হ্রাসের জন্য ও কারবন ডাই-অক্সাইডের আধিক্যের জন্য এইরূপ হয়। আধুনিক মতে বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি ভৌতিক অবস্থার উপর আমাদের স্বস্তি বা অস্বস্তি ভাব নির্ভর করে। আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে ঘরের উষ্ণতা, আর্দ্রতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। উহাকে air conditioned ঘর বলে।

86. বিকীর্ণ তাপের প্রয়োগ: বিকীর্ণ তাপ কোন তলে পতিত হইলে উহা তাপ শোষণ করিয়া উত্তপ্ত হয়। কালো তল সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ বিকিরণ করে ও শোষণ করে কিন্তু কম তাপ প্রতিফলন করে। চক্‌চকে ধাতু ভাল তাপ প্রতিফলক কিন্তু খারাপ তাপ শোষক ও বিকিরক। সেইজন্য চক্‌চকে ধাতুর পাত্র অপেক্ষা কালো পাত্রে জল শীঘ্র গরম হয়। ধাতব পাত্র অপেক্ষা পাথরের বাটিতে গরম দুধ শীঘ্র শীতল হয়। তাপ শোষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য রান্নার পাত্রগুলি কালো রং করা হয়। তাপ শোষণ হ্রাস করিবার জন্য গ্রীষ্মকালে সাদা পোষাক ও তাপ শোষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য শীতকালে কালো পোষাক ব্যবহার করা হয়।



চিত্র 101 : থার্মোফ্লাস্ক।

87. থার্মোফ্লাস্ক: এই পাত্রে কোন তরলের (E) উষ্ণতা অনেকক্ষণ সমভাবে বজায় থাকে। ইহা কাচের দুই প্রাচীর (C,D) যুক্ত পাত্র। দুই প্রাচীরের মধ্যস্থ বায়ু বাহির করা থাকে। সুতরাং বিকিরণে তাপ চলাচল হয় না। পাত্রকে একটি ধাতব G আবরণের মধ্যে রাখা হয়। পাত্র ও আবরণের মধ্যে তাপের কুপরিবাহী

বস্তু থাকে। পাত্রের মুখে কর্কের B ছিপি থাকে। সুতরাং পরিবহন ও পরিচলন ক্রিয়ায় তাপ চলাচল হয় না। পাত্রের মাথায় একটি A ঢাকনা থাকে। পাত্রের নীচে কর্ক H থাকে।

অনুশীলনী

1. তাপ-চলাচলের তিনটি প্রণালী উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।
2. জলের তাপ পরিবহন ক্ষমতা কম—উদাহরণ সহ বুঝাও।
3. বিকীর্ণ তাপের বিশেষত্ব কি ?
4. নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে বিবরণ দাও—
   থার্মোফ্লাস্ক ও ডেভির নিরাপত্তা বাতি।
5. বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহন ক্ষমতা কি করিয়া তুলনা করিবে ?
6. তাপ-চলাচলের তিন প্রণালীর পার্থক্য কি ?

তৃতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে Objective type প্রশ্নাবলী

1. **Recall Type :** ডান দিকের শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) পৃথিবীতে সব তাপের মূল উৎস— ।

(ii) যে প্রণালীতে তাপ পদার্থের এক অংশ হইতে অন্য অংশে যায় তাহার নাম — — ।

2. **Completion Type :**

ঘরে অধিক লোক থাকিলে ঘরের বায়ু — ও — হয়। বায়ু — দিকে — —। ঘরের নীচের দিকে জানালা দিয়া — ও — বায়ু ঘরে ঢোকে। ঘুলঘুলি দিয়া — ও — বায়ু —যায়।

3. **Alternate Response Type :**

A. **True or False Type :** সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও :

(i) তরল বাষ্পীভূত হইলে তাপ শোষণ করে না।

(ii) জলের স্ফুটনাঙ্ক চাপের উপর নির্ভর করে।

B. **Yes or No Type :—হাঁ বা না উত্তর দাও :**

(i) বাষ্পের তরলীভবনে কি তাপ উদ্ভূত হয় ?

(ii) স্পর্শ দ্বারা কি উষ্ণতা সঠিক জানা যায় ?

(iii) সব কঠিন তাপে প্রসারিত হয় কি ?

4. Association Type :

:: চিহ্নের বাম দিকের দুই শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক, ডান দিকের দুই শব্দের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। ডান দিকের শব্দের সম্পর্ক বাহির কর :

কঠিন : গলনাঙ্ক :: তরল : —

বাষ্পীভবন : মন্থর :: স্ফুটন : —

5. Matching Test :

নীচের পংক্তি II হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছাই করিয়া I পংক্তির শূন্য স্থান পূরণ কর :

I	II
(i) জল — উষ্ণতায় সর্বাপেক্ষা ঘন হয়।	সর্ব, উষ্ণ
(ii) — উষ্ণতায় তরলের — হইতে তরলের বাষ্পে পরিণতিকে — বলে।	তাপ-প্রতিফলক
(iii) মসৃণ ধাতু ভাল — —।	4°C, বাষ্পীভবন।
(iv) বিকিরণে মাধ্যম — নাও হইতে পারে।	উপরতল, জড়

চতুর্থ অধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical Reactions)

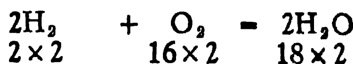
প্রথম পাঠ

অ্যাসিড বা অম্ল (Acid), ক্ষারক (Base) ও লবণ (Salt)

88. চিহ্ন, সংকেত ও সমীকরণ: মৌল (Elements)-গুলিকে নামের প্রথম অক্ষর কিংবা প্রথম অক্ষরের সহিত অন্য কোনও অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা হয়। উহাদিগকে **চিহ্ন** (Symbol) বলে। পরমাণু চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যথা H (Hydrogen), Cl (Chlorine), Na (Natrium or Sodium), S (Sulphur, গন্ধক), N (Nitrogen), O (Oxygen), Ba (Barium); C (Carbon), Ca (Calcium), K (Kalium বা Potassium), Pb (Plumbum, Lead সীসা), Zn (Zinc দস্তা)।

যৌগ (Compound) বা মৌলের অণু **সংকেত** (Eormula) দ্বারা প্রকাশ করা হয়, যথা H_2, H_2O ; পরমাণুর সংখ্যা ডান দিকে নীচে লিখিতে হয়। বামদিকের একই লাইনের সংখ্যা অণুর সংখ্যা প্রকাশ করে; $2H_2O$—বুঝায় দুই অণু জল।

রাসায়নিক ক্রিয়া **সমীকরণ** (Equation) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের ক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়:



$$\begin{array}{ccccc} 2H_2 & + & O_2 & = & 2H_2O \\ 2\times2 & & 16\times2 & & 18\times2 \end{array}$$

উহার অর্থ এই যে,

(i) দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেনের ক্রিয়ায় দুই অণু জল উৎপন্ন হয়।

(ii) 4 গ্রাম হাইড্রোজেন ও 32 গ্রাম অক্সিজেনের ক্রিয়ায় 36 গ্রাম জল উৎপন্ন হয়।

—চিহ্নের দুই দিকের পরমাণুর মোট ওজন ও সংখ্যা সমান।

89. অ্যাসিড (Acids) : হাইড্রোজেনযুক্ত যৌগের হাইড্রোজেন মৌল ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে যৌগকে **অ্যাসিড** বলে। যথা—হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl, সালফিউরিক অ্যাসিড H_2SO_4, নাইট্রিক অ্যাসিড HNO_3, কারবনিক অ্যাসিড H_2CO_3।

অ্যাসিড খাইতে টক লাগে, যথা সাইট্রিক অ্যাসিড (লেবুতে), ল্যাক্টিক অ্যাসিড (টক দই‌তে), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইত্যাদি। উহাদের জলীয় দ্রবণ নীল লিট্‌মাসকে লাল করে, হলদে মিথাইল অরেঞ্জকে গোলাপী করে। অ্যাসিড ধাতুর সহিত ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন ও লবণ উৎপন্ন করে; $Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2$। অ্যাসিড ও অক্সাইডের ক্রিয়ায় লবণ ও জল উৎপন্ন হয়; $MgO + 2HCl = MgCl_2 + H_2O$।

90. ক্ষারক (Bases) : ক্ষারক সাধারণতঃ ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড হয়। যথা, জিঙ্ক অক্সাইড ZnO, কস্টিক সোডা NaOH, কস্টিক পটাশ KOH, বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড $Ba(OH)_2$। উহারা অ্যাসিডের সহিত লবণ ও জল উৎপন্ন করে; যথা, $ZnO + 2HCl = ZnCl_2 + H_2O$, $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$। চুন, সোডা, রিটা ক্ষারক পদার্থ। ধাতব হাইড্রোক্সাইড জলে দ্রবণীয় হইলে তাহাকে **ক্ষার** (Alkali) বলে, যথা, NaOH, $Ca(OH)_2$, KOH. ক্ষারের দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। উহারা সাধারণতঃ পিচ্ছিল হয়।

ক্ষারের ও অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ পরিবহন করে।

91. লবণ (Salts) : অ্যাসিডের হাইড্রোজেন ধাতু বা ধাতুর সমান কোন ক্ষারীয় (Basic) মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাহাকে **লবণ** বলে। H_2SO_4 অ্যাসিডের একটি বা দুইটি হাইড্রোজেন K ও NH_4 মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইলে যথাক্রমে $KHSO_4$, K_2SO_4, ও $(NH_4)HSO_4$, $(NH_4)_2SO_4$ লবণ গঠিত হয়।

লবণ তিন প্রকার :—(i) **শমিত (Normal) লবণ :** অ্যাসিডের সমস্ত হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে **শমিত লবণ** বলে, যথা H_2SO_4 হইতে Na_2SO_4 ও $(NH_4)_2SO_4$; HNO_3 হইতে KNO_3; H_2CO_3 হইতে Na_2CO_3; HCl হইতে NaCl।

(ii) অ্যাসিড (Acid) লবণ : একাধিক হাইড্রোজেনযুক্ত অ্যাসিডের হাইড্রোজেন আংশিক প্রতিস্থাপিত হইয়া যে লবণ উৎপন্ন হয় তাহাকে **অ্যাসিড**

লবণ বলে ; যথা, $NaHSO_4$, $NaHCO_3$ । এক্ষেত্রে যথাক্রমে H_2SO_4 ও H_2CO_3 অ্যাসিডের একটি H পরমাণু Na ধাতু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(iii) **ক্ষার (Basic) লবণ :** যে লবণে ক্ষারকের অংশ অধিক থাকে তাহাকে **ক্ষার লবণ** বলে ; যথা, Pb(OH)Cl । এই লবণে লেড ক্ষারকীয় মূলক ছাড়াও OH ক্ষারকীয় মূলক আছে। এই অধিক ক্ষারকীয় অংশ অ্যাসিড মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া শমিত লবণ প্রস্তুত হয়।

অনুশীলনী

1. নিম্নলিখিত মৌলগুলির চিহ্ন লিখ :—
   অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সালফার, কারবন, নাইট্রোজেন।
2. নিম্নলিখিত যৌগের সংকেত লিখ —
   জল, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কস্টিক পটাশ, কস্টিক সোডা, নাইট্রিক অ্যাসিড।
3. একটি দ্রবণ ক্ষার কি অ্যাসিড কি প্রকারে নির্ণয় করিবে ?
4. ক্ষারের ধর্ম কি কি ?
5. অ্যাসিডের ধর্ম কি কি ?
6. লবণের সংজ্ঞা বল। লবণ কয় প্রকারের—উদাহরণ সহ বল।

দ্বিতীয় পাঠ

সাধারণ ব্যবহার্য কতকগুলি দ্রব্য ; উহাদের রাসায়নিক গঠন ও প্রধান ব্যবহার (Substances of common use, their chemical composition and principal uses) :

92. সাধারণ লবণ (Common Salt) : আহারের সময় আমরা যে লবণ ব্যবহার করি তাহাকে "সাধারণ লবণ" বলে। উহার সংকেত NaCl ; অর্থাৎ উহার এক অণুতে এক পরমাণু সোডিয়াম ও এক পরমাণু ক্লোরিন থাকে। উহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে।

58·5 ভাগ লবণে 23 সোডিয়াম ও 35·5 ভাগ ক্লোরিন থাকে।

সাধারণ লবণ সমুদ্রজল (0·25%) ও লবণ-হ্রদের জল শুকাইয়া পাওয়া যায়। উহাকে 'শাকম্ভরী' লবণ বলে। অনেক খনি হইতেও লবণ পাওয়া যায়। উহাকে 'সৈন্ধব লবণ' বলে। ভারতে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমুদ্রজল এবং খেউরা ও কলাবাগের খনি হইতে লবণ প্রস্তুত হয়।

বিশুদ্ধ সোডিয়াম ক্লোরাইড বর্ণহীন স্ফটিকাকার, অনুদ্‌গ্রাহী কঠিন। সাধারণ লবণে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত থাকে। উহারা উদ্‌গ্রাহী লবণ। এই সকল অশুদ্ধির জন্য সাধারণ লবণ বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণ করে। উহা জলে দ্রাব্য। উহা মাছ-মাংস সংরক্ষণ করিতে, কাপড় কাচা সোডা, কস্টিক সোডা, ক্লোরিন, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পণ্যোৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উহা মৃৎপাত্র মসৃণ করিতে ব্যবহৃত হয়।

93. সোডিয়াম কারবনেট (Sodium Carbonate): উহা সোডিয়াম, কারবন ও অক্সিজেনের যৌগ। উহার সংকেত Na_2CO_3: উহাতে কারবনিক অ্যাসিডের (H_2CO_3) দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু দুইটি সোডিয়াম পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে। উহা শমিত লবণ। 106 ভাগ সোডিয়াম কারবনেটে 46 ভাগ সোডিয়াম ধাতু, 12 ভাগ কারবন, 48 ভাগ অক্সিজেন থাকে। স্ফটিক জলসহ সোডিয়াম কারবনেটের সংকেত $Na_2CO_3, 10H_2O$। সোডিয়াম কারবনেট তিন প্রকারে সোডিয়াম ক্লোরাইড হইতে প্রস্তুত হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে সল্‌ভে পদ্ধতি অধিক প্রচলিত। সাধারণ লবণের গাঢ় দ্রবণে অ্যামোনিয়া ও কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালিত করিলে প্রথমে সোডিয়াম বাইকারবনেট প্রস্তুত হয়। উহাকে উত্তপ্ত করিলে সোডিয়াম কারবনেট ও কারবন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত হয়। সোডিয়াম কারবনেটকে প্রকৃতিতে শুষ্ক অঞ্চলে সাজিমাটি ও 'ট্রোনা' হিসাবে পাওয়া যায়।

সোডিয়াম কারবনেটের জলীয় দ্রবণকে বাষ্পীভূত করিলে সোডার স্ফটিক পাওয়া যায়। উহাকে কাপড়কাচা সোডা বলে। দ্রবণে অ্যাসিড দিলে কারবন ডাই-অক্সাইড উত্থিত হয়।

সোডিয়াম কারবনেট বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিতে, খর (hard) জল মৃদু (soft) করিতে এবং কাচ, কস্টিক সোডা ও সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম বাইকারবনেট বা সোডি বাইকার্ব: বেকিং সোডা: (Sodium Bicarbonate : Baking Soda): উহা অ্যাসিড লবণ অর্থাৎ H_2CO_3-এর একটি হাইড্রোজেন Na দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া এই

লবণ উৎপন্ন হয়। উহার সংকেত $NaHCO_3$। উহাতে 23 ভাগ সোডিয়াম, 1 ভাগ হাইড্রোজেন, 12 ভাগ কারবন ও 48 ভাগ অক্সিজেন থাকে। সোডিয়াম্ কারবনেটের সংপৃক্ত (saturated) দ্রবণের মধ্য দিয়া কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস অতিক্রম করাইলে সোডিয়াম বাইকারবনেটের দানা অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহার সহিত পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারট্রেট মিশ্রিত করিলে বেকিং পাউডার পাওয়া যায়। ময়দা জলে ভিজাইয়া উহার সহিত বেকিং পাউডার মিশাইয়া আগুনে সেঁকিলে সোডি বাইকার্ব হইতে কারবন ডাই-অক্সাইডের বুদবুদ বাহির হয়। ফলে রুটি ফুলিয়া উঠে ও ফোঁপরা হয়। সোডি বাইকার্ব অ্যাসিডকে প্রশমিত করে। সেইজন্য পাকস্থলীতে অম্লাধিক্য (acidity) হইলে উহা খাইতে হয়।

94. **স্মেলিং সল্ট (Smelling salt) :** অ্যামোনিয়াম কারবনেটের [$(NH_4)_2CO_3$] কয়েকটি বড় টুকরার সহিত একভাগ ল্যাভেণ্ডার তৈল ও নয় ভাগ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশাইয়া **স্মেলিং সল্ট** প্রস্তুত হয়। উহা হইতে ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়। উহা শুঁকিলে সর্দিতে ও মাথা ধরায় উপকার দেয়। উহা সবুজ বর্ণের শিশিতে থাকে। উহাতে ছিপি লাগানো থাকে। উহার ঘ্রাণে অনেকের মূর্চ্ছা সারিয়া যায়।

95. **কস্টিক সোডা (Caustic Soda) :** উহার এক অণুতে এক পরমাণু সোডিয়াম, এক পরমাণু অক্সিজেন ও এক পরমাণু হাইড্রোজেন থাকে। উহার সংকেত NaOH।

(i) জলের উপর সোডিয়ামের ক্রিয়ায় কস্টিক সোডা প্রস্তুত হয়। সাধারণ লবণের (NaCl) গাঢ় দ্রবণকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করিলে সোডিয়াম উৎপন্ন হয়। সোডিয়াম জলের সহিত কস্টিক সোডা উৎপন্ন করে।

(ii) সোডিয়াম কারবনেটের পাতলা জলীয় দ্রবণের সঙ্গে স্টীম ও চুন-গোলার যুগপৎ ক্রিয়া হইলে কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়া দ্রবণে থাকিয়া যায়। এই দ্রবণকে ছাঁকিয়া পরিস্রুতকে ঘনীভূত করিলে কস্টিক সোডা পাওয়া যায়।

কস্টিক সোডা উদ্‌গ্রাহী, সাদা স্ফটিকাকার, কঠিন তীব্র ক্ষার। উহা জলে অত্যন্ত দ্রাব্য। জলীয় দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। উহা অ্যাসিডের সহিত লবণ ও জল উৎপন্ন করে। উহা সাবানের ন্যায় পিচ্ছিল এবং উহা চামড়ায় ক্ষত উৎপাদন করে।

কস্টিক সোডা, সাবান, কাগজ, রং ও কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতে, পেট্রোলিয়াম শোধনে ও বিকারক (reagent) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

96. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid) : উহার এক অণুতে এক পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু ক্লোরিন আছে। উহার সংকেত HCl। উহাতে একভাগ হাইড্রোজেন ও 35·5 ভাগ ক্লোরিন থাকে। উহা তীব্র ও উদ্বায়ী অ্যাসিড। উহা সোডিয়াম ক্লোরাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। উহা পরীক্ষাগারে বিকারক (reagent) রূপে, ক্লোরিন ও ক্লোরাইড উৎপাদনে, রঞ্জন শিল্পে, রং ও ফসফেট উৎপাদনে, গ্লুর আটা প্রস্তুতে, টিনকে গ্যাল্‌ভানাইজ করিতে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

1. সাধারণ লবণ কোথা হইতে পাওয়া যায়? উহার ব্যবহার কি কি? উহার সংকেত কি?

2. কাপড়কাচা সোডার গঠন কি? উহার ধর্ম ও ব্যবহার বল।

3. কস্টিক সোডা কি প্রকারে পাওয়া যায়? উহার ধর্ম ও ব্যবহার কি কি?

4. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংকেত ও ধর্ম বল। উহার ব্যবহার কি?

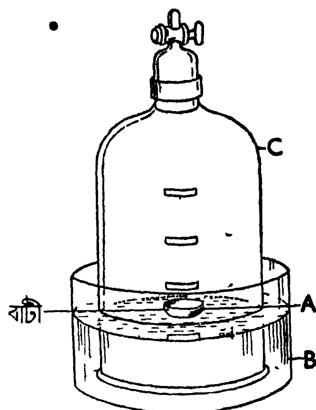
তৃতীয় পাঠ

নাইট্রোজেন (Nitrogen), নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle) ও নাইট্রোজেন সার (Nitrogen Fertiliser)

97. নাইট্রোজেন : বায়ু প্রধানতঃ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্র পদার্থ। আয়তন হিসাবে উহার প্রায় $\frac{4}{5}$ অংশ (78%) নাইট্রোজেন। আংশিক পাতন ক্রিয়ায় তরল বায়ু হইতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পৃথক করা যায়।

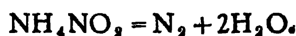
98. নাইট্রোজেনের প্রস্তুতি : (i) বায়ু হইতে অক্সিজেনকে অপসারণ করিলে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। একটি মুচিতে (crucible) একটু

ম্যাগনেসিয়াম রাখিয়া বড় পাত্রের জলে ভাসাইয়া দাও। উহাতে একটি ছিপিযুক্ত বেলজার চাপা দাও। ছিপি খুলিয়া বেলজারের জলতল হইতে বেলজারের মাথা পর্যন্ত স্থানকে সমান পাঁচ ভাগ কর। একটি জলন্ত কাঠি দিয়া ম্যাগনেসিয়াম স্পর্শ কর। প্রজ্বলিত ম্যাগনেসিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয়। উত্তাপ কমিলে জল অক্সিজেনের শূন্যস্থান পূরণ করিয়া একদাগ উপরে উঠে। বাকী চারি ভাগে নাইট্রোজেন থাকে। উহাতে জলন্ত কাঠি নিবিয়া যায়।



চিত্র 102 : বায়ু হইতে নাইট্রোজেন প্রাপ্তি।

(ii) একটি ফ্লাস্কে সোডিয়াম নাইট্রাইট ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অল্প জলে দ্রবীভূত করিয়া ধীরে ধীরে সামান্য তাপ দিলে প্রথমে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট উৎপন্ন হয় এবং তাপে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে।



$$NH_4NO_2 = N_2 + 2H_2O.$$

এই গ্যাসকে জল অপসারণ করিয়া গ্যাস-জারে ভর্তি করা হয়। এই পরীক্ষা সাবধানে করিতে হয়।

(iii) তরল বায়ুতে তাপ দিলে প্রথমে নাইট্রোজেন পৃথক হয়।

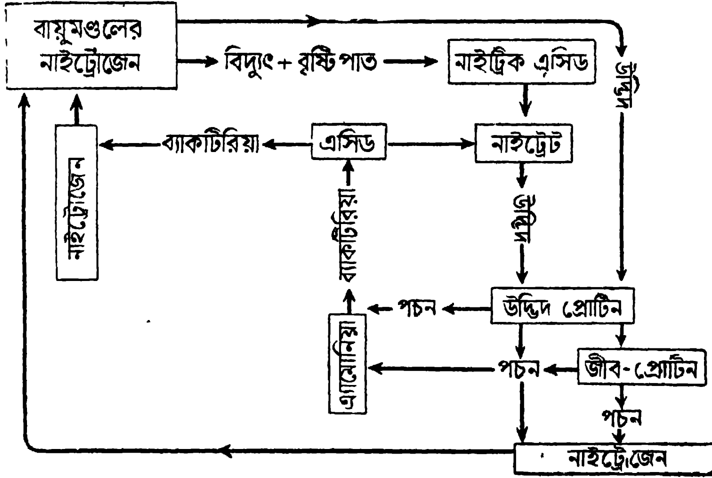
99. নাইট্রোজেনের ধর্ম : নাইট্রোজেন বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। উহা জলে প্রায় অদ্রাব্য। উহা বায়ুর প্রায় সমান ভারী। নাইট্রোজেন দাহ্য বা দহনের সহায়ক নয়। জলন্ত কাঠি নাইট্রোজেনপূর্ণ গ্যাসজারে ঢুকাইলে গ্যাসও জলে না, কাঠিও নিবিয়া যায়।

নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয় মৌল। উহা অন্য মৌলের সঙ্গে সহজে যুক্ত হয় না। উহা অক্সিজেনের সঙ্গে উচ্চ উষ্ণতায় নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন অত্যধিক চাপে ও 555°C উষ্ণতায় যুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া গঠন করে। অধিক উষ্ণতায় উহা ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া নাইট্রাইড গঠন করে। উহা চুনের জলকে ঘোলা করে না।

100. নাইট্রোজেনের ব্যবহার : অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, কৃত্রিম সার প্রভৃতি প্রস্তুতে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়। উহা গ্যাস-থার্মমিটারে ও বৈদ্যুতিক বালবের ভিতরে ব্যবহৃত হয়।

101. নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle) : প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের একটি প্রধান উপাদান প্রোটিন; প্রোটিনে নাইট্রোজেন আছে। বায়ু অফুরন্ত নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার। কিন্তু উদ্ভিদ বা প্রাণী কেহই বায়ু হইতে সাক্ষাৎভাবে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিতে পারে না; উদ্ভিদ মূল দ্বারা

নাইট্রোজেন চক্র



চিত্র 103 : নাইট্রোজেন চক্র।

মাটি হইতে নাইট্রেট লবণের জলীয় দ্রবণ টানিয়া লয়। নাইট্রেটে নাইট্রোজেন থাকে। উদ্ভিদ নাইট্রোজেন হইতে প্রোটিন গঠন করে। প্রাণী কিন্তু এইরূপ প্রোটিন গঠন করিতে পারে না। প্রাণীগণ উদ্ভিদের দ্বারা গঠিত প্রোটিন খাদ্য ভক্ষণ করিয়া দেহসাৎ করে। মাটির এই নাইট্রোজেন লবণ পরোক্ষভাবে বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে আসে।

প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বায়ুর নাইট্রোজেন নিম্নলিখিত উপায়ে জীবজগতের উপকারে আসে :

(i) বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে বর্ষাকালে বিদ্যুৎমোক্ষণে (electric discharge) উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপে বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন যুক্ত হইয়া নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন করে। উহা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশিয়া নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। আনুমানিক হিসাবে দেখা যায় যে প্রত্যহ সমগ্র পৃথিবীতে আড়াই লক্ষ টন নাইট্রিক অ্যাসিড বায়ুতে বিদ্যুৎমোক্ষণের ফলে উৎপন্ন হয়। মাটিতে এই

অ্যাসিড মাটির ক্ষারের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া পটাসিয়াম ও সোডিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন করে। উদ্ভিদ এই নাইট্রেট জলে দ্রবীভূত অবস্থায় শিকড় দ্বারা দেহসাৎ করে। প্রাণী উদ্ভিদ ভক্ষণ করিয়া উহা দেহসাৎ করে।

(ii) সিমজাতীয় উদ্ভিদের (leguminous plants), যথা ছোলা, মটর ও সিমের মূলে গুটি (nodules) থাকে। এই সকল গুটিতে এক প্রকার জীবাণু (bacteria) বাস করে। উহারা বায়ুর নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী জৈব পদার্থে পরিণত করিয়া উদ্ভিদকে উপহার দেয়। কতকগুলি শৈবাল, ছত্রক ও সিম জাতীয় উদ্ভিদ বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেন দেহসাৎ করে। অনেক সময় ধন্চে, বরবটি গাছে ফুল ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে জমি চষিয়া উহাদিগকে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়।

(iii) প্রাণী ও উদ্ভিদ মরিলে উহাদের দেহ পচিয়া কিংবা প্রাণীর মল মূত্রাদি পচিয়া মুক্ত নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন জীবাণু অ্যামোনিয়াকে পরিশেষে নাইট্রাইট, নাইট্রেট ও মুক্ত নাইট্রোজেনে পরিণত করে।

প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের এই রূপান্তরকে **নাইট্রোজেন চক্র** বলে।

102. কৃষিকার্যে নাইট্রোজেন যৌগ : প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের জন্য নাইট্রোজেন-খাদ্য অপরিহার্য। নাইট্রোজেন প্রোটিন-খাদ্য গঠন করে। উহা উদ্ভিদের দেহ গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উদ্ভিদ মাটি হইতে উহা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে। এইজন্য জমিতে নিয়মিত নাইট্রোজেন সার দিতে হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হয় না, ক্লোরোফিল নষ্ট হইয়া পাতা বিবর্ণ হয়। নাইট্রোজেন অধিক হইলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বেশী হয়, ফুল ধারণে বিলম্ব হয়, নানা রোগ দেখা দেয়। সুতরাং নাইট্রোজেন সার উপযুক্ত পরিমাণে দিতে হয়। উদ্ভিদ দ্বারা প্রস্তুত নাইট্রোজেন-খাদ্য প্রাণী ভক্ষণ করে। উদ্ভিদ মাটি হইতে নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য গ্রহণ করে। জমিতে স্বাভাবিকভাবে জীবজন্তুর দেহ, মলমূত্র, গাছপালা, খনিজ নাইট্রেট হইতে উৎপন্ন নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য থাকে। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপন্ন করিতে হয়। এই উপায়ে জমির স্বাভাবিক শস্য-উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পায়। কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মাটির সহিত মিশাইয়া কৃত্রিমভাবে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো হয়। এই রাসায়নিক দ্রব্যকে **সার** (fertiliser) বলে। নিম্নলিখিত রাসায়নিক দ্রব্য সার রূপে ব্যবহৃত হয় :—সোডিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম

সালফেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোলিম, জীবজন্তুর মলমূত্র।

কৃত্রিম সার উপযুক্ত পরিমাণে জমিতে ব্যবহার করা উচিত; সারের পরিমাণ অধিক হইলে ফসলের ক্ষতি হয়। কৃত্রিম সারের সহিত সবুজ সার যথা আবর্জনা পচা, গোবর, লতাপাতা উপযুক্ত পরিমাণে মিশাইয়া দেওয়া কর্তব্য। মাটি আম্লিক হইলে উপযুক্ত পরিমাণে চুন দেওয়া প্রয়োজন।

103. অ্যামোনিয়াম সালফেট ও অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট: অ্যামোনিয়াকে সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত মিশাইয়া কিংবা চূর্ণ ক্যালসিয়াম সালফেটের (জিপসাম নামক খনিতে পাওয়া যায়) সঙ্গে জল মিশাইয়া মিশ্রণের ভিতর দিয়া কারবন ডাই-অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া গ্যাস অধিক চাপ সহযোগে প্রবাহিত করিলে অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেটের সঙ্গে সোডিয়াম নাইট্রেট একত্রে ফুটাইলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। এই দুই লবণই জমিতে উত্তম সাররূপে ব্যবহৃত হয়।

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। জমিকে উর্বরা করিবার জন্য প্রচুর সারের আবশ্যক। সিন্ধ্রিতে প্রচুর অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হয়।

104. ফসল পরিবর্তন (Crop-rotation): মাটিতে স্বাভাবিকভাবে অনেক উদ্ভিদ-খাদ্য থাকে। আবার বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন খাদ্য প্রয়োজন। গমের জন্য যে খাদ্য যে পরিমাণ প্রয়োজন ধানের জন্য সে খাদ্য সেই পরিমাণ প্রয়োজন হয় না। কোন জমিতে প্রতি বৎসর একই ফসল জন্মাইলে সেই জমি সেই ফসলের পক্ষে অনুর্বর হয়। সেইজন্য একই জমিতে প্রতিবৎসর একই ফসল না জন্মাইয়া ফসলের পরিবর্তন করিতে হয়। কৃত্রিম সার যোগ করিয়া একই জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয়।

আবার এই কারণেই একই জমিতে এক বৎসর এক রকম ফসল উৎপন্ন করিয়া পরবর্তী বৎসরে অন্য রকম ফসল উৎপন্ন করা হয়।

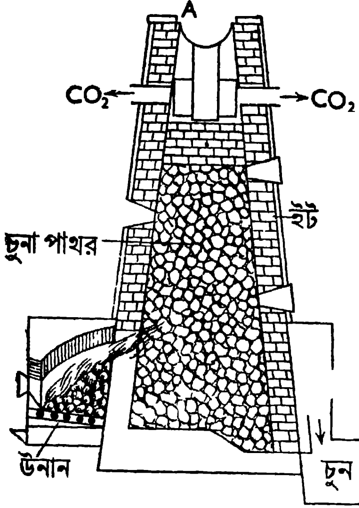
প্রশ্ন

1. নাইট্রোজেন চক্র কাহাকে বলে? বায়ু হইতে উদ্ভিদ কি প্রকারে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে?
2. সার কাহাকে বলে? সারের কি প্রয়োজন?
3. ফসল পরিবর্তন কি? কিসের জন্য উহা প্রয়োজন?
4. জীবাণু কি প্রকারে নাইট্রোজেন গ্রহণে উদ্ভিদকে সাহায্য করে?

চতুর্থ পাঠ

চুন (Lime)

105. **চুন:** চুনের সংকেত CaO; উহা ক্যাল্‌সিয়াম অক্সাইড। উহাকে Quick Lime-ও বলে। খড়িমাটি (chalk), চুনাপাথর (limestone), মার্বেল পাথর (marble stone), শামুক, জলচর ঝিনুক প্রভৃতিতে ক্যালসিয়াম কারবনেট ($CaCO_3$) থাকে। উহাদিগকে খোলা পাত্রে তীব্রভাবে 1000°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিলে চুন পাওয়া যায়। $CaCO_3 = CO_2 + CaO$।

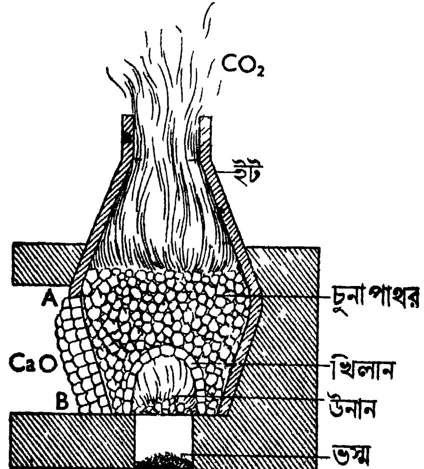


চিত্র 104 : চুন প্রস্তুতের অবিরাম পদ্ধতি।

চুন দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় যথা:—

(i) **অবিরাম পদ্ধতি:** একটি দীর্ঘ ইটের ভাঁটির মাথার ফাঁক (hopper) দিয়া চুনাপাথর ফেলা হয়। ভাঁটির এক পার্শ্বের উনানে কোক কয়লা পোড়ানো হয়। কারবন ডাই-অক্সাইড উপরের পথ দিয়া বাহির হয়। একই সঙ্গে চুনকে নীচ হইতে সরানো হয় এবং উপর হইতে চুনাপাথর ভিতরে ফেলা হয়।

(ii) **সবিরাম পদ্ধতি:** 105নং চিত্রানুযায়ী চুনা পাথরকে কাঠ বা কয়লা দিয়া পোড়ানো হয়। ভাঁটি শীতল হইলে প্রথমে চুন বাহির করিয়া পরে চুনাপাথর দিয়া ভাঁটি আবার ভর্তি করিতে হয়।



চিত্র 105 : চুন প্রস্তুতের সবিরাম পদ্ধতি।

106. **চুনের ধর্ম:** চুন। সাদা অ নি য় তা কা র

(amorphous) কঠিন। উহা কারবন ডাই-অক্সাইড ও জল শোষণ করে। চুন দ্বারা ভিজা পদার্থকে শুষ্ক করা হয়। চুন অল্প জলে দ্রবীভূত হইয়া কলিচুন $Ca(OH)_2$ উৎপন্ন করে: $CaO+H_2O=Ca(OH)_2$। এই ক্রিয়ায় প্রভূত তাপ উদ্ভূত হয়। চুনের জল কারবন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়া ক্যালসিয়াম কারবনেট উৎপন্ন করে। উহা জলে অদ্রাব্য। সেইজন্য পরিষ্কার চুনের জল কিছুক্ষণ বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহা ঘোলাটে হয়।

107. চুনের ব্যবহার: চুন কলিচুন প্রস্তুতে, শুষ্কীকারকরূপে, ধাতু নিষ্কাশনে বিগালক রূপে, ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। অক্সি-হাইড্রোজেন শিখাতে চুন রাখিলে আলো খুব উজ্জ্বল হয়। উহাকে চুনের আলো (Lime Light) বলে। কলিচুন ঘর গাঁথনির মশলাতে, ঘর চুনকাম করিতে, কৃষিকার্যে, সিমেণ্ট, কাচ, কংক্রীট ও ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। কলিচুনকে অতিরিক্ত জলে গুলিলে পরিষ্কার **চুনের জল** (lime water) পাওয়া যায়। উহা পরীক্ষাগারে ও পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয়। কলিচুনকে সামান্য জলে মিশাইলে **চুনগোলা** (milk of lime) পাওয়া যায়। উহা বহু শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কলিচুন ও কস্টিক সোডার মিশ্রণকে **সোডা-চুন** (Soda lime) বলে। উহা শুষ্কীকারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একভাগ কলিচুন ও তিনভাগ বালির মিশ্রণকে **চুনা মর্টার** (Lime mortar) বলে। সিমেণ্ট, বালি ও জলের মিশ্রণকে **সিমেণ্ট মর্টার** (Cement mortar) বলে। উহারা গাঁথনিকে শক্ত করিতে ব্যবহৃত হয়। চুনাপাথরের গুঁড়া ও মাটি 1400°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিলে **সিমেণ্ট** প্রস্তুত হয়। সিমেণ্ট জলের সহিত মিশিয়া জমাট বাঁধে।

108. খড়িমাটির ব্যবহার: খড়িমাটি লিখিবার পেন্সিল, সাদা রং, দাঁতের মাজন, গায়ে মাখা পাউডার প্রস্তুতে ও চুন প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। মার্বেল পাথর দিয়া মূর্তি, মন্দির, বাসন ও খেলনা প্রস্তুত হয়।

109. কৃষিকার্যে চুনের উপকারিতা: দুইটি উদ্দেশ্যে মাটিতে চুন মিশাইতে হয়:—(i) মাটিতে অম্লগুণ অধিক হইলে উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর। সেইজন্য মাটির অম্লগুণ হ্রাস করিবার জন্য মাটিতে চুন মিশাইতে হয়।

(ii) উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টিসাধনের জন্য ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। মাটিতে চুন মিশাইয়া উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করা হয়।

অনুশীলনী

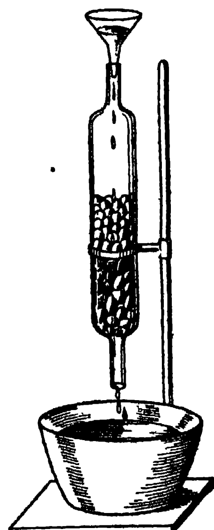
1. চুন কি প্রকারে পণ্য হিসাবে উৎপন্ন হয়? 2. চুন আমাদের কি কি উপকার করে? 3. কৃষিকার্যে চুনের কি উপকারিতা? 4. খড়িমাটি কি উপকারে লাগে?

পঞ্চম পাঠ

খরজল ও মৃদুজল (Hard and Soft Water)

110. খর (Hard) জল ও মৃদু (Soft) জল: যে জলে সাধারণ সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় তাহাকে **মৃদু জল** বলে। যে জলে সাধারণ সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না তাহাকে **খর জল** বলে।

খর জলে কতকগুলি লবণ যথা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর ক্লোরাইড, সালফেট, বাইকারবনেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। যে জলে শুধু ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের বাইকারবনেট থাকে তাহাকে **অস্থায়ী খরজল** বলে; আর জলে ঐ দুই ধাতুর সালফেট বা ক্লোরাইড থাকিলে জল **স্থায়ী** খরতা প্রাপ্ত হয়। জলের এই সকল দ্রাব্য পদার্থ সাবানের সহিত যুক্ত হইয়া কতকগুলি অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত হয়। উহাতে সাবান অযথা নষ্ট হয়। খরজলের দ্রাব্য পদার্থগুলিকে প্রথমে অদ্রাব্য পদার্থে পরিণত করিয়া খরতা দূর করা হয়। তখন জল মৃদু হয়। উহাতে সাবান ঘষিলে সাবান নষ্ট হয় না।



চিত্র 106: পারমুটিট।

111. খর জলকে মৃদু করিবার প্রণালী (Methods of softening hard water): (১) অস্থায়ী খর জলকে ফুটাইলে দ্রাব্য বাইকারবনেট অদ্রাব্য কারবনেটে পরিণত হয়। তখন জলকে ছাঁকিয়া লইতে হয়। (২) **অস্থায়ী খরতা** (temporary hardness) দূর করিবার জন্য জলে উপযুক্ত পরিমাণ কলিচুন $Ca(OH)_2$ মিশাইয়া উষ্ণ করিলে দ্রাব্য বাইকারবনেট অদ্রাব্য কারবনেটে পরিণত হয়। (৩) শুধু ফুটাইয়া বা চুন মিশাইয়া জলের **স্থায়ী খরতা** দূর করা যায় না। সেক্ষেত্রে খর জলের সহিত কিছু সোডা মিশাইয়া

গরম করিলে দ্রাব্য ক্লোরাইড ও সালফেট অদ্রাব্য কারবনেট লবণে পরিণত হয়। এই জল ছাঁকিলে মৃদু জল পাওয়া যায়। (৪) আজকাল সোডিয়াম পারমুটিট (Sodium Permutit) নামক পদার্থের সাহায্যে জলের স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা দূর করা হয়। এই পদ্ধতি খুবই কম ব্যয়সাধ্য। ইহাতে সোডিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট ও কিছু নুড়ি একটি মোটা নলের মধ্যে পুরিয়া তাহার ভিতর দিয়া খর জল পরিচালনা করা হয় (চিত্র 106)।

খর জলের ব্যবহারে সাবান নষ্ট হয়, খাদ্যদ্রব্য ভাল সিদ্ধ হয় না। উহা হইতে বয়লারে বা কেটলির গায়ে সাদা স্তর পড়ে।

অনুশীলনী

1. খর জল ও মৃদু জল কাহাকে বলে ? 2. খর জলকে মৃদু করিবার প্রণালী বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায় সম্বন্ধে Objective Type প্রশ্নাবলী

1. **Recall Type :**

(i) চুনের সংকেত—

(ii) খড়িমাটির রাসায়নিক নাম—

2. **Completion Type :**

অ্যাসিডে অম্ল — সঙ্গে — থাকিবেই, উহা কোন — বা — র মত অম্ল — দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অ্যাসিড মাত্রই — — কাগজকে — করিবে। উহা — সঙ্গে — উৎপন্ন করে।

3. **Alternate Response Type :**

True or false Type : সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও :

(i) কারবন ডাই-অক্সাইড চুনের জলকে ঘোলা করে।

(ii) খড়িমাটি অক্সিজেন ও ক্যালসিয়ামের মিশ্রণ।

(iii) অ্যামোনিয়া জলে অদ্রাব্য।

(iv) কারবন ডাই-অক্সাইড দহনের সহায়ক নয়।

Yes or No Type :

1. হাইড্রোজেন কি সকল অ্যাসিডের উপাদান ?

2. সাধারণ লবণে কি সোডিয়াম আছে ?

4. **Association Type :** সম্পর্ক বজায় রাখিয়া শূন্য স্থান পূরণ কর।

অক্সাইড : অক্সিজেন :: অ্যাসিড : —

পঞ্চম অধ্যায়

জীব জগৎ (Living Beings)

প্রথম পাঠ

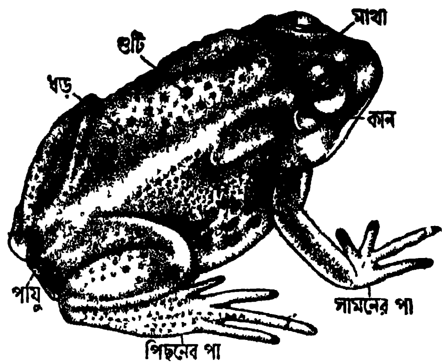
ব্যাঙ (Frog)

112. ব্যাঙের প্রকার ভেদ : ব্যাঙের দেহে একটি শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড (Skeleton) আছে ; সুতরাং উহারা মেরুদণ্ডী প্রাণী। আবার উহারা জলে ও স্থলে বাস করে ; সেইজন্য উহারা উভচর প্রাণী। ব্যাঙ নানা প্রকারের হয়, তন্মধ্যে বাংলাদেশে কুনো ব্যাঙ ও সোনা ব্যাঙ বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কুনো ব্যাঙের পিঠে আঁচিল থাকে। উহাকে বড় কুৎসিৎ দেখায়। সোনা ব্যাঙ আকারে বড় হয়। উহাদের মাথার অগ্রভাগ সরু, দেহটা চকচকে ও পিচ্ছিল। উহাদের পেট সোনার মত হলদে এবং পিঠে সবুজের উপর কালো দাগ থাকে। গেছো ব্যাঙ আঙ্গুলের সাহায্যে গাছে উঠে।



চিত্র 107 : সোনা ব্যাঙ।

113. ব্যাঙের দেহের বহির্গঠন : একটি ব্যাঙ যোগাড় করিয়া ব্যাঙের দেহ পরীক্ষা কর। উহার দেহে দুইটি প্রধান অংশ দেখিবে, যথা **মাথা** ও **ধড়**। আমাদের মত উহাদের ঘাড় নাই, মাথা ও ধড় একসঙ্গে মেশানো থাকে। উহাদের কোমর ও লেজ নাই। উহাদের মাথা বেশ বড় ও চ্যাপ্টা, মাথায় দুইটি বড় ও গোল চোখ আছে। আমাদের চোখ কোটরের ভিতর থাকে কিন্তু ব্যাঙের চোখ



চিত্র 108 : কুনো ব্যাঙের দেহের বহির্গঠন।

বাহিরের দিকে বাহির হইয়া থাকে। আমাদের চোখে উপর-নীচে দুইটি পাতা থাকে, কিন্তু ব্যাঙের চোখে তিনটি পাতা থাকে। তৃতীয় পাতা খুব স্বচ্ছ। চোখ বন্ধ করিলেও উহার ভিতর দিয়া ব্যাঙ দেখিতে পায়।

ব্যাঙের চোখের পশ্চাতে দুই ধারে পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা ঢোলকের ন্যায় দুইটি কান আছে। কান চামড়া দিয়া ঢাকা থাকে বলিয়া উহারা জলে সহজেই চলাফেরা করিতে পারে।

ব্যাঙের নাকের ছিদ্র খুব ছোট। নাকের ছিদ্রকে উহারা ইচ্ছামত খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারে। সেইজন্য উহাদের জলে সাঁতরাইবার সময়ে কোন অসুবিধা হয় না।

একটি ব্যাঙের মুখ ফাঁক করিয়া দেখ মুখের গর্তটা বেশ বড়। সোনা ব্যাঙের উপর চোয়ালে একপাটি দাঁত থাকে। উহারা দাঁত দিয়া শিকার ধরে কিন্তু খাদ্য চিবায় না। ব্যাঙের জিভ্ খুব লম্বা এবং চট্‌চটে। জিভের সম্মুখ ভাগ নীচের চোয়ালের সঙ্গে আটকানো থাকে এবং পিছনের ভাগ আল্‌গা থাকে, সেইজন্য ব্যাঙেরা কীট পতঙ্গ ধরিবার সময় জিভ্ উল্‌টাইয়া বাহির করিয়া দেয়। ছোট ছোট কীট পতঙ্গ চট্‌চটে জিভে আট্‌কাইয়া যায় এবং ব্যাঙ তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে গিলিয়া ফেলে।

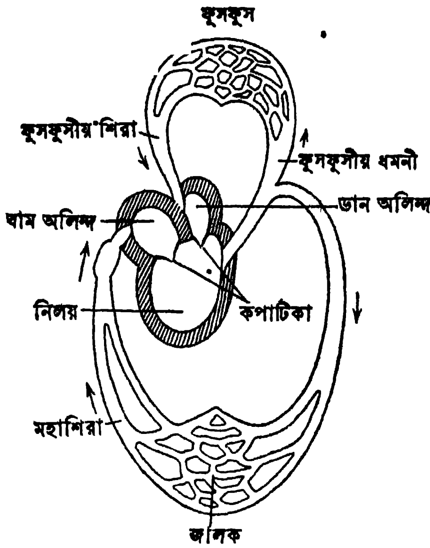
ব্যাঙের চারিটি পা আছে। পিছনের পা সামনের পা অপেক্ষা একটু বড় সেইজন্য উহারা ভাল লাফাইতে পারে। পিছনের পায়ের আঙ্গুলগুলি জোড়া বলিয়া উহারা জলে সাঁতার কাটিতে পারে।

ব্যাঙের দেহ খুব পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা। চামড়া দিয়া উহারা কিছু শ্বাসকার্য চালায় এবং দেহের মধ্যে কিছু জল লয়।

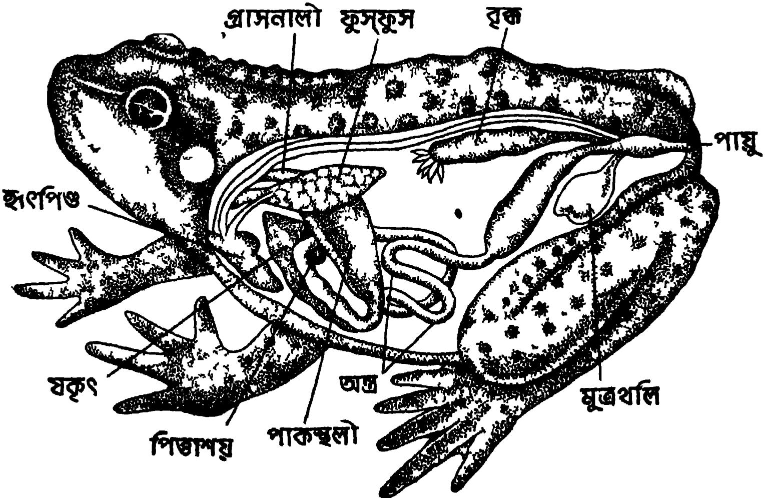
114. ব্যাঙের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন :

(ক) **রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র :** আমাদের হৃদয়ে চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে কিন্তু ব্যাঙের হৃদয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। উপরে দুইটি **অলিন্দ** (Auricle)—বাম অলিন্দ ও ডান অলিন্দ এবং নীচে একটি **নিলয়** (Ventricle)। অলিন্দ হইতে নিলয়ে রক্ত প্রবাহিত হইবার ছিদ্র আছে। ছিদ্রে কপাটিকা আছে। ব্যাঙের দেহের দূষিত রক্ত **ঊর্ধ্ব** ও **অধঃ মহাশিরা** দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাম অলিন্দে উপস্থিত হয়। ফুসফুস হইতে বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরা দিয়া, ডান অলিন্দে যায়। ডান অলিন্দ বিশুদ্ধ রক্তে পূর্ণ হইলে উভয় অলিন্দের পেশী সংকুচিত হয়। উহার ফলে রক্তের উপর চাপ পড়ে। এই চাপের জন্য রক্ত

মহা ধমনীতে প্রবাহিত হয়। এই ধমনীতে একটি পেঁচাল কপাটিকার সাহায্যে রক্ত দুইটি অংশে বিভক্ত হয়। দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী দিয়া ফুসফুসে যায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত অন্য ধমনী দিয়া দেহের সর্বত্র জালকে প্রবাহিত হয়। জালকের বিশুদ্ধ রক্ত প্রত্যেক জীবিত কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং কারবন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া দূষিত হয়। তৎপরে শিরা ও মহাশিরা দিয়া রক্ত বাম অলিন্দে যায়। ফুসফুসের রক্ত ফুসফুসের বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কারবন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।



চিত্র 109 : ব্যাঙের দেহের রক্ত সঞ্চালন।



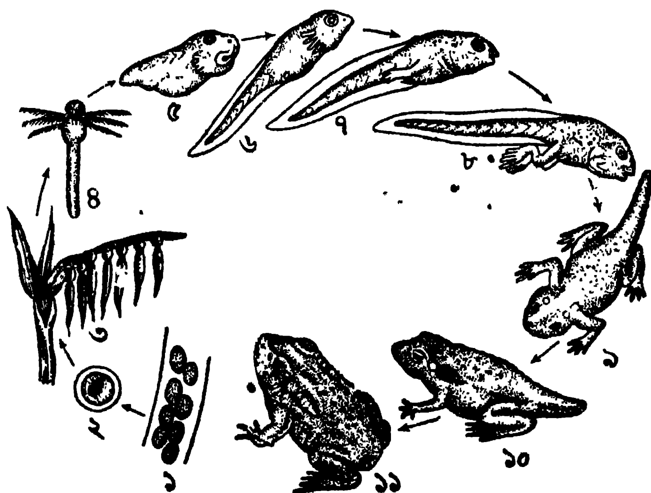
চিত্র 110 : ব্যাঙের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন।

(খ) ব্যাঙের পচন তন্ত্র (Alimentary Canal) : ব্যাঙের মুখের

পশ্চাৎ ভাগ হইতে পচন নালী বহির্গত হইয়াছে। উহার উপর অংশকে **গ্রাসনালী** (Oesophagus) এবং নীচের অংশকে **পাকস্থলী** বা **আমাশয়** (Stomach) বলে। আমাশয় হইতে **অন্ত্র** বহির্গত হইয়াছে। অন্ত্রের দুইটি অংশ থাকে। প্রথম অংশকে **ক্ষুদ্রান্ত্র** (small intestine) ও শেষের অন্ত্রকে **বৃহদন্ত্র** (large intestine) বলে। বৃহদন্ত্রের শেষ অংশকে **ক্লোয়েকা** (Cloaca) বলে। উহার একটি ছিদ্র দিয়া মলমূত্র বহির্গত হয়।

আমাশয়ের দুই পার্শ্বে **যকৃৎ** (Liver) তিন খণ্ডে বিভক্ত। অন্ত্রের গোড়ায় বাহিরের দিকে **অগ্ন্যাশয়** (Pancreas) অবস্থিত। উহা হইতে নিঃসৃত রস দ্বারা ব্যাঙ খাদ্য হজম করে।

115. ব্যাঙের রূপান্তর : ব্যাঙের জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে উহার দেহের বহির্গঠনের পরিবর্তন হয়। সোনা ব্যাঙ বড় জলাশয়ে ডিম পাড়ে, কিন্তু কুনো ব্যাঙ যে কোন স্থানে জল পাইলেই ডিম পাড়ে (১, ২, ৩)।



চিত্র 111 : ব্যাঙের রূপান্তর।

সোনা ব্যাঙের ডিম দানার আকারে গঁদের চাপড়ার মত জলের উপর একসঙ্গে ভাসে (৩)। কুনো ব্যাঙের ডিম পরস্পর সংযুক্ত ফিতার মত জলে ভাসে (১)। দিন কতক পরে ডিম ফুটিয়া **ব্যাঙাচি** (৪) বাহির হয়। ব্যাঙাচি ও ব্যাঙের দেহের পার্থক্য অনেক। ব্যাঙাচির প্রথমে মাথা ও লেজ থাকে (৬)। সোনা

ব্যাঙাচির লেজ প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। ব্যাঙাচি লেজের সাহায্যে জলের ভিতর সাঁতার কাটে।

ব্যাঙাচির মাথায় দুই পাশে উঁচু চোষকযন্ত্র (৭) বাহির হয়। উহাদের সাহায্যে ব্যাঙাচিরা জলের মধ্যে কোন দ্রব্যের গায়ে আটকাইয়া থাকে। উহাদের তখন চোখ বা মুখ থাকে না। কয়েকদিন পরে উহাদের মুখ বাহির হয় এবং মুখের ভিতর চিরুণীর দাঁড়ার মত দাঁত থাকে (৮)।

এই অবস্থায় উহাদের মাথার দুই পাশ হইতে ফুলকা বাহির হয়। কিছুদিন পরে একটি পাতলা. ঢাকনা দিয়া ফুলকা ঢাকা পড়ে। এই ঢাকনাকে **কানকো** বা **কানকুয়া** বলে। কানকুয়া হইতে নূতন ফুলকা গজায়। প্রথম ফুলকা শুকাইয়া যায়। ব্যাঙাচি নীচের ফুলকা ও কানকুয়া দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। এই সময়ে উহাদের দেহের মধ্যে ফুসফুস গজায়। তার আগেই সামনের পা গজায় (৯), পরে কানকুয়া ও ফুলকা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন ফুসফুস দিয়া উহারা শ্বাসকার্য চালায়। এই সময়ে উহাদের বড় লেজ থাকে (১০)। কিছুদিন পরে এই লেজ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া লোপ পায় (১১)।

অনুশীলনী

1. ব্যাঙকে উভচর প্রাণী বলে কেন?
2. ব্যাঙ কয় প্রকারের হয়?
3. ব্যাঙের দেহের বহির্ভাগ বর্ণনা কর। একটি সোনা ব্যাঙের ছবি আঁক।
4. ব্যাঙের জিভের বৈশিষ্ট্য কি?
5. ব্যাঙের দেহে কি প্রকারে রক্ত সঞ্চালন হয়? সঞ্চালন যন্ত্র বর্ণনা কর।
6. ব্যাঙের পচন তন্ত্র বর্ণনা কর।
7. ব্যাঙের রূপান্তর বর্ণনা কর।

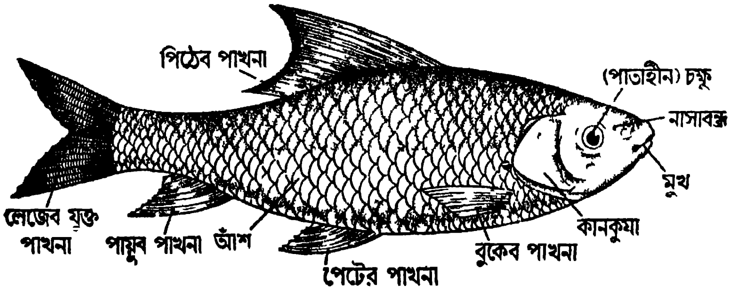
দ্বিতীয় পাঠ

মাছ (Fish)

116. মাছের দেহ : মাছ সর্বনিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী। উহারা জলচর প্রাণী। সেইজন্য উহাদের দেহ অতি মসৃণ এবং পিচ্ছিল তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। উহাদের দেহের দুই দিক সরু, মধ্য ভাগ মোটা, কতকটা নৌকার মত। এই আকৃতির জন্য মাছের জলে সাঁতার কাটিতে সুবিধা হয়।

117. মাছের দেহের বহির্গঠন : অধিকাংশ মাছের দেহে তৈলাক্ত পদার্থের নীচে **আঁশ** (scales) থাকে। মাগুর সিঙ্গি প্রভৃতি মাছের আঁশ থাকে না।

মাছের হাত পা নাই। উহাদের পরিবর্তে প্রায় প্রত্যেক মাছেরই শক্ত কাঁটাযুক্ত নিম্নলিখিত **পাখনা** (fins) থাকে : (i) কানকোর দুই পাশে দুইটি পাখনা, (ii) দেহের মধ্যস্থানে পেটের দুই পাশে দুইটি পাখনা, (iii) পিঠের



চিত্র 112 : মাছের দেহের বহির্ভাগের গঠন।

মাঝখানে একটি পাখনা, (iv) পায়ুর ঠিক পিছনের একটি পাখনা ও (v) লেজের যুক্ত পাখনা। লেজের পাখনা নৌকার হালের ন্যায় মাছের গতিপথ নির্ণয় করে এবং ডান দিকে বা বাম দিকে ঘুরিতে সাহায্য করে। জোড়া পাখনাগুলি দাঁড়ের মত উপর নীচে নড়িয়া মাছকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।

মাছের মাথার দুই পাশে দুইটি গোলাকার চোখ থাকে। উহাদের চোখের পাতা নাই। উহাদের কান মাথার মধ্যে থাকে। মাথার উপর দিকে নাকের ছিদ্র থাকে। মাছের নাকের সহিত মুখের কোন সংযোগ নাই।

118. মাছের আভ্যন্তরীণ গঠন : মাছের মাথার পাশে, অস্থি নির্মিত দুইটি **কানকুয়া** (gill flap) থাকে। প্রত্যেক কানকুয়ার নীচে চিরুণীর দাঁতের মত লাল বর্ণের দুইটি **ফুলকা** (gill) থাকে। এই ফুলকার

সাহায্যেই মাছ শ্বাসকার্য চালায়। ফুলকার একপ্রান্ত দেহের সহিত সংলগ্ন, অপর প্রান্ত সংলগ্ন থাকে না।

মাছের রক্ত সঞ্চালন : মাছেরও একটি **হৃদযন্ত্র** আছে। উহার দুইটি প্রধান ভাগ আছে, যথা—**অলিন্দ** ও **নিলয়**। মাছের হৃদযন্ত্র এমন মাংসপেশী দ্বারা প্রস্তুত যে, উহা পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হয়; উহার ফলে মাছের দেহে রক্ত চলাচল হয়। মাছের রক্ত শীতল।

মাছের মুখ : মাছের মুখ-বিবর বেশ বড়। মাছের মুখ-বিবরের পশ্চাৎ দিকের অংশকে ফ্যারিংস বলে। ফ্যারিংসের তলদেশে কতকগুলি দাঁতের মত যন্ত্র আছে। উহাদিগের সাহায্যে মাছ আহার্য দ্রব্য চিবাইয়া নরম করিয়া লয়। মাছের একটি ছোট জিহ্বা থাকে। কতকগুলি মাছের মুখের সামনে মাংসের গদি থাকে। বঁড়শীতে মাছ ধরিলে বঁড়শী ঐ নরম গদিতে আটকাইয়া যায়।



চিত্র 113 : মাছের আভ্যন্তরীণ গঠন।

মাছের পচনতন্ত্র : ফ্যারিংসের নিম্নভাগ হইতে একটি নালী আরম্ভ হইয়া পায়ুতে শেষ হইয়াছে। উহাকে **পৌষ্টিক নালী** বলে। পৌষ্টিক নালীতে খাদ্য পরিপাক হয় এবং খাদ্যের সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। এই নালীর প্রথম অংশকে **পাকস্থলী** ও শেষের অংশকে **অন্ত্র** বলে। পাকস্থলী বর্তুলাকৃতি থলির মত। অন্ত্রের শেষ অংশকে **মলনালী** বলে। মলনালী পায়ুর ছিদ্রে শেষ হইয়াছে।

পাকস্থলীর দুইধারে পাতলা লম্বা দুইটি **যকৃৎ** আছে। উহার রস অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। দুই যকৃতের মাঝে একটি বড় ও গদাকৃতি **পিত্তস্থলী** আছে। উহার সহিত অন্ত্র ও যকৃতের যোগ থাকে। পিত্ত সবুজ রঙের তেতো রসে পূর্ণ থাকে। পিত্তস্থলীর আবরণ খুব পাতলা। উহা সহজেই গলিয়া যাইতে পারে। তখন মাছ খাইতে তেঁতো লাগে।

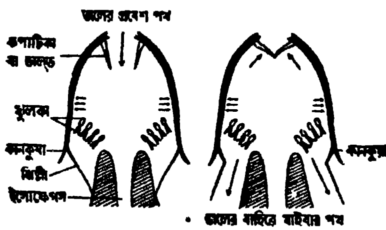
প্রায় প্রত্যেক মাছেরই একটি পটকা থাকে। উহার রঙ সাদা এবং উহার

দুইটি কক্ষ। উহা বায়ুপূর্ণ বলিয়া খুব হালকা হয়। উহার সাহায্যেই মাছ এত সহজে জলে ভাসিয়া বেড়ায় এবং উপরে নীচে যাইতে পারে।

মাছের পিঠে কতকগুলি কশেরুকা (vertebra) দ্বারা গঠিত একটি **শিরদাঁড়া** আছে ; সেইজন্য পিঠের দিক ভারি হয়। জলের ভিতর জীবিত অবস্থায় পিঠের দিক উপরে থাকে। মরিয়া গেলে পিঠের দিক উল্টাইয়া পড়ে। মাছের আঁশ ও কাঁটা অস্থি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

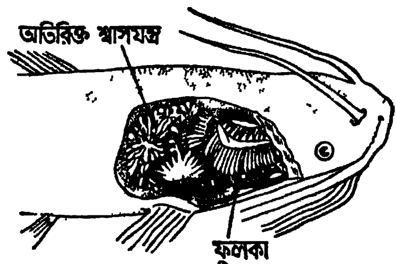
মাছ সাধারণতঃ সর্বশরীর দিয়া জল শোষণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। কোন কোন মাছ জলের মধ্যে গাছপালার টুকরা দিয়া বাসা নির্মাণ করিয়া ডিম পাড়ে। প্রত্যেক মাছই কম বেশী জলজ উদ্ভিদ, শেওলা ইত্যাদি ও ছোট মাছ বা অন্য পোকা খায়। চিতল ও বোয়াল প্রভৃতি বড় মাছ অন্য ছোট মাছ ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

মাছের শ্বাসযন্ত্র : ফুল্‌কার চারি পাশে একটি গহ্বর আছে ; ফুলকাতে বহু সূক্ষ্ম রক্তবহা নালী বা জালক আছে ; সেইজন্য উহা লাল দেখায়।



চিত্র 114 : মাছের শ্বাসযন্ত্র।

মাছ প্রথমে দুইটি কানকুয়া বন্ধ করিয়া মুখে জল লয়। তৎপরে কপাটিকা (valve) দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া পার্শ্ব হইতে চাপ দেয় ; চাপের ফলে কিছু জল ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার জালকের পাতলা পর্দা ভেদ করিয়া দূষিত রক্তকে শোধন করে। মাছ মুখগহ্বর আরও সঙ্কুচিত করে বলিয়া জল কানকুয়া খুলিয়া বাহির হইয়া যায়। জোর করিয়া মাছের মুখ বা কানকুয়া খোলা রাখিলে শ্বাসকার্যের অভাবে মাছ মরিয়া যায়। হয়ত লক্ষ্য করিয়াছ, পুকুরে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ মুখ হাঁ করিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে। উহাকে **খাবি খাওয়া** বলে।



চিত্র 115 : সিঙ্গি মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র।

সিঙ্গি, মাগুর, কই প্রভৃতি মাছ ফুলকা ব্যতীত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র দ্বারা জলের বাহিরের বাতাস হইতে শ্বাসকার্য চালায়। সেইজন্য উহারা জল হইতে উপরে উঠিলেও বাঁচিয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. মাছ জলচর প্রাণী। সেইজন্য উহার দেহের বৈশিষ্ট্য কি ?
2. মাছের দেহের বহির্গঠন বর্ণনা কর।
3. মাছের দেহের একটি ছবি আঁক।
4. মাছের পাখনাগুলি কি কাজ করে ?
5. মাছের শ্বাসযন্ত্র বর্ণনা কর।
6. মাছের পচনতন্ত্র বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায় সম্বন্ধে Objective Type প্রশ্নাবলী

1. **Recall Type :** ডানদিকের শূন্যস্থান পূরণ কর।

(i) যে ব্যাঙের পিঠে আঁচিল থাকে তাকে বলে — —।

(ii) ব্যাঙের হৃদয়ে অলিন্দ —।

(iii) ব্যাঙের বৃহদন্ত্রের শেষাংশকে বলে —।

2. **Completion Type :** শূন্যস্থান পূরণ করিয়া উক্তি সম্পূর্ণ কর।

ব্যাঙের হৃদয়ে — প্রকোষ্ঠ আছে, উপরে — এবং নীচে — — আছে, ব্যাঙের দেহের — রক্ত — ও — মহাশিরা দিয়া প্রবাহিত হইয়া — অলিন্দে উপস্থিত হয়।

3. **Alternate Response Type :**

True or False Type : সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও।

(i) ব্যাঙের দেহ মোটা চামড়া দিয়া ঢাকা ?

(ii) ব্যাঙের চোখে তিনটি পাতা আছে।

(iii) ব্যাঙ কান দিয়া শোনে।

(iv) মাছ অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

Yes or No Type : হাঁ কি না উত্তর দাও।

(i) ব্যাঙের ঘাড় আছে কি ?

(ii) জোর পূর্বক মাছের কানকুয়া খোলা রাখিলে মাছ কি মরিয়া যায় ?

(iii) মাছের পটকা কি বায়ুপূর্ণ থাকে ?

(iv) ব্যাঙাচির কি মাথা ও লেজ থাকে ?

4. Association Type :

অর্থ সঙ্গতি বজায় রাখিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

ব্যাঙ : পা : : মাছ : —

5. Matching Type : দ্বিতীয় স্তম্ভ হইতে উপযুক্ত শব্দ বাছিয়া প্রথম স্তম্ভের শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

I	II
(i) ব্যাঙের আমাশয়ের — — যকৃত — — বিভক্ত।	শিরদাঁড়া।
(ii) বিশুদ্ধ রক্ত — সরবরাহ করে।	দুই পার্শ্বে তিন খণ্ডে
(iii) মাছের পিঠে — আছে।	অক্সিজেন

ষষ্ঠ অধ্যায়

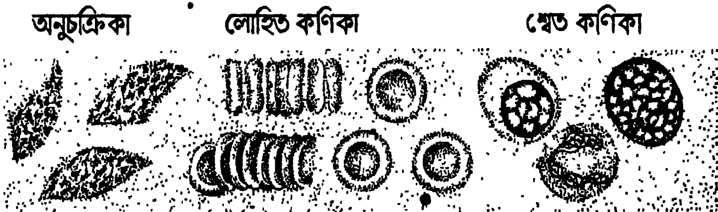
মানবদেহ (The Human Body)

প্রথম পাঠ

রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র (Circulatory System)

119. মানব রক্ত : রক্ত মানবদেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া স্থগিত হইলেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রক্ত উজ্জ্বল, গাঢ় লাল বর্ণের তরল পদার্থ। পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে লোহিত কণিকা (red blood corpuscles), শ্বেত কণিকা (white blood corpuscles) ও রক্তরস (plasma), এই তিনটি পৃথক উপাদান দেখা যায়।

লোহিত কণিকাগুলির উপাদান হিমোগ্লোবিন নামে লৌহের যৌগিক পদার্থ। উহার রং লাল বলিয়াই লোহিতকণা ও রক্তকে লাল দেখায়। অণুবীক্ষণে উহাদের অতি চ্যাপ্টা ও গোল দেখায়। লোহিত কণার প্রধান কার্য দেহের কোষগুলি জীবিত রাখা। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে অক্সিজেন ফুসফুসে টানিয়া লই, রক্তের লোহিত কণাগুলিই সেই অক্সিজেন শরীরের প্রতি কোষে পৌঁছাইয়া দেয় এবং কোষ নিঃসৃত দূষিত কার্বন



চিত্র 116 :

ডাই-অক্সাইডও লোহিতকণার সাহায্যেই ফুসফুসে আসিয়া পৌঁছায় এবং প্রশ্বাসরূপে আমরা তাহাকে ত্যাগ করি। এই অক্সিজেনের দহনে কোষের তথা দেহেরও উত্তাপ রক্ষিত হয়।

শ্বেতকণিকাগুলি বর্ণহীন ও লোহিতকণিকা অপেক্ষা সংখ্যায় বহু কম, অথচ আয়তনে বড়। উহাদের নির্দিষ্ট আকৃতি নাই। শ্বেত কণিকার প্রধান কার্য হইল, রক্তে অপর কোন জীবাণু প্রবেশ করিলে তাহাকে প্রতিরোধ করা। শ্বেতকণিকা জীবাণু প্রতিরোধে অক্ষম হইলে জীবাণুরা ব্যাধি সৃষ্টি করে।

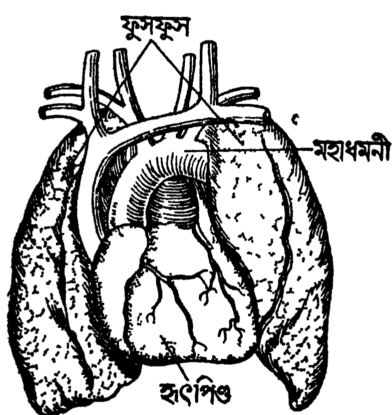
রক্তের মধ্যে শ্বেতকণিকার মতই ক্ষুদ্রতর আর একপ্রকার কণিকা পাওয়া যায়, তাহার নাম **অনুচক্রিকা**। উহারা এক প্রকার রস নিঃসৃত করিতে পারে। শরীরের কোথাও রক্তপাত ঘটিলে, এই রস নিঃসৃত হইয়া রক্তমণ্ডের সহিত মিশিয়া যায় এবং রক্তকে জমাট বাঁধিতে সাহায্য করে।

রক্তরসের প্রধান উপাদান ফাইব্রিনোজেন নামে একটি তরল পদার্থ। রক্তরস থাকার জন্যই লোহিত ও শ্বেতকণিকা তরল অবস্থায় থাকে। রক্তরস বাহিরের বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই উহা হইতে ফাইব্রিন নামক একটি কঠিন পদার্থ তৈয়ারী হয় এবং রক্ত জমাট বাঁধে। ফাইব্রিন বাহির হইবার পর যে তরল পদার্থ থাকে, তাহার নাম রক্তমণ্ড (serum)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ৫।৬ সের রক্ত থাকে।

120. রক্ত-সঞ্চালন: রক্তপ্রবাহ জীবনের লক্ষণ। রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনী, শাখাধমনী, জালক প্রভৃতির দ্বারা চালিত হইয়া শরীরের সকল অংশে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করিয়া কোষগুলিকে জীবিত রাখে, এবং কোষের দূষিত পদার্থ জালক, শিরা প্রভৃতির দ্বারা বহন করিয়া আবার হৃৎপিণ্ডে পৌছাইয়া দেয়। দূষিত রক্ত ফুসফুসে শোধিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে।

রক্ত-সঞ্চালন তন্ত্রে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি অংশ গ্রহণ করে।

(i) **হৃৎপিণ্ড:** রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার প্রধান যন্ত্র হৃৎপিণ্ড। উহার কার্য একটি পাম্পের ন্যায়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা সর্ব শরীরে রক্তের স্রোত চলে। স্টেথিস্কোপ দ্বারা হৃৎপিণ্ডের লাব্ ডাপ্ শব্দ শোনা যায়। হৃৎপিণ্ড প্রথমে লাব্ পরে ডাপ্ শব্দ করিয়া একটু বিশ্রাম লয় এবং পুনরায় অনুরূপ শব্দ করে। লাব্, ডাপ্ ও বিরামকে একত্রে একটি স্পন্দন বলে। সুস্থ দেহে প্রতি মিনিটে এই সংখ্যা ৭২।

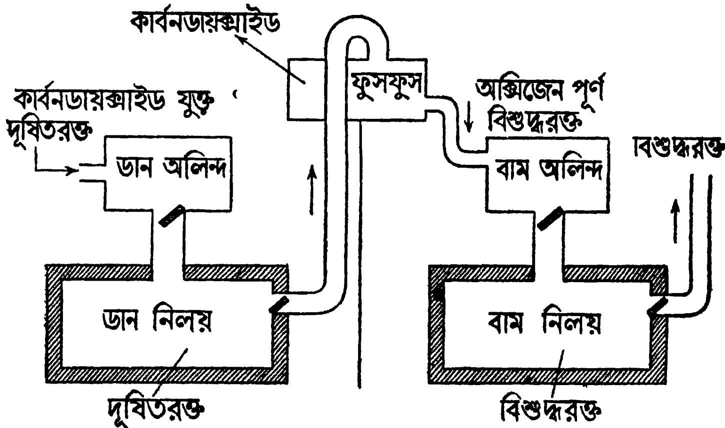


চিত্র 117 : ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড।

হৃৎপিণ্ডের গঠন একটি উল্টান ত্রিভুজের ন্যায়; উহা দুই ফুসফুসের মাঝখানে ঈষৎ বামদিকে হেলিয়া থাকে। আয়তনে উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি ও প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি। পরিণত হৃৎপিণ্ডের ওজন প্রায় 'আট আউন্স। উহার চারিদিকে পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium) নামক শক্ত ও মসৃণ আবরণ আছে। দেহ নিঃসৃত একটি তরল পদার্থ উহাকে অবিরত পিচ্ছিল করিয়া রাখায় হৃৎপিণ্ডের কোন ঘর্ষণজনিত ক্ষয় হয় না। পেরিকার্ডিয়াম উপরের দিকে কয়েকটি শিরা দ্বারা নীচে diaphragm এর সহিত যুক্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডকে একই স্থানে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে।

হৃৎপিণ্ড অনৈচ্ছিক পেশীর দ্বারা গঠিত একটি ফাঁপা থলির মত এবং ভিতরের দিকে মধ্যস্থলে একটি পর্দার দ্বারা দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। এই দুইটি প্রকোষ্ঠের অবিরাম সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারাই হৃৎপিণ্ডের কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মধ্যচ্ছদা দ্বারা বিভক্ত হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠ আবার উপরে-নীচে দুইটি শাখা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠ দুইটিকে **অলিন্দ**

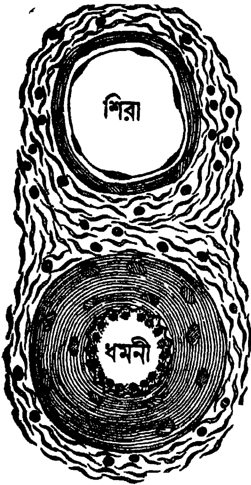


চিত্র 118 : হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের যান্ত্রিক ক্রিয়া।

(auricle) ও নীচের প্রকোষ্ঠ দুইটিকে **নিলয়** (ventricle) বলা হয়। অলিন্দ রক্ত গ্রহণ করে (receiving chamber) এবং নিলয় রক্ত সঞ্চালন করে (distributing chamber)।

রক্ত দক্ষিণ অর্ধ হইতে বাম অর্ধে সোজাসুজি যায় না। তবে দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে আসিবার এবং বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে আসিবার

এক একটি ছিদ্র পথ বা **দ্বার** আছে। এই দ্বারগুলিতে এরূপ **কপাটিকার** (valve) ব্যবস্থা আছে যে, উপর হইতে রক্তের চাপ পড়িলেই কপাটিকাগুলি খুলিয়া যায় কিন্তু নীচ হইতে চাপ পড়িলে কপাটিকা বন্ধ হইয়া যায়।



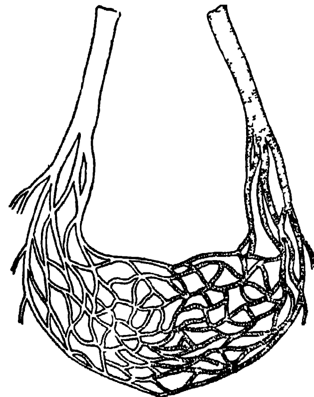
চিত্র 119 . শিরা ও ধমনী।

(ii) **রক্তবহানালী** (Blood Vessels) : হৃদয় হইতে কতকগুলি নালী দিয়া রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয়। উহাদিগকে **রক্তবহা-নালী** বলে। উহারা তিন প্রকার; যথা—

(1) শিরা (Vein) : এই প্রকার নালী দিয়া দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে সাধারণতঃ দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে যায়। শিরার মধ্যে মধ্যে **কপাটিকা** (valve) আছে। সেইজন্য রক্ত একই দিকে প্রবাহিত হয়। শিরা-গাত্র অপেক্ষাকৃত পাতলা ও কম স্থিতিস্থাপক।

(2) ধমনী (Artery) : উহার মধ্য দিয়া হৃদয় হইতে পরিস্কৃত রক্ত দেহের সর্বত্র যায়। উহাদের গাত্র পুরু ও স্থিতিস্থাপক।

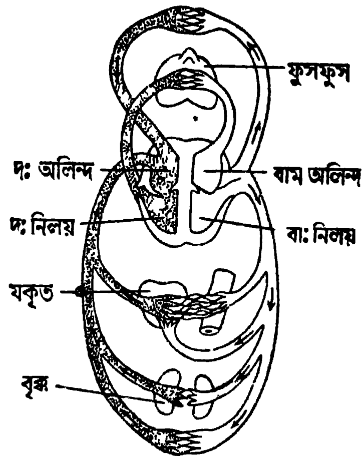
(3) জালক বা কৈশিক নালী (Capillaries) : ধমনী সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র হইতে হইতে অবশেষে অতি ক্ষুদ্র নালীতে পরিণত হয়। এই অতি ক্ষুদ্র নালীগুলিকে **কৈশিক নালী বা জালক** (capillary) বলা হয়। কৈশিক নালী প্রতি তন্তুতে পৌঁছায় এবং উহাদের গাত্র অত্যন্ত পাতলা বলিয়া উহার মধ্য দিয়া রক্ত যাইবার সময় রক্ত হইতে রক্তরস বা লসিকা (lymph) উহার মধ্য দিয়া চুঁয়াইয়া শরীরের কোষ দ্বারা শোষিত হয়। কোষের অব্যবহৃত পদার্থ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আবার জালকের মধ্য দিয়া অপর পথে বাহির হইয়া যায়।


চিত্র 120 : জালক।

এই জালকগুলি সংযুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র শিরা ও বৃহৎ শিরায় পরিণত হয় এবং এইভাবে দূষিত রক্ত প্রধান প্রধান শিরা বাহিত হইয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে।

121. নাড়ী (Pulse) : রক্ত সঞ্চালনের গতিপ্রকৃতি অনুভব করিবার জন্য নাড়ী পরীক্ষা করা হয়। হাতের ধমনী চর্মের নীচে অবস্থিত। চর্মের উপর হাত দিয়া নিম্নস্থ ধমনীর রক্তস্রোতের গতি-প্রকৃতি অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের মাত্রানুযায়ীই ধমনীর রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা সমতালে স্পন্দিত হয়। সেইজন্য ধমনীর রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা হইতেই হৃৎপিণ্ডের কার্যের প্রকৃতি বোঝা যাইতে পারে। কব্জীর নীচে ধমনীর যে স্পন্দন মাত্রা—তাহাই নাড়ীর স্পন্দন। সুস্থ নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে পূর্ণবয়সে ৭২—৮০, কৈশোরে ৮০—৯০, অতি শৈশবে ১৩০। অনিয়মিত ও কমবেশী নাড়ীর স্পন্দন অসুস্থতা বা উত্তেজনার লক্ষণ।

(1) ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী : সমগ্র দেহের দূষিত রক্ত ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে আসে। দক্ষিণ অলিন্দ হইতে নিলয়ের মধ্যে একটি ত্রিপত্র কপাটিকা আছে। দূষিত রক্ত অলিন্দ হইতে ঐ কপাটিকা দিয়া দক্ষিণ নিলয়ে পৌঁছায়। দক্ষিণ নিলয়ের মধ্য হইতে একটি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা দিয়া ধমনীপথে ফুস্ফুস হইয়া ঐ রক্ত আবার নিলয় হইতে চলিয়া যায়। (অর্ধচন্দ্র কপাটিকা থাকার ফলে ফুসফুসীয় ধমনী হইতে দক্ষিণ নিলয়ে বিপরীত পথে রক্ত যাইতে পারে না।) ফুসফুসীয় ধমনী কিছুদূরে যাইয়া দুইটিভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি শাখাপথে ফুসফুসে যায়। ফুসফুসে দূষিত রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিয়া শোধিত হয়। এই শোধিত রক্ত ফুসফুস হইতে জালক ও অন্যান্য পথে বাহির হইয়া আসে ও চারিটি ফুসফুসীয় শিরায় মিলিত হইয়া বাম অলিন্দে উপস্থিত হয়। বাম অলিন্দ হইতে নিলয়ের মধ্যে একটি দ্বিপত্র



চিত্র 121 : রক্তসঞ্চালন প্রণালী।

কপাটিকা আছে। ঐ দ্বিপত্র কপাটিকা তখন খুলিয়া যায় এবং বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে আসে। বাম অলিন্দ হইতে মহাধমনী নামে একটি প্রধান পথে এই বিশুদ্ধ রক্ত চলিয়া যায়। মহাধমনী ও বাম নিলয়েরই মধ্যে একটি অর্ধচন্দ্র কপাটিকা থাকার ফলে মহাধমনীর রক্ত বাম নিলয়ে বিপরীত ভাবে যাইতে পারে না। মহাধমনী হইতে বিশুদ্ধ রক্ত নানা শাখাপথে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। পরে উহা দূষিত হইয়া শিরাপথে মিলিত হইয়া ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা পথে আবার হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে আসে। উহাই ক্ষুদ্রতর রক্তসঞ্চালন প্রণালী।

(2) **বৃহত্তর রক্তসঞ্চালন প্রণালী :** মহাধমনী পথে যে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহা বিভিন্ন শাখাপথে শরীরের সকল অংশে প্রবাহিত হয় এবং জালকপথে লসিকারূপে শোষিত হয়; পরে দূষিত পদার্থ জালক নালীর মধ্য দিয়া শিরাপথে পুনর্বার শোধনের জন্য হৃৎপিণ্ডে আসে। উহারই নাম বৃহত্তর রক্ত সঞ্চালন প্রণালী। বৃহত্তর রক্ত সঞ্চালন প্রণালীর মধ্যে **যকৃতের** রক্ত সঞ্চালন প্রণালী ও **বৃক্কের** রক্ত সঞ্চালন প্রণালী—এই দুইটি শাখাপ্রণালী প্রধান। এই দুইটি সঞ্চালন ক্রিয়ার মধ্য দিয়াও যকৃতে, পিত্তরূপে ও বৃক্কে মূত্ররূপে দূষিত রক্তের আংশিক আবর্জনা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে শোধন কার্য ঘটিয়া থাকে।


চিত্র 122 : ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে।

দেহের রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্যন্ত ডাক্তারদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন যে রক্ত কেবল শিরার মধ্য দিয়া একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং শিরার মধ্য দিয়া আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। 1628 খৃস্টাব্দে ডাঃ উইলিয়াম হার্ভে প্রথম প্রচার করেন যে শিরা ও ধমনী উভয়েই রক্তবহানালী। হৃৎপিণ্ড ও শিরার মধ্যে কপাট থাকায় রক্ত সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয়।

শিরা ও মহাশিরা
122. রক্ত প্রবাহের ধারা: দূষিত রক্ত ————→ দক্ষিণ

ত্রিপত্র কপাটিকা ফুসফুসীয় ধমনী অক্সিজেন গ্রহণ
অলিন্দ ————→ দক্ষিণ নিলয় ————→ ফুসফুস ————

ও কারবন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ ফুসফুসীয় শিরা
————→ বিশুদ্ধ রক্ত ————→ বাম অলিন্দ

দ্বিপত্র কপাটিকা অর্ধচন্দ্র কপাটিকা জালক
————→ বাম নিলয় ————→ মহাধমনী ————→ দেহের
সর্বত্র জীবন্ত কোষ।

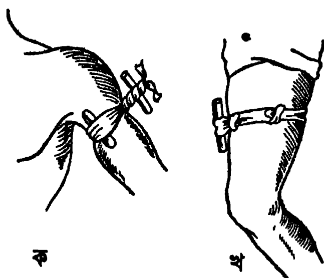
123. রক্তক্ষয় নিবারণ: প্রাথমিক চিকিৎসা: দেহের কোন স্থান ছিঁড়িয়া কাটিয়া যাইলে বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষত হইলে ক্ষত স্থান হইতে রক্তপাত হয়। সামান্য ক্ষত স্থানে টোটকা ঔষধ যথা গাঁদা পাতার, দূর্বার বা কচুর ডাঁটার রস দিলে কিংবা পরিষ্কার তুলা দিয়া টিনচার বেনজয়েন



চিত্র 123 : বিভিন্ন রকমের ব্যাণ্ডেজ।

লাগাইলে রক্তপাত বন্ধ হয়। বায়ুতে ভাসমান রোগজীবাণু ক্ষতের সংস্পর্শে যাহাতে না আসে সেইজন্য ক্ষতস্থানে কোহল বা ডেটল প্রভৃতি জীবাণু প্রতিষেধক ঔষধ লাগাইতে হয়। ক্ষত গভীর হইলে ক্ষত স্থান পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বা কাটা চামড়া মুখে লাগাইয়া সেলাই করিলে রক্তপাত

বন্ধ হয়। ফিনকি দিয়া উজ্জ্বল লাল রক্ত বাহির হইলে ক্ষতস্থানের ঠিক উপরের দেহের অংশকে চাপিয়া ধরিয়া এবং কাল্‌চে রংয়ের রক্ত বাহির হইলে ক্ষত স্থানের ঠিক নীচের দেহের অংশকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়। এই দুই স্থানে তাগার মত রবার নল বা কাপড়ের ফালি প্রথমে আলাদা করিয়া বাঁধিয়া উহার ভিতর কাঠি ঢুকাইয়া কাঠিটি ঘুরাইয়া তাগার বাঁধন শক্ত করিতে হয়। এই বাঁধন বেশীক্ষণ রাখা উচিৎ নয়। বাঁধন হঠাৎ খুলিবে না, ধীরে ধীরে খুলিবে। তাগার বাঁধনকে টুর্নিকেট (tourniquet) বলে। রক্ত বন্ধ হইলেও ক্ষত স্থান খুলিয়া রাখা উচিত নয়। জীবাণু নাশক গজ (gauge) বা পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়া ব্যাণ্ডেজ করা উচিত।



চিত্র 124 : টুর্নিকেট।

অনুশীলনী

1. মানব রক্তের উপাদানগুলির নাম বল। উহাদের কি কি কার্য? উহাদিগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

2. হৃৎপিণ্ডের বর্ণনা দাও। রক্ত সংবহন তন্ত্রের একটি ছবি আঁক।

3. শিরা, ধমনী ও জালকের কার্য বর্ণনা কর।

4. রক্ত প্রবাহের ধারা তালিকা দ্বারা বুঝাও।

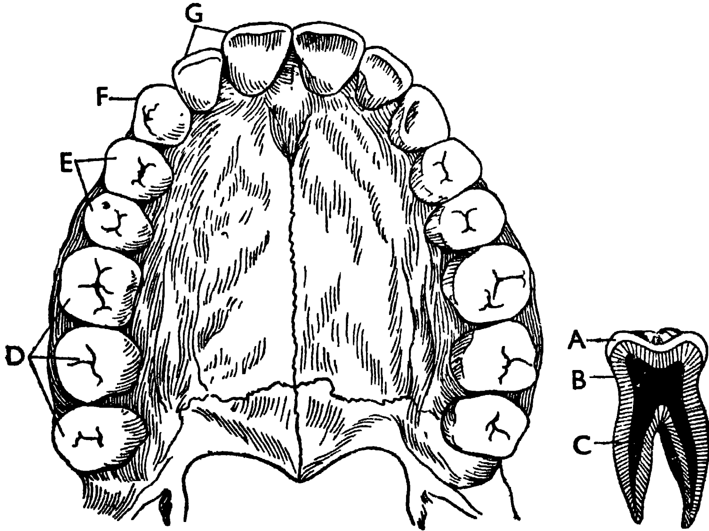
দ্বিতীয় পাঠ

পচন-তন্ত্র (Digestive System)

124. পৌষ্টিক নালী: দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ায় অনবরত শক্তি ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় পূরণের জন্য আমাদের আহার গ্রহণ করা প্রয়োজন। মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় বিশ হাত দীর্ঘ নালীতে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হয়। উহাকে **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal) বলে। এই নালীর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম যথা, (i) **মুখ গহ্বর** (buccal cavity)—দন্ত, জিহ্বা, লালা

গ্রন্থি সমেত, (ii) **ফ্যারিংস** (pharynx) ও **গ্রাসনালী** (œsophagus), (iii) **পাকস্থলী** (stomach), (iv) **ক্ষুদ্রান্ত্র** (small intestine), (v) **বৃহদন্ত্র** (large intestine) ও (vi) **মলনালী** (rectum)। উহারা ছাড়া **যকৃৎ** (liver) ও **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে।

(i) **মুখগহ্বর**ঃ খাদ্য মুখে প্রবেশ করিলেই পূর্ণবয়স্ক লোক বত্রিশটি দাঁতের সাহায্যে খাদ্যকে ছেদন, চর্বণ ও পেষণ করিয়া পিণ্ডে পরিণত করে। প্রত্যেক দাঁতের মাঢ়ির উপরের অংশকে **মুকুট** (crown, A), মাঢ়ির মধ্যের অংশকে **দেহ** (body, B), চোয়ালের মধ্যের অংশকে **শিকড়** (root, C) বলে। দাঁতের ভিতরটা ফাঁপা ও মজ্জায় পূর্ণ। ভিতরে নার্ভ ও রক্তবহানালী থাকে। পূর্ণবয়স্ক লোকের দুই পাটিতে ষোলটি করিয়া বত্রিশটি দাঁত থাকে। প্রত্যেক পাটিতে সম্মুখে চারিটি চ্যাপ্টা **কৃন্তক**



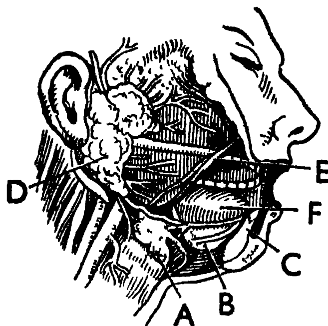
চিত্র 125 : দাঁতের পাটি ও দাঁত।

(G) দাঁত, কৃন্তকের পার্শ্বে একটি করিয়া **ছেদক** (F) দাঁত, ছেদকের পার্শ্বে দুইটি করিয়া **চর্বক** (E) দাঁত, চর্বকের পার্শ্বে তিনটি করিয়া **পেষক** (D) দাঁত থাকে।

জিহ্বা স্বাদ-কোরকের (taste bud) দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করে এবং খাদ্যকে মুখের মধ্যে সর্বত্র নাড়াচাড়া করে। মুখ-গহ্বরে তিন জোড়া **লালাগ্রন্থি**

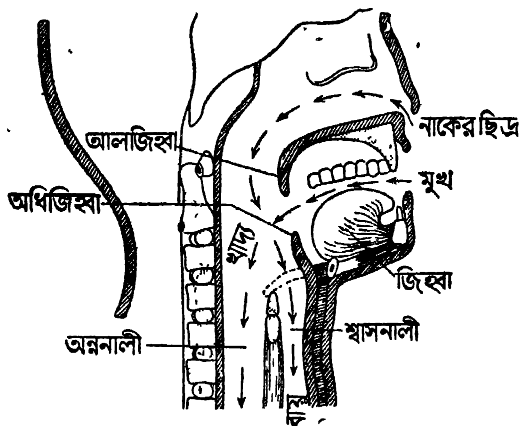
(salivary gland) থাকে যথা, **প্যারোটিড** D,E (parotid) কর্ণদ্বয়ের সামনে, **সাব ম্যাক্সিলারী** A,B (submaxillary) নীচের চোয়ালের নীচে, **সাব-লিঙ্গুয়াল** E F (sublingual) জিহ্বার নীচে অবস্থিত।

গ্রন্থিগুলি হইতে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইয়া মুখ গহ্বর আর্দ্র রাখে। লালা খাদ্যদ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে। উহাতে খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করা সুবিধা হয়। লালার **টাইলিন** (ptyalin) নামক জারক রস (enzyme) শ্বেতসার খাদ্যকে মল্টোজ (maltose) চিনিতে পরিণত করে। খাদ্য ভালরূপ চর্বণ না করিলে অজীর্ণ ও অম্লরোগ হয়।



চিত্র 126 : লালাগ্রন্থি।

(ii) **ফ্যারিংস** : খাইবার সময় মুখ-গহ্বরের পশ্চাতে অবস্থিত **আলজিহ্বা** (uvula) দ্বারা নাসারন্ধ্র এবং **অধিজিহ্বা** (epiglottis) দ্বারা শ্বাসনালী বন্ধ হইয়া যায় যাহাতে খাদ্যকণা এই দুই পথে প্রবেশ না করিয়া নয় ইঞ্চি গ্রাসনালী দিয়া পাকস্থলীতে চলিয়া যায়।

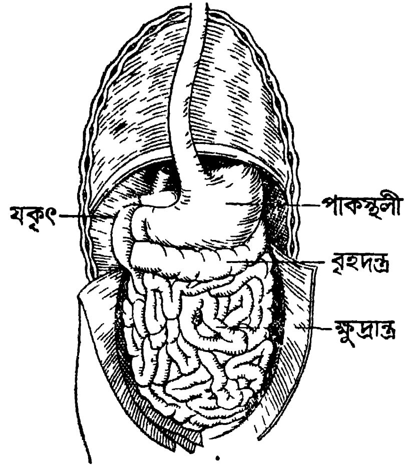


চিত্র 127 : ফ্যারিংস।

(iii) **পাকস্থলী** : উদরের উপর দিকে দশ ইঞ্চি দীর্ঘ ও পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ পাকস্থলী অবস্থিত। সাধারণ অবস্থায় উহা সংকুচিত থাকে। খাদ্য প্রবেশ

করিলে উহা ফুলিয়া উঠে। উহার প্রথম প্রান্তকে **আগম দ্বার** (cardiac end) ও শেষ প্রান্তকে **নির্গম দ্বার** (pyloric end) বলে।

পাকস্থলীর প্রাচীরে তিনটি স্তর থাকে। বাহিরের দুইটি স্তর অনৈচ্ছিক পেশী দ্বারা গঠিত, ভিতরের স্তর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (mucous membrane) দ্বারা গঠিত। এই ঝিল্লীর গায়ে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। প্রতি ছিদ্র একটি রসস্রাবী গ্রন্থির মুখ। পাকস্থলীতে খাদ্য প্রবেশ করিলেই গ্রন্থিগুলি হইতে **আমাশয় রস** (gastric juice) বাহির হয়। এই রসে **হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড,** দুইটি জারক পদার্থ **পেপসিন** (pepsin) ও **রেনিন** (renin) থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাদ্যের কতক জীবাণু নাশ করে এবং শ্বেতসারকে (starch যথা চাউল, আটা) শর্করায় (sugar) পরিণত করে।



চিত্র 128 : পরিপাক যন্ত্র

পেপসিন প্রোটিনকে সহজপাচ্য পেপ্‌টোনে পরিণত করে, রেনিন দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে। পাকস্থলী উহার পেশীর প্রসারণ ও সংকোচনের সাহায্যে খাদ্যকে মথিত ও আন্দোলিত করিয়া অর্ধতরল ও অর্ধপক্ক মণ্ডের (chyme) আকারে আনিলে নির্গম-দ্বারের পেশী মাঝে মাঝে খুলিয়া যায় এবং মণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে চলিয়া যায়।

(iv) **ক্ষুদ্রান্ত্র :** ক্ষুদ্রান্ত্র বিশ ফুট দীর্ঘ একটি নল। উহার তিনটি অংশ : **ডুয়োডেনাম** (duodenum), **জেজুনাম** (jéjunum) ও **ইলিয়াম** (illium)। উহার প্রাচীরও তিনটি স্তরে গঠিত—বাহিরের দুইটি পেশীর স্তর এবং ভিতরেরটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর স্তর। ভিতরের স্তরে শুঁয়ার মত **শোষক-যন্ত্র** (villus) থাকে। শোষক-যন্ত্রে রক্তবহা নালী থাকে। স্নেহজাতীয় পদার্থ ল্যাকটিল (lacteal) নামক নালীর দ্বারা শোষিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন প্রকার রসের দ্বারা খাদ্য পরিপাক হয় :

(1) অগ্ন্যাশয় হইতে ক্ষুদ্রনল দিয়া **ক্লোমরস** (pancreatic juice) নামক

ক্ষারীয় (alkaline) রস বাহির হয়। উহাতে তিন প্রকার জারক পদার্থ থাকে : **এমাইলেজ** (amylase) জারক কার্বোহাইড্রেটকে ও **লাইপেজ** (lipase) জারক স্নেহপদার্থকে (fat) সহজে হজম করে। **ট্রিপসিন** (tripsin) প্রোটিনকে সহজপাচ্য অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত করে। অ্যামিনো-অ্যাসিড দেহের কোষ সংস্কার ও নূতন কোষ সৃষ্টি করে। অগ্ন্যাশয়ে **ইনসুলিন** (insulin) নামক এক প্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। উহা শর্করাকে দগ্ধ করিয়া দেহে তাপ উৎপন্ন করে। উহার অভাবে দেহের নানা স্থানে শর্করা জমিলে বহুমূত্র (diabetes) রোগ সৃষ্টি হয়।

(2) **পিত্তরস** (bile) : যকৃৎ হইতে তিক্ত পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া অন্ত্রে পড়ে। উহা স্নেহজাতীয় পদার্থকে জীর্ণ করে, জীর্ণ অংশকে শোষিত হইতে সাহায্য করে এবং জীবাণু ধ্বংস করে। যকৃতে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে জমা থাকে। গ্লাইকোজেন যকৃৎ দ্বারা গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত প্রয়োজন মত দেহের যথাস্থানে যায়। এই শর্করার রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়।

(3) **আন্ত্রিক রস** (succus entericus) : অন্ত্র হইতে নির্গত আন্ত্রিক রসে চার প্রকার জারক পদার্থ থাকে যথা (i) **মল্টেজ** (maltase) জারক আখ শর্করাকে (cane sugar) গ্লুকোজে পরিণত করে। (ii) **ল্যাক্টেজ** (lactase) জারক দুগ্ধ শর্করাকে (milk sugar) গ্লুকোজে ও গ্যালাকটোজে পরিণত করে, (iii) **ইরেপসিন** (erepsin) জারক পেপ্টোনকে অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত করে। এবং (iv) **ইন্ভার্টেজ** (invertase) জারক জটিল শর্করাকে সরল শর্করা যথা **ফ্রাক্টোজ** (fructose) ও **গ্লুকোজে** (glucose) পরিণত করে।

বিভিন্ন জারক দ্রব্য খাদ্যের জটিল উপাদানকে এমন সরল উপাদানে পরিণত করে যাহাতে সরল উপাদান রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। জারকগুলি পাচন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ হইতে নিঃসৃত হয়। জারকগুলি অনুঘটকের কাজ করে অর্থাৎ উহারা রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটায় কিন্তু উহারা নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে।

(v) **বৃহদন্ত্র :** উহা প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ ও মোটা নল। উহা প্রথমে উর্ধ্বমুখী হইয়া, মধ্যে অনুভূমিকভাবে ও শেষে নিম্নমুখী হইয়া মলদ্বারে শেষ হইয়াছে। উহার চারিটি অংশ আছে, যথা সিকম্ (secum), কোলন (colon), মলভাণ্ড (rectum) ও পায়ু (anus)।

বৃহদন্ত্রের মুখে **অ্যাপেনডিক্স** (appendix) নামক থলি আছে। উহা কোনও কারণে ফুলিয়া উঠিলে **অ্যাপেন্ডিসাইটিস** রোগের সৃষ্টি হয়।

বৃহদন্ত্রে খাদ্যের কিছু জীর্ণ জলীয় অংশে লবণ শোষিত হয়। অবশিষ্ট কঠিন অংশ মলরূপে মলভাণ্ডে জমা হয়। পায়ু দিয়া কঠিন মলত্যাগ হয়; কোলনের পেশীর অবিরত প্রসারণ ও সংকোচনের (peristalsis) ফলে মল নির্গত হয়।

অনুশীলনী

1. পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর। 2. পাকস্থলীতে কি কি রস নির্গত হয়? 3. ক্ষুদ্রান্ত্রে কি কি রস নির্গত হয়? 4. মানুষের দাঁতের বর্ণনা কর। 5. নিম্নলিখিতগুলি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর:—(i) আন্ত্রিক রস, (ii) পিত্তথলি, (iii) আমাশয় রস, (iv) ইন্‌সুলিন, (v) ক্লোমরস, (vi) টাইলিন ও (vii) আমাইলেজ।

তৃতীয় পাঠ

খাদ্য (Food)

125. খাদ্য শক্তির উৎস: (**Source of energy**): নিম্নলিখিত কারণে আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়:—

(ক) আমাদের সব সময়েই পেশী সঞ্চালন করিয়া কার্য করিতে হয়। এই কার্যের জন্য শক্তি দরকার। নানা রকম খাদ্য সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের কার্য করিবার শক্তি সরবরাহ করে।

(খ) দেহ সর্বদাই নিশ্বাসের সঙ্গে ও মলমূত্রের সঙ্গে, স্বেদ-নির্গমনের সঙ্গে এবং ত্বক হইতে বিকিরণের দ্বারা তাপ নির্গত করে। এই তাপের ক্ষতিপূরণের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন।

(গ) দেহ যন্ত্রাদির কোষ প্রতিনিয়ত কার্য করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। এই জীবকোষগুলির ক্ষয়পূরণের জন্য ও নূতন জীবকোষ সৃষ্টির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন।

(ঘ) খাদ্য দেহে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

126. খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান: খাদ্যদ্রব্যকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(ক) **শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাদ্য** (Carbohydrate): কার্বোহাইড্রেট কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত যৌগিক পদার্থ। চাউল, মুড়ি, ময়দা, যব, আটা প্রভৃতি শ্বেতসারবহুল খাদ্য এবং চিনি, গুড়, মধু

শর্করাবহুল খাদ্য। শ্বেতসার ও অন্য শর্করা সব পরিশেষে গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যকৃতে চলিয়া যায়। তথা হইতে দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শর্করা অক্সিজেনের সহিত ক্রিয়া করিয়া তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন করে।

(খ) **প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় খাদ্য** (Protein)**:** প্রোটিন প্রধানতঃ কারবন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ। দুধ, ছানা, মাছ, মাংস, ডিম, মুগ, মসুর, ছোলা প্রভৃতি প্রোটিনপ্রধান খাদ্য। এইরূপ খাদ্য প্রধানতঃ দেহের ক্ষয়পূরণ, গঠন ও পুষ্টির সাহায্য করে। উহা ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইয়া দেহে শক্তি উৎপাদন করে।

(গ) **স্নেহজাতীয় খাদ্য বা চর্বি** (Fat)**:** চর্বি কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। ঘি, মাখন, তৈল প্রভৃতি চর্বি জাতীয় খাদ্য। আবার দেহে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট হইতে চর্বি উৎপন্ন হয়। উহার প্রধান কাজ দেহে প্রচুর তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন করা। উহা আবার কতকগুলি যন্ত্রকে আবৃত করিয়া সংরক্ষণ করে। উপবাসের সময় বা রোগের সময় চর্বি ইন্ধনের কাজ করে। চর্বি জাতীয় খাদ্য অধিক ভক্ষণ করিলে দেহ মোটা হয়।

(ঘ) **জল:** জল খাদ্যের একটি বিশেষ উপাদান। উহা দেহ ধারণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। রক্তের সহিত মিশিয়া উহা রক্তকে তরল রাখে, সেইজন্য দেহে রক্ত চলাচল সম্ভব হয়। জল খাদ্যদ্রব্যকে তরল রাখে এবং খাদ্যরস কোষে কোষে পৌঁছাইয়া দেয়। জলের সাহায্যে দেহের দূষিত পদার্থ, বাষ্প, মলমূত্র ও ঘামের সহিত বাহির হয়।

(চ) **লবণ** (Salts)**:** দেহের ক্ষয়পূরণ, দাঁত, অস্থি ইত্যাদির পুষ্টির জন্য খনিজ লবণের প্রয়োজন। সোডিয়াম ক্লোরাইড রক্তের একটি প্রধান উপাদান। সোডিয়াম ক্লোরাইড (সাধারণ লবণ) ব্যতীত আর সব লবণ আমরা ফল, লেবু, শাকসব্জী, তরকারি, ডিম, আলু, দুধ প্রভৃতি খাদ্যের সহিত গ্রহণ করি।

অস্থির ও দাঁতের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম ফসফেট। রক্তেও ক্যালসিয়াম লবণ থাকে। অস্থিতে, মস্তিষ্কে, স্নায়ুতে, মজ্জায়, প্রোটিনে ফস্‌ফরাস থাকে। দেহের পক্ষে সামান্য আয়োডিন দরকার। উহার অভাব হইলে গলগণ্ড (Goitre) রোগ হয়। কড্‌লিভার তৈল, রসুন, পেঁয়াজ হইতে আয়োডিন পাওয়া যায়। রক্তে লৌহ থাকে। লৌহ ফুসফুসের বায়ু হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয়।

(ছ) **ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ** (Vitamin) : উপরোক্ত পাঁচপ্রকার খাদ্য ছাড়া **ভিটামিন** নামক এক প্রকার খাদ্য আমাদের দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। উহার অভাবে অন্য খাদ্য বিশেষ কাজে লাগে না। সেইজন্য উহাকে **খাদ্যপ্রাণ** বলে। উহার অভাবে শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং নানা প্রকার ব্যাধি যথা বেরিবেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগ হয়। ষোল প্রকার ভাইটামিন আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান :—

(i) **ভিটামিন A** : উহা চর্বিতে দ্রাব্য। উহাকে ঘি, দুধ, দই, মাখন, মাছ, টাটকা শাকসব্জী, পালং শাক, বাধাকপি, টমাটো প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। উহা দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে। উহার অভাবে চক্ষুরোগ হয় এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(ii) **ভিটামিন B** : উহা কয়েকটি ভিটামিনের সমবায়ে গঠিত। সেইজন্য উহাকে ভিটামিন 'বি-কমপ্লেক্স' (B-complex) বলে। উহা জলে দ্রাব্য। উহাকে ঢেঁকি ছাঁটা লাল চাউল, ডাল, ডিম, অঙ্কুরিত ছোলা, মাছ মাংস, দুধ, মাখন, পালং শাক প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। উহা স্নায়ুকে সতেজ ও পুষ্ট রাখে, দেহকে বৃদ্ধি করে। উহার অভাবে বেরিবেরি, চর্মরোগ, ক্ষুধা-মান্দ্য রোগ দেখা দেয়। উহাকে গরম করিলে নষ্ট হয়।

(iii) **ভিটামিন C** : উহা জলে দ্রাব্য। উহাকে লেবু, মিষ্ট ফল, টম্যাটো অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। উহা অস্থিকে দৃঢ় করে, রক্তকে সুস্থ রাখে। উহা তাপে নষ্ট হয়। উহার অভাবে স্কার্ভি ও দাঁতের রোগ হয়।

(iv) **ভিটামিন D** : উহা তেল বা চর্বিতে দ্রাব্য। উহা ঘি, দুধ, মাখন, মাছের যকৃৎ ও তেল, মাংস, কডলিভার তেল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। উহা অস্থি-গঠনে সাহায্য করে। শিশুকে তৈল মাখাইয়া মৃদু রৌদ্রে রাখিলে সূর্যকিরণ শিশুদেহে ভিটামিন D উৎপন্ন করে। উহার অভাবে শিশুদিগের রিকেট (rickets) রোগের উৎপত্তি হয়।

(v) **ভিটামিন E** : উহা তেল ও চর্বিতে দ্রাব্য। কলা, মাখন, যাঁতায় ভাঙ্গা আঁটা, অঙ্কুরিত ছোলা, লেটুস শাক প্রভৃতিতে উহা পাওয়া যায়। উহার অভাবে জননশক্তি হ্রাস পায়।

(vi) **ভিটামিন K** : উহা তেল ও চর্বিতে দ্রাব্য এবং মাখন, মাংস, শাকসব্জি ও টমাটোতে পাওয়া যায়।

(জ) **খাদ্যের অসার অংশ** (Roughage) : তরকারী শাকসব্জি,

ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যে যে আঁশযুক্ত সেলুলোজ (cellulose) থাকে তাহা আমরা পরিপাক করিতে পারি না। এই অসার ও অপ্রয়োজনীয় অংশকে **র‍্যাফেজ** বলে। উহা দেহের পুষ্টিসাধন না করিলেও পাকস্থলীর আন্দোলনে উদ্দীপনা যোগাইয়া খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া অন্ত্রের সঙ্কোচন ও প্রসারণে সাহায্য করে। খাদ্যে পরিমিত অসার অংশের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

127. খাবার অভ্যাস (Food Habit): তাপশক্তি উৎপাদনের উপর খাদ্যের উৎকর্ষতা নির্ভর করে। এই হিসাবে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য শ্রেষ্ঠ। অনেকে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য যথা ভাত, মুড়ি, ডাল ইত্যাদি অধিক খায়। অনেকে ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয় এবং কল ছাটা চাউল ব্যবহার করে; উহাতে চাউলের সারাংশ অপচয় হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য নির্বাচনে সতর্ক হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত খাদ্য অভ্যাস থাকিলে ভাল হয়:—

(i) খাদ্যদ্রব্য টাট্‌কা ও সহজ পাচ্য হওয়া প্রয়োজনীয়, নচেৎ পরিপাক যন্ত্রকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

(ii) আহারের সময় ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। খাদ্যের পরিমাণ শরীরের প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যের পরিমাণ অধিকও হইবে না, অল্পও হইবে না।

(iii) কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য যথা মুলা, শসা, পেঁয়াজ, অঙ্কুরিত ছোলা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া ভাল।

(iv) খাদ্য-প্রস্তুত বিষয়ে সতর্ক হওয়া ভাল। সাদা ধবধবে চাউল, অধিক মশলা ও তৈলযুক্ত রান্না মাছ, তরকারি মুখরোচক হইলেও স্বাস্থ্য হানিকর। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। চাউল অপেক্ষা গম অধিক পুষ্টিকর। সকলের কিছু কিছু গমজাত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

128. প্রয়োজনীয় খাদ্য (Food needs): খাদ্যের মূল্য নির্ভর করে উৎপন্ন তাপ শক্তির উপর। এক গ্রাম চাউল হইতে 7 ক্যালরি, এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিন হইতে 4·1 ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়। এক গ্রাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে যে তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে **ক্যালরি** বলে।

প্রত্যেক সুস্থ লোকের প্রত্যহ 2700—2800 ক্যালরি তাপ-উৎপাদক

খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই শক্তি উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত উপাদান থাকা প্রয়োজন। এইরূপ খাদ্যকে **প্রমাণ খাদ্য** (Standard Diet) বলে।

প্রোটিন	65 গ্রাম	লৌহ	20 মিলিগ্রাম
চর্বি	60 গ্রাম	ভিটামিন	3000 আন্তর্জাতিক একক
কার্বোহাইড্রেট	350 গ্রাম		
ক্যালসিয়াম	68 গ্রাম	ভিটামিন B	3000 আঃ একক
ফসফরাস	1 গ্রাম	ভিটামিন C	30-50 মিঃ গ্রাম

129. সুষম খাদ্য (Balanced diet) : খাদ্যের উপযুক্ততা স্থানীয় জলবায়ু, ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য ও বৃত্তির উপর নির্ভর করে। গ্রীষ্মপ্রধান বাংলা দেশের অধিবাসীদের খাদ্য ও শীতপ্রধান পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের খাদ্য একপ্রকার নহে। কোন ব্যক্তির দেহের পুষ্টির ও শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যকে **সুষম খাদ্য** বলে।

পূর্ণ বয়স্ক একজন লোকের দৈনিক সুষম খাদ্যে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে।

নাম	পরিমাণ	নাম	পরিমাণ
চাল	এক পোয়া	তরকারি	পাঁচ ছটাক
আটা	তিন ছটাক	তেল ও ঘি	দেড় ছটাক
ডাল	দেড় ছটাক	দুধ	আধ সের
মাছ মাংস	তিন ছটাক	চিনি, গুড়, লবণ	আধ ছটাক

এই খাদ্যের তাপ-মূল্য প্রায় 2700 ক্যালরি।

কিলোগ্রাম = 1000 গ্রাম = প্রায় এক সের ছয় তোলা।

130. খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (Food misconception) : খাদ্য সম্পর্কে আমাদের কতকগুলি ভুল ধারণা আছে। আমিষভোজী মাছ মাংস ব্যতীত অন্য খাদ্য পছন্দ করেন না। আবার নিরামিষাশী জীবনে মাছ মাংস স্পর্শ করেন না। অনেকের ধারণা ডিম অপেক্ষা ডাল সহজপাচ্য, শাকসব্জি মল বৃদ্ধি করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ডিম সহজপাচ্য। শাকসব্জিতে ভিটামিন আছে। অনেক বাপ-মা মনে করেন ছেলেরা সব সময়েই পেট ভর্তি খাবে, কিন্তু উহাতে পরিপাকের অসুবিধা হয়। সামাজিক ভোজের সময় অনেকেই অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া অসুস্থ হন। ক্ষুধা না পাইলে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। আবার ক্ষুধা পাইলেই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নচেৎ আমাশয়ে 'পিত্ত পড়িয়া' শরীর অসুস্থ হয়।

অনুশীলনী

1. খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কি ? 2. সুষম খাদ্য কাহাকে বলে ? 3. ভাল খাদ্য অভ্যাস বর্ণনা কর। 4. খাদ্যের প্রধান উপাদানগুলির নাম ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর। 5. খাদ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাগুলি কি কি ?

ষষ্ঠ অধ্যায় সম্বন্ধে Objective Type প্রশ্নাবলী

1. Recall Type :

(i) রক্তের লাল অংশের নাম— (ii) মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত নলের নাম— (iii) দাঁতের উপরের অংশের নাম—

2. Completion Type : শূন্যস্থান পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর :—

পাকস্থলীতে — — জীবাণু নাশ করে এবং — কে — পরিণত করে। পেপ্‌সিন — সহজপাচ্য — পরিণত করে।

3. Alternate Response Type :

(ক) **True or False Type :** সত্য উক্তির পার্শ্বে × চিহ্ন দাও :—

(i) শ্বাসনালী দিয়া খাদ্য দেহে যায়। (ii) মল্টেজ পেপটোনকে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত করে। (iii) ছানা, দুধ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। (iv) খাদ্য হইতে আমরা শক্তি পাই।

(খ) **Yes or No Type :** হ্যাঁ কি না উত্তর দাও :—

(i) ফুসফুস কি খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে ? (ii) শাক কি মল বৃদ্ধি করে ?

4. Association Type : অর্থসঙ্গতি বজায় রাখিয়া শূন্যস্থান পূরণ কর :

এঞ্জিন : কয়লা :: মানবদেহ : —

5. Matching Test : No. II পংক্তি হইতে শব্দ বাছিয়া No. I পংক্তির শূন্যস্থান পূরণ কর :—

I	II
1. যকৃত হইতে—	বিষম লাগে।
2. যকৃতের নীচে—	লালা নিঃসৃত হয়।
3. খাদ্যদ্রব্য শ্বাসনালীতে ঢুকিলে—	মূত্রাশয় থাকে।
4. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি হইতে—	পিত্তরস নিঃসৃত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

(দশম শ্রেণীর জন্য)

প্রথম অধ্যায়

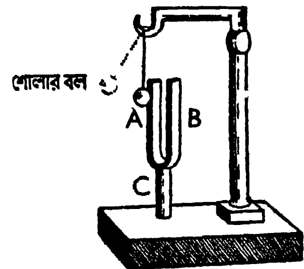
শব্দ-বিদ্যা (Sound)

প্রথম পাঠ

শব্দের উৎপত্তি (Production of Sound), শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যম (Material medium for transmission of Sound), প্রতিফলন, প্রতিধ্বনি (Reflection, Echoes), কর্ণ (Ear)

1. শব্দ এক প্রকার শক্তি (Energy) : যে শক্তি আমাদের শ্রবণানুভূতিকে জাগ্রত করে তাহাকে **শব্দ** বলে। নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে দেখা যায় যে শব্দ এক প্রকার শক্তি। জানালার নিকটে বজ্রপাত হইলে বজ্রপাতের শব্দে জানালার কাঁচ ঝন্‌ঝন্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে। খালি টিনের পাত্রের উপর হাত রাখিয়া নিকটে জোরে শব্দ কবিলে পাত্র কাঁপিয়া উঠে। অতএব দেখা যায় শব্দ কোন পদার্থে কম্পন সৃষ্টি করে অর্থাৎ শব্দ কার্য করে। সুতরাং শব্দ একটি শক্তি।

2. কম্পমান বস্তু হইতে শব্দ-সৃষ্টি (Production of sound by a vibrating body) : আমরা দেখিলাম এক স্থানের শব্দে অন্য বস্তুতে কম্পন সৃষ্টি হয়। আবার দেখা যায় কোন বস্তুর দ্রুত কম্পন (vibration) হইতে সকল রকম শব্দের উৎপত্তি হয়। কাঁসার বাটিতে আঘাত করিলে কাঁসার বাটি কাঁপিতে থাকে, শব্দ বাহির হয়। বাটির কিনারা বেশ কাঁপিতে দেখা যায়। কাঁসার বাটিতে হাত দিলে কম্পন বন্ধ হয়, শব্দও থামিয়া যায়। স্কুলে কাঁসার ঘণ্টায় হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিলে উহা বাজিয়া উঠে। বেহালা প্রভৃতি তারযন্ত্রে তারকে কাঁপাইলে তারের কম্পন হইতে মধুর শব্দ বাহির হয়। পাখীর মিষ্ট ডাক, বৃষ্টিপাতের আওয়াজ, বাঁশির মিহি সুর, হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা সুর সবই কোন-না-কোন বস্তুর কম্পন হইতে উৎপত্তি হয়।

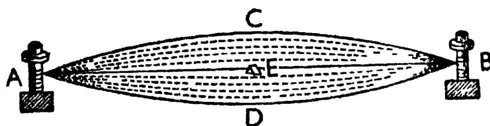


চিত্র 1 : সুর শলাকা।

(i) সুর শলাকার (Tuning fork) কম্পন : উহা A B দুই বাহু (prong) বিশিষ্ট ও C হাতল বিশিষ্ট U-আকারের স্থিতিস্থাপক ইস্পাত দণ্ড। উহা একটি ফাঁপা কাঠের বাক্সর

উপর বসানো থাকে। কাপড় জড়ানো (padded) হাতুড়ি দিয়া একটি বাহুকে আঘাত করিলে বাহু কাঁপিতে থাকে ; সুমিষ্ট শব্দ উত্থিত হয়। কম্পন অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। একটি শোলার বলকে (pithball) বাহুর গায়ে ঝুলাইয়া দিলে বাহুর কম্পনে উহা বার বার সরিয়া যায় এবং বাহুর গা স্পর্শ করে। কম্পমান বাহুতে হাত দাও, কম্পন ও শব্দ দুইই বন্ধ হয়।

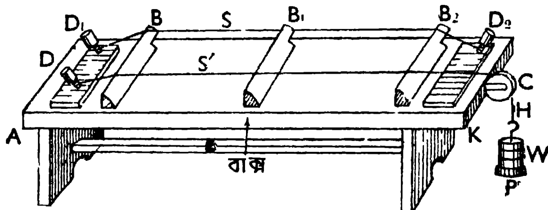
(ii) **তারের কম্পন :** দুইটি দণ্ড A ও B-তে একটি তার সটান (tightly) করিয়া বাঁধ। তারের মধ্য-বিন্দু E টানিয়া ছাড়িয়া দাও। তার



চিত্র 2 : তারের কম্পন।

D ও C বিন্দু পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে। তারকে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং শব্দ বাহির হয়। কম্পমান তারের মাঝখানে V আকারের পাতলা কাগজ রাখিলে তারের কম্পনে উহা দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।

তারের কম্পনের নিয়ম পরীক্ষার জন্য **সনোমিটার** (Sonometer) নামক যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। উহা একটি ফাঁপা কাঠের বাক্স AK। উহার চারিটি



চিত্র 3 : সনোমিটার।

পায়া থাকে। উহার এক দিকে দুইটি গোঁজ (peg) D, D_1 থাকে। D গোঁজ হইতে একটি S′ তার বাঁধিয়া C কপিকলের উপর দিয়া লইয়া তারের শেষপ্রান্তে P পাল্লায় W ওজন রাখা হয়। উহাতে তারটি সটান থাকে। অপর D_1 গোঁজ হইতে আর একটি S তার লইয়া অপর পার্শ্বে D_2 গোঁজে বাঁধা হয়। S′ তার হইতে উত্থিত শব্দের সহিত S তার হইতে উত্থিত শব্দের সুর মিলাইয়া S তারকে বাঁধা হয়। দুই তারের নীচে একটি সঞ্চরণশীল (movable) ও একটি

স্থির (fixed) কাঠের টুকরা থাকে। ওজনযুক্ত তারকে কম্পিত করিয়া শব্দ বাহির করা হয়। সঞ্চরণশীল টুকরাকে এদিক-ওদিক সরাইয়া তারের কম্পমান দৈর্ঘ্য ইচ্ছামত কম বেশী করা হয়। বায়ুপূর্ণ ফাঁপা বাক্সের জন্য শব্দ জোর হয়। অর্থাৎ বাক্স অনুনাদকের (resonator) কাজ করে। তারকে কম্পিত করিলে যে শব্দ নির্গত হইবে তাহার স্বরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

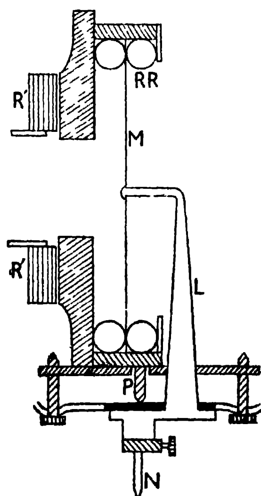
(i) যে ওজন দিয়া তারকে প্রসারিত রাখা হয়, তাহার উপর।

(ii) কম্পমান তারের দৈর্ঘ্যের উপর।

(iii) তারের ঘনাঙ্কের উপর।

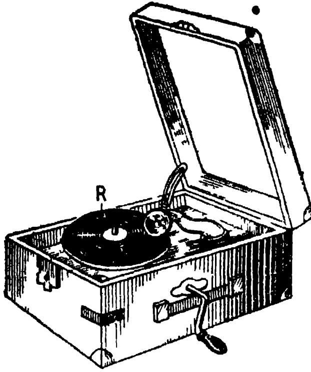
পাল্লায় একই ওজন রাখিয়া কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য কমাইলে স্বর তীক্ষ্ণ ও মসৃণ হইবে, দৈর্ঘ্য বাড়াইলে স্বর মোটা হয়। দৈর্ঘ্য একই রাখিয়া ওজন বাড়াইলে স্বর মসৃণ হয়, ওজন কমাইলে স্বর মোটা হয়। তার সরু হইলে স্বর তীক্ষ্ণ হয়, তার মোটা হইলে স্বর মোটা হয়। তারের কম্পন যতক্ষণ থাকে তার হইতে শব্দও ততক্ষণ নির্গত হয়। কম্পন বন্ধ হইলে শব্দও বন্ধ হয়। তারের কম্পন দেখিবার জন্য এক খণ্ড কাগজ উল্টা V-এর মত করিয়া তারের উপর রাখিলে তারকে বাজাইলে তারের কম্পনে কাগজ-খণ্ড ছিটকাইয়া পড়িয়া যায়।

(iii) গ্রামোফোন রেকর্ড : গ্রামোফোনে সাউণ্ড বক্স (sound box) নামক একটি ধাতু নির্মিত গোল কৌটা ব্যবহার করা হয়। সাউণ্ড বক্সের মধ্যে রবার আংটার (RR) সাহায্যে একটি পাতলা অভ্রের চাকতি (M) থাকে। চাকতিখানির কেন্দ্রে একটি লিভার (L) যুক্ত থাকে। লিভারের অন্য প্রান্তে একটি পিন (N) আটকানো থাকে। গ্রামোফোনে দম দিয়া স্প্রীংয়ের সাহায্যে রেকর্ডকে ঘোরানো হয়। রেকর্ড প্রস্তুতের সময় গানের বা আবৃত্তির শব্দে কম্পন আঁকাবাঁকা খাঁজের মধ্যে ধরিয়া রাখা হয়। রেকর্ড ঘুরিবার সময় পিনটি রেকর্ডের খাঁজে খাঁজে ঘুরিতে থাকে এবং কাঁপিতে থাকে। এই কম্পন লিভারের সাহায্যে বহুগুণ বর্ধিত



চিত্র 4 : সাউণ্ড বক্স।

হয় এবং অভ্রের চাকতিও বর্ধিত হারে কাঁপিতে থাকে। এই কম্পনই রেকর্ডের গানের বা আবৃত্তির পুনরাবৃত্তি করে।



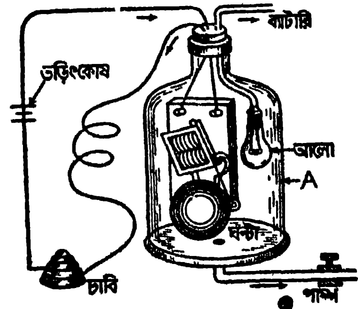
চিত্র 5 : গ্রামোফোন ; R—রেকর্ড।

আমাদের কথা বলিবার সময় শ্বাস-নালীর মুখ দুইটি পাতলা পর্দা আসিয়া প্রায় বন্ধ করিয়া দেয়। ফুসফুসের বায়ু জোরে বাহির হইবার সময় পর্দা দুইটি কাঁপিতে থাকে। পর্দার কম্পনের ফলে শব্দ উচ্চারিত হয়। মনে রাখিবে কোন বস্তুর কম্পন প্রতি সেকেণ্ডে 32 বার হইতে 30,000 বারের মধ্যে হইলে আমরা কম্পন হইতে উদ্ভূত শব্দ শুনিতে পাই।

3. শব্দ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যম প্রয়োজন (Material medium necessary for transmission of sound) : উৎপত্তি স্থল হইতে শব্দ জড় মাধ্যমের (কঠিন, তরল, বা গ্যাসের) মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হইয়া আমাদের কানে পৌঁছায়। বড় তক্তার এক প্রান্তে কান রাখিয়া অপর প্রান্ত কেহ নখ দিয়া আঁচড়াইলে কানে শব্দ শোনা যায়। পুকুরের জলের মধ্যে এক প্রান্তে কেহ হাততালি দিলে অপর প্রান্ত হইতে শব্দ শোনা যায়। তবে বায়ু হইল শব্দ সঞ্চালনের সাধারণ মাধ্যম।

শব্দ-সঞ্চালনের জন্য যে জড় মাধ্যম প্রয়োজন তাহা নিম্নলিখিত পরীক্ষা হইতে বোঝা যায়।

পরীক্ষা : একটি বেলজারের ছিপির মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা তারের সাহায্যে ঝুলাইয়া রাখ। তারের দুই প্রান্ত চাবি মারফত বিদ্যুৎ-কোষের সঙ্গে যুক্ত কর। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সমেত বেলজারকে বাত পাম্পের (air exhaust pump) উপরে বায়ুনিরুদ্ধভাবে বসাও। এইবার চাবি টিপিলে কোষ



চিত্র 6 : শব্দ-সঞ্চালনের জন্য বায়ু মাধ্যম প্রয়োজন।

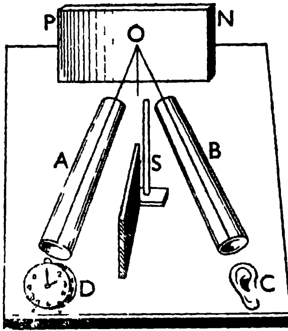
হইতে বিদ্যুৎ আসিয়া হাতুড়িকে ঘণ্টার উপর আঘাত করাইবে। ঘণ্টা বাজিতে থাকিবে। এখন ক্রমশঃ পাম্প চালাইয়া বেলজার হইতে বায়ু বাহির করিতে থাক। যতই বায়ু বাহির হইয়া যাইবে ততই শব্দ ক্ষীণতর হইবে। যখন ঐ বেলজার প্রায় বায়ুশূন্য হইবে তখন শব্দ শোনা যাইবে না, যদিও হাতুড়িকে ঘণ্টায় আঘাত করিতে ও ঘণ্টাকে কাঁপিতে দেখা যাইবে। পুনরায় বেলজারে বায়ু প্রবেশ করিতে দিলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ঘণ্টার কম্পন বেলজারের মধ্যস্থ বায়ুতে কম্পন সৃষ্টি করে। এই কম্পনে কাচের জার কম্পিত হয়। জারের কম্পনে বাহিরের বায়ু কম্পিত হয়। এই বায়ুর কম্পন কানের পর্দাকে কম্পিত করে। আমরা শব্দ শুনিতে পাই। উহার মধ্যে কোন স্থান জড় পদার্থ শূন্য হইলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই না। মাধ্যম আবার বায়ুর মত স্থিতিস্থাপক (elastic) এবং নিরবচ্ছিন্ন হওয়া চাই।

4. **শব্দের বেগ :** শব্দের বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা অনেক কম, আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল বা 2994600 কিলোমিটার। শব্দের বেগ বায়ু মাধ্যমে প্রতি সেকেণ্ড মাত্র 1120 ফিট বা 340 মিটার। সেইজন্য বহুদূরের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইলে ও বজ্রপাত হইলে বিদ্যুতের ঝলক দেখিবার কিছুক্ষণ পরে বজ্রের শব্দ শোনা যায়।

আবার শব্দের বেগ কঠিনে সব চেয়ে বেশী, বায়ুতে সব চেয়ে কম, তরলে মাঝামাঝি। একটি দীর্ঘ লোহার নলের এক প্রান্তে আঘাত করিলে অপর প্রান্তে পর পর দুইটি শব্দ শোনা যায়। প্রথমটি লোহার ভিতর দিয়া আসে। দ্বিতীয়টি বায়ুর ভিতর দিয়া আসে। পরীক্ষায় দেখা যায় যে বায়ুতে শব্দের যে বেগ জলে তার প্রায় সাড়ে চার গুণ বেগ, লোহায় তার প্রায় ষোল গুণ বেগ।

5. **শব্দের প্রতিফলন (Reflection of sound) :** আলোক যেমন মসৃণ তল হইতে প্রতিফলিত হয়, শব্দও সেইরকম কোন তল হইতে প্রতিফলিত হয়। আলোকের প্রতিফলনের দুইটি নিয়ম শব্দের প্রতিফলনের বেলায় প্রযোজ্য। তবে শব্দতরঙ্গ আলোকতরঙ্গের চেয়ে অনেক বড়। সেইজন্য শব্দের প্রতিফলক তল বৃহত্তর হওয়া প্রয়োজন। আলোক অতি ক্ষুদ্র কাচের কণা হইতেও প্রতিফলিত হয়। আবার আলোক প্রতিফলনের জন্য মসৃণ তল (যেমন আয়না) প্রয়োজন কিন্তু শব্দের প্রতিফলনের জন্য তল অতটা মসৃণ না হইলেও চলে। সেইজন্য শব্দতরঙ্গ গাছের সারি, দেওয়াল, পাহাড়ের গা হইতে সহজেই প্রতিফলিত হয়।

6. সমতলে প্রতিফলন পরীক্ষা: দেওয়ালে একখানি কাঠের সমতল কার্ডবোর্ড (PN) ঝুলাও। কাঠের গায়ে শব্দরোধক দ্রব্য তুলা লাগাইয়া একটি পর্দা (S) প্রস্তুত কর। এই পর্দাকে বোর্ডের মাঝামাঝি এমনভাবে বসাও যে পর্দার সমতল বোর্ডের সমতলের সহিত সমকোণে থাকে। একটি পিতলের ফাঁপা A নলকে বোর্ডের O বিন্দুর কাছাকাছি এমনভাবে বন্ধনী দ্বারা আটকাও যাহাতে উহার অক্ষ (axis) O বিন্দুতে যে কোন কোণ উৎপন্ন করে। বোর্ডের গায়ে এইরূপ আর একটি ফাঁপা B নলকে এমনভাবে বন্ধনী (clamp) দিয়া আটকাও যাহাতে উহার অক্ষ O অভিমুখে থাকে। এইবার Aনলের সম্মুখে একটি ঘড়ি D রাখ। নলের সম্মুখে শব্দ গ্রাহক যন্ত্র C (ear trumpet) রাখ। নলকে

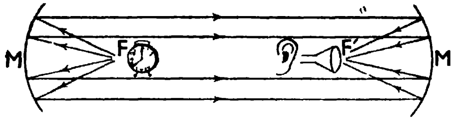


চিত্র 7 : সমতলে শব্দের প্রতিফলন।

একই অনুভূমিক তলে রাখিয়া এদিক-ওদিক ঘুরাও যতক্ষণ ঘড়ির জোর টিক্ টিক্ শব্দ শোনা না যায়। এইবার নলকে বন্ধনী দিয়া আটকাও। দুই নলের মধ্যে পর্দা থাকায় ঘড়ি হইতে উত্থিত শব্দ তরঙ্গ সরাসরি গ্রাহক যন্ত্রে পৌছায় না। ঘড়ি হইতে শব্দতরঙ্গ নলের অক্ষ বরাবর O বিন্দুতে সমতল বোর্ডের উপর আপতিত হইয়া নলের অক্ষ বরাবর প্রতিফলিত হইয়া গ্রাহক যন্ত্রে পৌছায়। এই অবস্থায় দেখা যায় দুইটি নলের অক্ষ O বিন্দুতে বোর্ডের উপর অভিলম্বের সহিত সমান কোণ উৎপন্ন করে অর্থাৎ আপতন কোণ = প্রতিফলন কোণ। নলকে যথাস্থানে রাখিয়া নলকে উলম্ব (vertical) তলে একটু এদিক-ওদিক ঘুরাইলে শব্দের জোর কমিয়া যায় অর্থাৎ আপতন বিন্দু O-তে অভিলম্ব, আপতিত শব্দতরঙ্গ এবং প্রতিফলিত শব্দতরঙ্গ একই তলে থাকে।

7. অবতলে প্রতিফলন: দুইটি অবতল প্রতিফলক-সামনা সামনি একটু দূরে এমনভাবে রাখ যাহাতে উহাদের প্রধান অক্ষ (axis) একই সরল রেখায় থাকে। M প্রতিফলকের প্রধান F ফোকসে একটি ঘড়ি রাখ। M′ প্রতিফলকের প্রধান F′ ফোকসে একটি শব্দ-গ্রাহক যন্ত্র (একটি রবারের নল লাগান ফানেল) রাখ। নলটি কানে লাগাইলে শব্দ জোর শোনা যায় কিন্তু নলকে বা ঘড়িকে একটু এদিক-ওদিক করিলে শব্দ স্পষ্ট শোনা যায় না। কেন এইরূপ

? প্রধান ফোকসে অবস্থিত ঘড়ি হইতে উত্থিত শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলকে আপতিত ও প্রতিফলিত হইয়া সমান্তরাল হয়। এই সমান্তরাল শব্দতরঙ্গ



চিত্র ৪ : অবতল প্রতিফলকে শব্দের প্রতিফলন।

দ্বিতীয় প্রতিফলকে আপতিত ও প্রতিফলিত হইয়া উহার প্রধান ফোকসে মিলিত হয়। শব্দ জোর হয়।

8. **প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত**: কানের মুখটা অবতল হওয়ায় শব্দতরঙ্গ এই মুখে কেন্দ্রীভূত হয়, শব্দ জোর হয়। বুক দেখিবার যন্ত্রে (Stethescope), শ্রবণ-যন্ত্রে (ear trumpets) একটি ধাতব নলে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করিয়া নলের ভিতরে বার বার প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতার কানে পৌছায়। উহাতে শব্দ জোর হয়। বড় বড় বক্তৃতাহলে পরাবৃত্তিক (parabolic) কাঠের প্রতিফলক থাকে; বক্তা উহার প্রধান ফোকসে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন। শব্দতরঙ্গ প্রতিফলক দ্বারা সমান্তরাল হইয়া দূরের শ্রোতার কানে পৌছায়।

9. **প্রতিধ্বনি (Echoes)**: বড় খালি ঘরে, পাহাড়ের ধারে খুব জোরে কথা বলিলে একটু পরেই পৃথকভাবে ঐ শব্দের পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। শব্দের গতি পথে উপযুক্ত কোন বাধা থাকিলে শব্দ ঐ বাধা হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে। যদি এই প্রতিফলিত শব্দ মূল শব্দ শেষ হইবার পরই শ্রোতার কানে পৌছায় তবে শ্রোতা উহাকে পৃথকভাবে শুনিবে। প্রতিফলিত শব্দকে **প্রতিধ্বনি** এবং মূল শব্দকে **ধ্বনি** বলে। মূল শব্দ শেষ হইবার পূর্বেই প্রতিফলিত শব্দ কানে পৌছিলে প্রতিফলিত শব্দকে পৃথক মনে হয় না। মূল শব্দকে একটু জোরালো মনে হয়।

আমাদের কানে কোন শব্দের অনুভূতি $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত শব্দ কানে পৌছিলে কান সেই শব্দ গ্রহণ করে বটে কিন্তু উহা কানে পৃথকভাবে অনুভূতি জাগায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। কানে উভয়ই এক শব্দ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে হইলে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে কমপক্ষে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড সময় অতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং প্রতিফলক বা বাধা কমপক্ষে

এমন দূরত্বে থাকা প্রয়োজন যে ধ্বনি বাধা পর্যন্ত যাইয়া প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় বক্তার কানে পৌঁছিতে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড লাগে। অর্থাৎ শব্দের ঐ দূরত্ব একবার যাইতে $\frac{1}{20}$ সেকেণ্ড লাগে। সুতরাং প্রতিফলককে অন্ততঃ 56 ফিট দূরে থাকিতে হইবে কারণ শব্দের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে 1120 ফিট। এই কারণে ছোট ঘরে শব্দ করিলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। মন্দির, গির্জা বা মসজিদে বা বড় হলে নীচু গলায় কথা বলিলেও কতক জায়গা হইতে প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আমরা প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচটি শব্দাংশের (syllable) বেশী কথা উচ্চারণ করিতে পারি না। আমাদের কানও প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচটির অধিক শব্দাংশ শুনিতে পায় না। $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ডে শব্দ 224 ফুট গমন করে। সুতরাং অন্ততঃ শেষ শব্দাংশের প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলককে কম পক্ষে $\frac{224}{2}=112$ ফুট দূরে থাকিতে হইবে। এই নিয়মে যদি কোন শব্দে m শব্দাংশ থাকে তবে প্রতিফলকে $m \times 112$ ফিট দূরে রাখিলে শেষ শব্দাংশের প্রতিধ্বনি স্পষ্ট শোনা যাইবে।

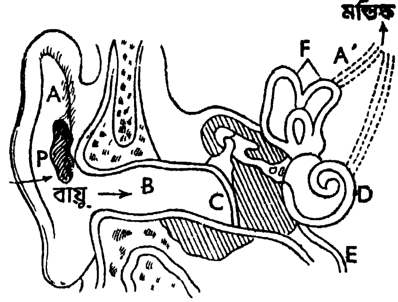
প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপা যায়। সমুদ্রের ভিতর শব্দ উৎপন্ন করিয়া উহার প্রতিধ্বনি সমুদ্রের তলদেশ হইতে কত সময় (t) পরে ফিরিয়া আসে তাহা তড়িৎযন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। জলের মধ্যে শব্দের বেগ (x মিটার) জানা আছে। সুতরাং সমুদ্রের গভীরতা $=\frac{x}{2} \times t$ মিটার।

10. কান ও আমাদের শব্দের অনুভূতি: আমরা কান দিয়া সেকেণ্ডে 30 হইতে 30000 কম্পাঙ্কের শব্দানুভূতি গ্রহণ করি, দুইটি সুমধুর সুরের পার্থক্য বুঝিতে পারি, বহু কম্পমান বিশিষ্ট সুরের বিশ্লেষণ করিতে পারি।

কানের তিনটি প্রধান অংশ আছে: (i) **বহিঃকর্ণ** (outer ear), (ii) **মধ্যকর্ণ** (middle ear), (iii) **অন্তঃকর্ণ** (internal ear)।

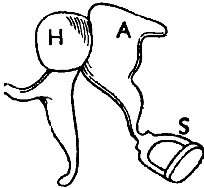
বহিঃকর্ণ: বহিঃকর্ণের একবারে বাহিরের অংশকে (A) আমরা কান বলি। উহার মধ্যভাগ অনেকটা অবতল এবং ফানেলের মত। উহা শব্দতরঙ্গ সংগ্রহে সহায়তা করে। বহিঃকর্ণ হইতে লম্বা B নল ভিতরের দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া একটি স্থিতিস্থাপক C পর্দায় (tympanic membrane) শেষ হইয়াছে। লম্বা নলকে **কর্ণকুহর** (air passage) এবং পর্দাকে **কর্ণপটহ** বলে। শব্দ-

তরঙ্গ নলের সরু স্থানের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কেন্দ্রীভূত হয় এবং পর্দায় একটু জোরে আঘাত করে। শব্দানুভূতি একটু জোরালো হয়। এই নালীতে সূক্ষ্ম লোম আছে এবং একটি আঠালো দ্রব্য ক্ষরিত হয়। এইজন্য পোকা-মাকড়, ধূলাবালি কানের ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। জীবজন্তু বহিঃকর্ণ মাড়াইয়া শব্দের দিকে কান ঘুরায় কিন্তু মানুষকে সমস্ত মাথা নাড়াইয়া শব্দের দিকে কান ঘুরাইতে হয়।



চিত্র 9 : কর্ণের গঠন।

মধ্যকর্ণ : উহা কানের পর্দা ও অন্তঃকর্ণের মধ্যে হাড় বেষ্টিত বায়ুপূর্ণ একটি প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠ একটি E নলের (eustachian tube) দ্বারা কণ্ঠনালীর সহিত যুক্ত হয়। গলা বা নাকের কোন রোগ-জীবাণুগুলি এই নালী দিয়া মধ্যকর্ণে চলিয়া আসিতে পারে। বিস্ফোরণ প্রভৃতি প্রচণ্ড শব্দ হইলে কানের পর্দায় জোরে আঘাত লাগে। এই অবস্থায় মধ্যকর্ণের কিছু বায়ু নলের মুখের মধ্য দিয়া বাহির হয়, ফলে পর্দা ফাটে না। পর্দার সুষ্ঠুকার্যের জন্য মধ্যকর্ণের বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান হওয়া প্রয়োজন। মধ্যকর্ণে তিন খানা হাড় পর পর জোড়া থাকে। তিনটি হাড়ের সমন্বয় লিভারের মত কাজ করে। প্রথমটি হাতুড়ির (hammer, H) মত, উহার এক প্রান্ত কানের পর্দার সহিত সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হাড়ের সহিত সংযুক্ত এবং দ্বিতীয় হাড় আবার তৃতীয় হাড়ের সহিত সংযুক্ত। দ্বিতীয় হাড়কে নেহাই (anvil, A) এবং তৃতীয় হাড়কে পাদানি (stirrup, S) বলে।



চিত্র 10 : কর্ণের তিনটি হাড়।

অন্তঃকর্ণ : উহাতে কয়েকটি হাড়ের ফাঁপা নল থাকে। উহার নীচের অংশে কর্ণকম্বু (cochlea,D) নামক প্যাঁচালো নল আছে। কর্ণকম্বু জেলির ন্যায় একটি তরলে (eudolymph) পূর্ণ থাকে। কর্ণকম্বু হইতে প্রায় 24000 শব্দগ্রাহী নার্ভ (auditory nerve) মস্তিষ্কে চলিয়া গিয়াছে। কর্ণকম্বুর

মাঝখান দিয়া একটি পর্দা আছে। উহার গা হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ (sensory hair) বাহির হইয়াছে। অন্তঃকর্ণের উপর অংশে তিনটি অর্ধবৃত্তাকার (semi circular, F) নল আছে। উহাদের মধ্যেও তরল পদার্থ থাকে। উহাদের গা হইতে অন্য এক প্রকার স্নায়ুমণ্ডলী বাহির হইয়াছে। উহারা শব্দানুভূতি জাগায় না। উহাদের সাহায্যে আমরা পড়িয়া যাইতেছি কিনা বুঝিতে পারি।

কেমন করিয়া শুনি : শব্দের উৎসর কম্পন বহিঃকর্ণস্থ বায়ুর মধ্যে কম্পন উৎপন্ন করে। এই কম্পন কর্ণপটহে আঘাত করে। এখানে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায়, কিন্তু প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। পর্দার কম্পন পর পর তিনটি হাড়কে কম্পিত করে। শেষ হাড় পাদানির কম্পনে কর্ণকম্বু তরল পদার্থ ও পর্দা কম্পিত হয়, এই কম্পন বা শব্দ-সংবাদগ্রাহী স্নায়ু মারফত মস্তিষ্কে পেঁাছায়।

অনুশীলনী

1. "কোন কম্পমান বস্তুই শব্দের উৎস"—এই উক্তি প্রমাণ করিবার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষা বর্ণনা কর।

2. শব্দ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? কয়েকটি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা কর।

3. নিম্নলিখিতগুলি কি প্রকারে শব্দ উৎপন্ন করে ব্যাখ্যা কর :— (i) সনোমিটার (ii) স্বর-শলাকা, (iii) গ্রামোফোন।

4. প্রমাণ কর যে, শব্দ প্রবাহের জন্য বাস্তব মাধ্যমের প্রয়োজন।

5. কঠিন, তরল ও বায়ুর মধ্য দিয়া শব্দ চলে—উহা কি প্রকারে প্রমাণ করিবে?

6. শব্দের সমতল প্রতিফলকে ও অবতল প্রতিফলকে প্রতিফলনের দৃষ্টান্ত সহ ব্যাখ্যা কর।

7. শব্দের সমতল প্রতিফলকে প্রতিফলনের নিয়ম প্রমাণ কর।

8. প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে? সাধারণ প্রতিধ্বনি ও উচ্চারিত প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলক অন্ততঃ পক্ষে কতদূরে থাকিবে?

9. উপযুক্ত চিত্র আঁকিয়া কানের গঠন ও বিভিন্ন কার্য বর্ণনা কর।

প্রথম অধ্যায় সম্বন্ধে Objective type প্রশ্নাবলী

1. **Recall Type :** ডান দিকের শূন্যস্থান পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর :—

(i) অন্তঃকর্ণের প্যাঁচালো নলের নাম———

(ii) শব্দের বেগ বায়ুতে প্রতি সেকেণ্ডে———

2. **Completion Type :** নিম্নলিখিত বাক্য সম্পূর্ণ কর :—শব্দ শুনিতে হইলে শব্দের কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে — (1) হইতে — (2) বার হওয়া উচিত এবং আমাদের কান ও শব্দের — (3) মধ্যে — (4) — (5) — (6) মাধ্যম থাকা প্রয়োজন।

3. **Alternate Response Type :**

(ক) **True or False Type :**

সত্য উক্তির পাশে × চিহ্ন দাও। মিথ্যা উক্তির পাশে 0 চিহ্ন দাও :—

(i) আলোকের বেগ ও শব্দের বেগ এক এবং আলোকের ও শব্দের প্রতিফলনের নিয়মও এক।

(ii) মধ্যকর্ণের প্রকোষ্ঠে বায়ু থাকে।

(খ) **Yes or No Type :**

হাঁ কি না উত্তর দাও :

(i) আমাদের কানের ও মুখের সংযোগ আছে কি ?

(ii) উচ্চারিত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিতে হইলে প্রতিফলককে অন্ততঃ 112 ফুট দূরে রাখিবে কি ?

(iii) কোন বস্তু সেকেণ্ডে 30 বারের কম কাঁপিলে শব্দ শোনা যায় কি ?

4. **Association Type :**

:: চিহ্নের দুই পাশের দুইটি সংখ্যার বা শব্দের একই সম্পর্ক। শূন্যস্থান পূরণ করিয়া সম্পর্ক বাহির কর :—

(1) উচ্চারিত শব্দের প্রতিধ্বনির জন্য প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব : অন্যপ্রকার শব্দের প্রতিধ্বনির জন্য প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব :: 112 : —

(2) আলো : চক্ষু :: শব্দ : —

5৷ Multiple Choice Type :

নিম্নলিখিত উক্তির সমর্থনে কয়েকটি কারণ দেওয়া আছে, প্রত্যেক কারণ পৃথকভাবে সত্য। সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণটি বল :—

একটি ধাতব নলের এক প্রান্তে হাতুড়ি দিয়া আঘাত করিলে অপর প্রান্তে পরপর দুইটি শব্দ শোনা যায় কারণ :—

(i) নলের ধাতু ও বায়ুর মধ্য দিয়া শব্দ বিভিন্ন বেগে চলে।

(ii) হাতুড়ি ও বায়ুতে কম্পন সৃষ্টি হয়।

(iii) বায়ু ও নলে কম্পন সৃষ্টি হয়।

6. কেন হয় বল :—

(i) একটি বাত-পাম্পের আসনের উপর বেলজারের ভিতর বায়ুনিরুদ্ধ-ভাবে শব্দায়মান তড়িৎঘণ্টা ও বৈদ্যুতিক আলো রাখিয়া যন্ত্র চালাইলে শব্দ শোনা যায় না, আলো দেখা যায়।

(ii) কথা বলিবার নলে শব্দ জোর হয়।

(iii) বড় টেবিলের এক প্রান্তে হাত-ঘড়ি রাখিয়া অপর প্রান্তে কান রাখিলে ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যায় কিন্তু কান তুলিলে শব্দ শোনা যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ (Electricity)

প্রথম পাঠ

বিদ্যুৎ প্রবাহ, ভোল্‌টিয় কোষ ও বিদ্যুৎ বিভব (Electric current, Voltaic cell & Electric potential) বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফল (Effects of Electric current), প্রবাহ-মাত্রা (Intensity), রোধ (Resistance)

11. বিদ্যুৎ : প্রাচীন কাল হইতে আকাশে বিদ্যুতের খেলা মানব-মনে ভয় ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বর্তমান জগতে সভ্যতার প্রধান উপাদান বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ঘরবাড়ী আলোকিত করে; পাখা, ট্রামগাড়ী, রেলগাড়ী চালায়। বিদ্যুতের সাহায্যে রেডিও, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিভিসন প্রভৃতি যন্ত্র চালাইয়া দূর-দূরান্তে সংবাদ আদান-প্রদান হয়।

আজ হইতে প্রায় 2500 বৎসর পূর্বে দার্শনিক থ্যালাস আবিষ্কার করেন যে অ্যাম্বার (amber—পাইন গাছের আঠা) নামক পদার্থকে রেশমী কাপড় দিয়া ঘর্ষণ করিলে উহা হাল্‌কা ছোট পদার্থ যথা চুল, শুষ্ক কাগজের টুকরা, পালক নিজের গায়ে আকর্ষণ করে। তিনি বিদ্যুৎ সম্পর্কে কিছুই জানিতেন না। অ্যাম্বারের গ্রীক নাম হইল ইলেকট্রন (electron)। এই নাম হইতে ইলেক্‌ট্রিসিটি (electricity) শব্দের উৎপত্তি।

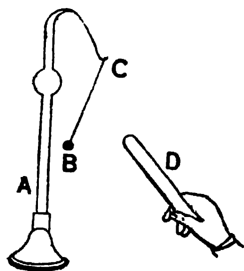
এখন আমরা জানি যে এমন অনেক পদার্থ আছে যাহা ঘর্ষণ করিলে এইরূপ আকর্ষণী শক্তির উৎপত্তি হয়। একটি সেলুলয়েডের বা প্লাস্টিকের চিরুণী শীতকালে মাথার শুষ্ক চুল আঁচড়াইয়া বা একটি কাচদণ্ডকে শুষ্ক রেশম দিয়া ঘর্ষণ করিয়া বা একটি রবারের দণ্ডকে ফ্লানেল দিয়া ঘর্ষণ করিয়া উহাদিগকে কাগজ কুচির বা শোলার কুচির উপর ধরিলে কুচিগুলি উহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাদিগকে স্পর্শ করে, তারপর বিকৃষ্ট হইয়া দূরে চলিয়া যায়। ঘর্ষণের জন্য এই সকল পদার্থে এক প্রকার শক্তি জন্মায় যাহার ফলে উহারা কুচিগুলিকে আকর্ষণ করে। এই অদৃশ্য শক্তিকে **বিদ্যুৎ** বলে। ঘর্ষণে উৎপন্ন হয় বলিয়া

এই বিদ্যুৎকে **ঘর্ষণ বিদ্যুৎ** বা **স্থির-বিদ্যুৎ** বলে। চিরুণী, কাচদণ্ড ও চাচ গালার এই অবস্থাকে **বিদ্যুতাহিত** (electrified or charged) অবস্থা বলে।

তারের মধ্য দিয়া যে বিদ্যুৎ চলাচল করে তাহাকে **চল-বিদ্যুৎ** বলে।

12. দুই বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ : এইবার নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি কর :—

(i) একটি A দণ্ড হইতে শুষ্ক রেশম সুতা C দিয়া একটি ছোট শোলার বল B (pithball) ঝুলাও। একটি D কাচদণ্ডকে রেশম কাপড় দিয়া ঘর্ষণ করিয়া বলের কাছে ধর। বল কাচদণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হয়, কাচদণ্ডকে স্পর্শ করে এবং তৎক্ষণাৎ কাচদণ্ড দ্বারা বিকৃষ্ট হইয়া দূরে সরিয়া যায়। এইবার কাচদণ্ডকে বলের নিকটে লইয়া যাইলে বল আরও সরিয়া যায়।



চিত্র 11 : বিদ্যুতের পরীক্ষা।

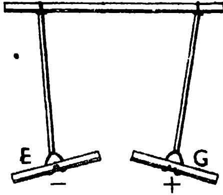
(ii) এইবার একটি রবারদণ্ডকে ফ্লানেল দিয়া ঘর্ষণ কর। উপরোক্ত বিলম্বিত অপর একটি বলের নিকট লইয়া যাও। বল রবারদণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হয়, দণ্ডকে স্পর্শ করে, তারপর বিকৃষ্ট হইয়া দূরে সরিয়া যায়।

(iii) প্রথম বলের নিকট রবারদণ্ড এবং দ্বিতীয় বলের নিকট কাচদণ্ড লইয়া আসিলে উহারা পরস্পর আকর্ষণ করে।

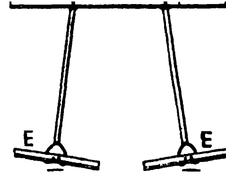
এই সকল পরীক্ষা হইতে বোঝা যায় যে, কাচদণ্ডে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ও রবারদণ্ডে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বিভিন্ন ধর্মী। কাচে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে **ধনাত্মক** (positive) এবং রবারে উৎপন্ন বিদ্যুৎকে **ঋণাত্মক** (negative) বিদ্যুৎ বলে।

13. দুই বিদ্যুতের ধর্ম : (i) **বিদ্যুতে আহিত পদার্থ অনাহিত পদার্থকে আকর্ষণ করে।** উপরের প্রথম পরীক্ষায় কাচে উৎপন্ন ধনাত্মক বিদ্যুৎ প্রথমে বলকে আকর্ষণ করে, কারণ বলটি অনাহিত (uncharged) থাকে। (ii) যখন বল কাচদণ্ডকে স্পর্শ করে তখন উহা সম বিদ্যুতে আহিত হয়। তখন উহারা পরস্পর বিকর্ষণ করে। সুতরাং **সমধর্মী বিদ্যুৎ পরস্পর বিকর্ষণ করে।** (iii) পরীক্ষায় বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতে আহিত কাচদণ্ড বল এবং রবারদণ্ড পরস্পর আকর্ষণ করে। সুতরাং **বিপরীতধর্মী**

বিদ্যুৎ পরস্পর আকর্ষণ করে। (iv) **ঘর্ষণে দুই প্রকার বিদ্যুৎ সম পরিমাণে উৎপন্ন হয়।** পরীক্ষার দ্বারা দেখানো যায় যে, চিরুণীতে



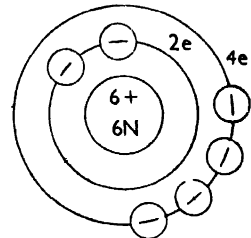
চিত্র 12 : বিষম তড়িতের আকর্ষণ।



চিত্র 13 : সমতড়িতে বিকর্ষণ।

ও চুলে, কাচদণ্ডে ও রেশমে, রবারদণ্ডে ও ফ্লানেলে দুই প্রকার বিদ্যুৎ সম পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

14. **পরমাণুর গঠন :** ঘর্ষণে বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহা বুঝিতে হইলে পরমাণুর গঠন মোটামুটি জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রে **প্রোটোন** (Proton) ও **নিউট্রোন** (Neutron) নামক কণা দিয়া গঠিত **নিউক্লিয়াস** (Neucleus) থাকে। প্রত্যেক প্রোটোন কণায় একক ধনাত্মক বিদ্যুৎ থাকে, কিন্তু নিউট্রোন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ (neutral)। সূর্য্যের চারিদিকে যেমন গ্রহ ঘোরে তেমন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে **ইলেক্‌ট্রোন** (Electron) নামক কণা বিভিন্ন কক্ষে (orbit) ঘুরিতেছে। প্রত্যেক ইলেক্‌ট্রোনে একক ঋণাত্মক বিদ্যুৎ থাকে। এই কণাগুলি পরস্পর বৈদ্যুতিক বলের দ্বারা আকৃষ্ট থাকে। পরমাণুতে প্রোটোন ও ইলেক্‌ট্রোনের সংখ্যা সমান থাকায় পদার্থ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়। পরমাণুর বহির্কক্ষের ইলেক্‌ট্রোনগুলির উপর এই বল কম থাকায় উহারা পরমাণুর সহিত তত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে না। ঘর্ষণ, তাপ বা রাসায়নিক



চিত্র 14 : পরমাণুর গঠন।

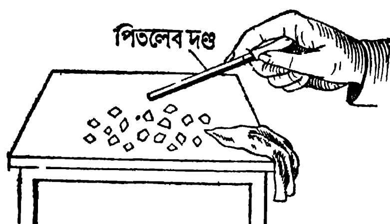
ক্রিয়ার প্রভাবে এই ইলেক্‌ট্রোনগুলি অপসারিত হয় কিন্তু উহারা একক থাকে না। উহারা অন্য পরমাণুতে যুক্ত হয়। যে পরমাণুর ইলেক্‌ট্রোন কমিয়া গেল তাহার বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ অবস্থা নষ্ট হইল। উহাতে ইলেক্‌ট্রোনের বা ঋণাত্মক বিদ্যুতের ঘাটতি হয় এবং উহা ধনাত্মক বিদ্যুতে আহিত হয়। যে পরমাণু

ইলেক্ট্রোন লাভ করে তাহা ঋণাত্মক বিদ্যুতে আহিত হয়। পশমী কাপড়ের ইলেক্ট্রোনগুলি অপেক্ষাকৃত শিথিল, সুতরাং রবারের দণ্ডের সহিত পশমী কাপড় ঘষিবার সময় পশমী কাপড়ের ইলেক্ট্রোন রবারদণ্ডে চলিয়া আসে। সেইজন্য দণ্ড ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত ও পশমী কাপড ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হয়। কাচ ও রেশমী কাপড়ের ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যাপার ঘটে।

নিম্নের তালিকায় যে কোন দুইটি বস্তু ঘর্ষণ করিলে প্রথমটি ধনাত্মক পরেরটি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যুক্ত হয়।

1. পশম	4. মানুষের হাত	7. গালা
2. কাচ	5. ধাতু	8. অ্যাম্বার
3. রেশম	6. এবোনাইট	9. রজন

15. পরিবাহী (Conductor) ও অপরিবাহী (Non-Conductor or Insulator) : একটি পিতলের দণ্ডকে হাতে করিয়া রেশম দ্বারা ঘর্ষণ কর, দণ্ডকে কাগজের টুকরার নিকটে ধরিলে উহা টুকরাগুলিকে আকর্ষণ করে না (চিত্র 15)। এবার দণ্ডকে কাঠের হাতলের সঙ্গে যুক্ত করিয়া হাতল ধরিয়া ঘর্ষণ করিলে দণ্ড কাগজের টুকরাগুলিকে আকর্ষণ করে (চিত্র 16), কেন ?



চিত্র 15 : শুধু পিতলের দণ্ড।

পিতলের দণ্ডে বিদ্যুৎ সৃষ্ট হইবার পরই পিতলের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ মানুষের দেহ দিয়া তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে চলিয়া যায়। কাঠের হাতল লাগাইলে দণ্ডে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কাঠের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না।

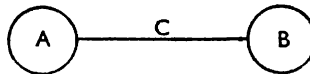
যে সকল পদার্থের কোন অংশে বিদ্যুৎ স্পর্শ করাইলে সমস্ত পদার্থে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়ে, পদার্থ সংলগ্ন অন্য পদার্থে চলিয়া যায় তাহাদিগকে **পরিবাহী** বলে—যথা মাটি, ধাতু, কারবন, মানুষের দেহ, অ্যাসিড ও ধাতব লবণ। যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে না তাহাদিগকে **অপরিবাহী**



চিত্র 16 : কাঠের হাতলযুক্ত পিতলের দণ্ড।

বা **অন্তরক** বলে—যথা কাচ, পশম, রেশম, তৈল, রবার, গন্ধক, মোম, গালা, এবোনাইট। ধাতুর মধ্যে তামা, রূপা, এ্যালুমিনিয়াম ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহী। পরিবাহীতে ইলেকট্রোন জমিলে তাহারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে। অপরিবাহীতে ইলেকট্রোন জমিলে তাহারা এক অংশেই থাকিয়া যায়। এই কারণে কোন পরিবাহীকে বিদ্যুৎযুক্ত করিতে হইলে সেটিকে আগে কিছু অপরিবাহীর উপর রাখিতে হয়। পৃথিবী একটি বিরাট পরিবাহী। যে কোন আহিত বস্তুকে বিদ্যুৎ মোক্ষণ (discharge) করিতে হইলে কোন পরিবাহীর মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগ করিতে হয়।

16. **বিদ্যুৎ-প্রবাহ:** যদি দুইটি অন্তরিত বিদ্যুৎ-আহিত (electrically charged) গোলক A ও B কে একটি ধাতব তার C দিয়া যোগ করা যায়, তবে A ও B-এর অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যুৎ A হইতে B তে কিংবা B হইতে A তে প্রবাহিত হইতে পারে, কিংবা উহাদের মধ্যে



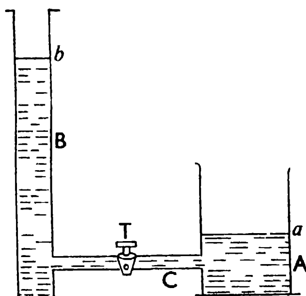
চিত্র 17

কোন বিদ্যুৎ প্রবাহিত নাও হইতে পারে। কোন পরিবাহীর মাধ্যমে বিদ্যুতের এই যাতায়াতকে **বিদ্যুৎ-প্রবাহ** (electric current) বলে। যে বিদ্যুৎ তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকে **চল-বিদ্যুৎ** (current electricity) বলে।

17. **বিদ্যুৎ-বিভব (Electric Potential):** আমরা জানি জল উঁচু জায়গা হইতে নীচু জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়। পর্বতের বরফ-গলা জল বা বৃষ্টির জল পর্বতের গা বহিয়া সমতল ভূমিতে পড়ে। জলপ্রপাতের জল পর্বতের খুব উঁচু জায়গা হইতে নিম্ন জায়গায় সবেগে প্রবাহিত হয়। কেন জল উঁচু জায়গা হইতে নিম্ন জায়গায় প্রবাহিত হয়? উহার কারণ উঁচু জায়গায় জলের চাপ অধিক হয় এবং নীচু জায়গায় জলের চাপ কম হয়। জল অধিক চাপের জায়গা হইতে কম চাপের দিকে প্রবাহিত হয়। কখনও নীচু জায়গা হইতে জল উঁচু জায়গায় স্বতঃই প্রবাহিত হয় না।

পরীক্ষা: মনে কর A ও B দুইটি দীর্ঘ পাত্র একটি T প্যাঁচকল যুক্ত C নল দ্বারা যোগ করা আছে। প্যাঁচকল খুলিলে পাত্রদ্বয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত

হয়। A পাত্র B পাত্রের অপেক্ষা মোটা। প্যাঁচকল বন্ধ করিয়া উভয় পাত্রে জল ঢাল যাহাতে A পাত্রে জলের উচ্চতা B পাত্রের উচ্চতা অপেক্ষা অধিক হয়। মনে কর A পাত্রের জলের তল a এবং B পাত্রের জলের তল b। প্যাঁচকল খুলিয়া দাও। এখন দেখা যায় B পাত্র হইতে জল A পাত্রে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত A ও B পাত্রের জল একতলে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত এই জল-প্রবাহ চলে। জল-তল এক হইলেই জল-প্রবাহ বন্ধ হয়। এখানে তরলের প্রবাহ তরলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, তরলের তল বা চাপের উপর নির্ভর করে। এই চাপই তরলকে উচু জায়গা হইতে নিচু জায়গায় ঠেলিয়া দেয়।



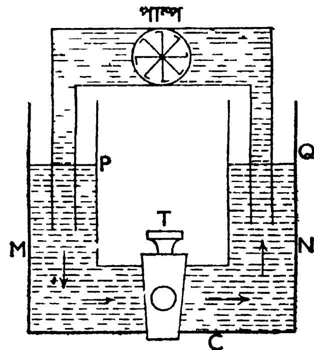
চিত্র 18 : B পাত্র হইতে জল A পাত্রে যায়।

এইবার বিদ্যুতের কথায় আসা যাক। জলের ক্ষেত্রে যাহাকে চাপ বলা হয় বিদ্যুতের ক্ষেত্রে তাহাকে **বিভব** বা **বৈদ্যুতিক চাপ** বলা হয়। জল যেমন উচ্চ চাপ হইতে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ তেমন উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। জলের তল সমান হইলে যেমন জল প্রবাহিত হয় না সেইরূপ দুইটি পরিবাহীর বিভব সমান হইলে উহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হয় না। যদি A-এর বিভব অধিক হয় তবে A হইতে B-তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে আর যদি B-এর বিভব অধিক হয় তবে B হইতে A-তে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে। যদি A ও B-এর বিভব সমান হয় তবে A ও B-এর মধ্যে কোন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে না (চিত্র 17)। সুতরাং (কোন বিদ্যুৎগ্রস্ত পরিবাহীর বৈদ্যুতিক অবস্থা, যাহা উক্ত পরিবাহী হইতে বা উক্ত পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে কিনা তাহা নির্ভর করে, সেই অবস্থাকে **বিদ্যুৎ বিভব** বলে।) বিদ্যুৎ সব সময়েই উচ্চ বিভব হইতে নিম্ন বিভবে যায়। আবার একটি বিদ্যুৎ-শূন্য বস্তুর বিভব 0 ; সুতরাং বিদ্যুৎযুক্ত বস্তু হইতে বিদ্যুৎ সব সময়েই বিদ্যুৎ-শূন্য বস্তুতে প্রবাহিত হয়। জলের উচ্চতার প্রভেদ থাকার জন্য যেমন চাপের পার্থক্য হয়, দুইটি বস্তুর মধ্যে বিভব প্রভেদ থাকার জন্য তেমন বৈদ্যুতিক-চাপের পার্থক্য হয়। এই চাপই বিদ্যুৎকে প্রবাহিত করায়।

18. স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ: দুইটি বিভিন্ন বিভবযুক্ত বিদ্যুৎগ্রস্ত পরিবাহীকে তার দ্বারা যুক্ত করিলে ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়; কারণ মুহূর্তের মধ্যে উহাদের বিভব সমান হয়, প্রবাহ বন্ধ হয়। সুতরাং কোন ব্যবস্থার দ্বারা যদি আমরা দুই বস্তুর বিভব-পার্থক্য বজায় রাখিতে পারি তবে আমরা একটি স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাইতে পারি। এই প্রসঙ্গে জল-প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মনে কর M ও N দুইটি পাত্র C নল দ্বারা যুক্ত। P ও Q দুইটি পাত্রের জলের তল। T প্যাঁচকল খুলিয়া দিলে জল M পাত্র হইতে N পাত্রে প্রবাহিত হয়, কিন্তু এই প্রবাহ ক্ষণস্থায়ী হয় কারণ ক্ষণেকের মধ্যে দুই পাত্রে জল একতলে আসিলে প্রবাহ বন্ধ হয়।

এখন যদি কোন যন্ত্র দ্বারা জল যে হারে M পাত্র হইতে C নল দিয়া N পাত্রে প্রবাহিত হয় সেই হারে পাম্প করিয়া N পাত্র হইতে M পাত্রে তুলিবার ব্যবস্থা করা হয়, তবে P ও Q জলতলের পার্থক্য সর্বদা একই থাকে এবং M পাত্র হইতে জল একটানা N পাত্রে প্রবাহিত হইবে। এই ক্ষেত্রে পাম্প চালাইতে কিছু যান্ত্রিক শক্তি খরচ হয়।

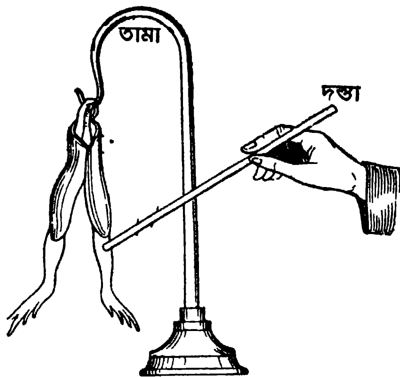


চিত্র 19 : পাম্প দ্বারা জল N পাত্র হইতে M পাত্রে তোলা হইতেছে।

এইবার একটানা বিদ্যুৎ প্রবাহের ক্ষেত্রে আসা যাক। একটি সুইচ টিপিলে ঘরে বৈদ্যুতিক বাতির তারে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ চলে বলিয়া বাতি বরাবর জ্বলিতে থাকে। কেন এমন হয়? ডায়নামো যন্ত্রের সহিত বাতির তারের দুই প্রান্ত যোগ করা থাকে। এই ডায়নামো যন্ত্রই তারের দুই প্রান্তে সর্বদা একই বিভব-পার্থক্য স্থায়ীভাবে বজায় রাখে। A ও B গোলকের (চিত্র 17) মধ্যে যদি সর্বদা বিভব-পার্থক্য এক মানে বজায় রাখা যায়, তবে উহাদের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি খরচ করিয়া বিভব-পার্থক্য বজায় রাখা হয়। বিদ্যুৎ-কোষে (electric cell) রাসায়নিক শক্তি খরচ করিয়া জলের পাম্পের মত বিদ্যুৎ পাম্প করিয়া স্থায়ী বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। অতএব বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য নিম্নলিখিত সর্ত প্রয়োজন:

(i) দুইটি বিদ্যুৎগ্রস্ত বস্তুর মধ্যে সমান বিভব-পার্থক্য এবং (ii) একটি সংযোজক তার। বিভব-পার্থক্য যত বেশী হইবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রাবল্য তত বাড়িবে।

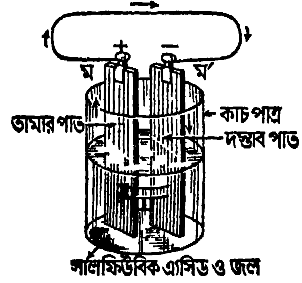
19. বিদ্যুৎ কোষের আবিষ্কার : 1786 খ্রীষ্টাব্দে ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর বিদ্যার অধ্যাপক **লুইগি গ্যালভ্যানি** একদিন সদ্যকাটা ব্যাঙের পা লবণ জলে ভিজাইয়া লোহার দণ্ড সংলগ্ন পিতলের দণ্ড হইতে ঝুলাইয়া রাখেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করেন যে যতবার বাতাসে আন্দোলিত হইয়া ব্যাঙের পা লোহার দণ্ড স্পর্শ করে ততবারই মাংসপেশী হঠাৎ 'সংকুচিত হইয়া পা ছিটকাইয়া যায়। তিনি ইহাতে আশ্চর্য হন। তিনি পুনরায় একটি ব্যাঙের পেশী কপার (তামার) হুক হইতে ঝুলাইয়া জিঙ্কের (দস্তার) দণ্ড স্পর্শ করান। উহাতে পেশীর সংকোচন সবচেয়ে বেশী হয়। এই পরীক্ষা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মৃত ব্যাঙের শরীরে জৈব বিদ্যুৎ বর্তমান আছে। এই সকল পরীক্ষার জন্য সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া 'ব্যাঙ নাচানো অধ্যাপক' বলিত। কিন্তু তৎপরে 1792 খৃস্টাব্দে প্যাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক **ভোল্টা** প্রমাণ করেন যে ব্যাঙের শরীরে কোন বিদ্যুৎ নাই। পিতল ও লোহা অথবা তামা ও দস্তা—এই দুইটি ধাতুর সংস্পর্শে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই মতবাদেও কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়। পরে বিজ্ঞানীরা স্থির করেন বিদ্যুৎ-প্রবাহের মূল কারণ কিছু রাসায়নিক শক্তি।



চিত্র 20 : ব্যাঙের পা সংকুচিত হয়।

20. সরল ভোল্টীয় কোষ (Simple Voltaic cell) : সর্বপ্রথম ভোল্টা এই কোষ নির্মাণ করেন বলিয়া উহাকে সরল ভোল্টীয় কোষ বলে। ইহাতে একটি কাচের বা পোর্সিলিনের পাত্রে কিছু পাতলা (dilute) সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে একটি তামার পাত ও একটি জিঙ্কের পাত একটু দূরে দূরে রাখিয়া আংশিক ডোবানো থাকে। পাত দুইটির অ্যাসিডের বাহিরের অংশে দুইটি বন্ধনীর (terminal) সাহায্যে দুইটি তামার তার লাগানো থাকে। তার দুইটি যোগ করিলে পাত্রের ভিতর

রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়। জিঙ্কের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় ($Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$)। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে জিঙ্ক ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত (বেশী ইলেক্‌ট্রোন যুক্ত) হয়। জিঙ্ক পাতকে ঋণাত্মক বিদ্যুৎদ্বার (electrode) বলে। কপার পাত ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত (কম ইলেক্‌ট্রোন যুক্ত) হয়। কপার পাতকে ধনাত্মক বিদ্যুৎদ্বার বলে।



চিত্র 21 : সরল ভোল্‌টীয় কোষ।

21. বিদ্যুৎ-প্রবাহের ব্যাখ্যা : সালফিউরিক অ্যাসিডে কপারের পাত ডুবাইলে তামার পরমাণুর ইলেক্‌ট্রোন অ্যাসিডে চলিয়া যায় এবং কপারের পাত ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হয়। সুতরাং কপার ও অ্যাসিডের মধ্যে ধনাত্মক-বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়। আবার জিঙ্ক পাত অ্যাসিডে ডুবাইলে উহা ঋণাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত হয়। সুতরাং ঋণাত্মক বিভব-পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কপার পাত উচ্চ বিভবে এবং জিঙ্কের পাত নিম্ন বিভবে থাকে। দুই পাতকে তার দিয়া যোগ করিলে রাসায়নিক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কপার পাত হইতে ঐ তার জিঙ্কের পাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতে থাকে।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে দুই পাতের মধ্যে বিভব-পার্থক্য কমিতে চেষ্টা করে। এই বিভব-পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য আরও রাসায়নিক ক্রিয়া হয়।

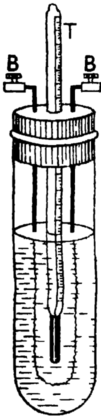
কপারের পাতকে ধনাত্মক মেরু (pole) ও জিঙ্কের পাতকে ঋণাত্মক মেরু বলে। দুই মেরুকে তার দিয়া যোগ করিলে বিদ্যুতের পথকে **সম্পূর্ণ বর্তনী** (Complete Circuit) বলে। দুই মেরু তার দিয়া যোগ করিলে বর্তনীকে **সংহত** (Closed) **বর্তনী** বলে। এই অবস্থাতেই কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। দুই মেরুর মধ্যে কোন সংযোগ না থাকিলে বর্তনীকে **খণ্ডিত** (Open) **বর্তনী** বলে। এই অবস্থায় কোন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না।

22. বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফল : যখন কোন তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন নিম্নলিখিত ফল দেখা যায় :—

(i) **চুম্বকীয় ফল** (Magnetic effect) : যখন তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তারের চতুর্দিকে একটি চৌম্বক শক্তির উদ্ভব হয়।

একটি সূচী চুম্বক (magnetic needle) বিদ্যুৎবাহী তারের নিকট আনিলে সূচী-চুম্বক বিক্ষিপ্ত হয়। স্থির বিদ্যুতে এই চুম্বক ধর্মের উদ্ভব হয় না। এই বিষয় পরে আলোচিত হইয়াছে।

(ii) **তাপীয় ফল** (Heating effect): কোন তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে তারটি গরম হইয়া উঠে। একটি কাচ পাত্রে জল বা কোন তরল পদার্থ লইয়া উহার ভিতর একটি সরু তার ডুবাইয়া তারের প্রান্তকে ব্যাটারির সহিত যুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে তারের তাপে তরল গরম হয়। একটি থার্মমিটার ডুবাইলে উষ্ণতা বোঝা যায়। যদি তারটি খুব সরু হয় তবে তার এত উষ্ণ হয় যে উহা আলো বিকীর্ণ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপীয় ও আলোকীয় ফলের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা পরে বলা হইবে।

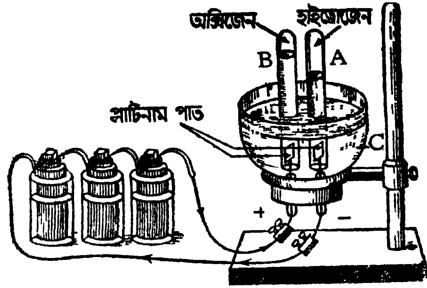


চিত্র 22

(iii) **রাসায়নিক ফল** (Chemical effect): কতকগুলি পদার্থের (যথা আম্লিকজল, ক্ষার বা লবণের জলীয় দ্রবণ, গলিত কঠিন পদার্থ) মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগের অণুগুলি রাসায়নিক ভাবে বিশ্লিষ্ট হয়। এই সকল পদার্থকে **ইলেক্‌ট্রোলাইট** (electrolyte) বা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য বলে। বিদ্যুৎ দ্বারা এইরূপ পদার্থের বিশ্লেষণকে **বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ** (Electrolysis) বলে। সুতরাং বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ = বিদ্যুৎ পরিবহন + রাসায়নিক বিয়োজন। যে পাত্রে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ হয় তাহাকে **বিদ্যুৎ বিশ্লেষক কোষ** (electrolytic cell) বা **ভোল্‌টামিটার** (Voltameter) বলে। ইলেক্‌ট্রোলাইটে নিমজ্জিত পদার্থকে **বিদ্যুৎ দ্বার** (electrode) বলে। যে দ্বার দিয়া বিদ্যুৎ ভোল্‌টামিটারে প্রবেশ করে তাহাকে **অ্যানোড** (Anode) বলে। উহা ব্যাটারির ধনাত্মক মেরুর সহিত যুক্ত থাকে এবং যে দ্বার দিয়া বিদ্যুৎ ভোল্‌টামিটার ত্যাগ করে তাহাকে **ক্যাথোড** (Cathode) বলে। উহা ব্যাটারির ঋণাত্মক মেরুর সহিত যুক্ত থাকে। অ্যানোড দ্বার ধনাত্মক বিদ্যুৎ যুক্ত হয় এবং ক্যাথোড দ্বার ঋণাত্মক বিদ্যুৎ যুক্ত হয়।

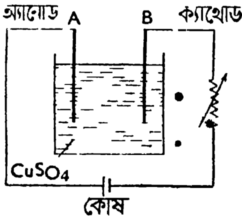
পরীক্ষা: (1) একটি পাত্রে অল্প অ্যাসিড মিশ্রিত জল লও। নীচের কর্কের ভিতর দিয়া দুইটি প্লাটিনাম পাত জলের ভিতর প্রবেশ করাও, তারের

শেষ প্রান্ত ব্যাটারির দুইটি মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর। দুইটি অংশাঙ্কিত জলপূর্ণ পরীক্ষা-নল A ও B দুইটি পাতের উপর উপুড় করিয়া পাত্রকে বন্ধনী দ্বারা আটকাও; এখন ব্যাটারি হইতে পাত্রের জলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাও। জল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে বিশ্লিষ্ট হয়। ধনাত্মক B দ্বারে অক্সিজেন এবং ঋণাত্মক A দ্বারে হাইড্রোজেন জমে।



চিত্র 23 : জলের বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ।

(ii) একটি কাচ পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ লও, উহাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাও। দ্রবণের ভিতর দুইটি তামার পাত ডুবাও। B পাতকে প্রথমে পরিষ্কার ও শুষ্ক করিয়া ওজন কর। উহাকে বিদ্যুৎ কোষের ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর। A পাতকে বিদ্যুৎ কোষের ধনাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর। বিদ্যুৎ কোষ হইতে কিছুক্ষণ বিদ্যুৎ দ্রবণের ভিতর দিয়া প্রবাহিত কর। পরে B পাত শুষ্ক করিয়া ওজন কর। উহার ওজন কিছু বাড়ে, কেন? কপার সালফেট কপার ও সালফিয়ন (SO_4) আয়নে বিশ্লিষ্ট হয়: $CuSO_4 = Cu^{++} + SO_4^{--}$। বিদ্যুৎযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু সমবায়কে আয়ন (ion) বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে ধনাত্মক কপার আয়ন ক্যাথোডে এবং ঋণাত্মক সালফিয়ন আয়ন অ্যানোডে আকৃষ্ট হইয়া সরিয়া যায় এবং বিদ্যুৎ মোক্ষণ করিয়া পরমাণুতে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে কপারের পরমাণু ক্যাথোডে জমা হয়। ফলে B পাতের ওজন বাড়ে।



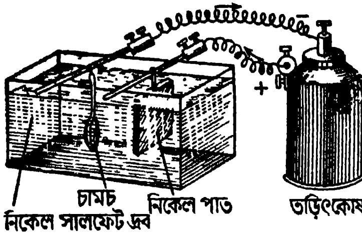
চিত্র 24 : কপার সালফেটের বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ।

কোন বিদ্যুৎদ্বারে যে পরিমাণ ধাতু বা অন্য পরমাণু মুক্ত হয় তাহা প্রবাহমাত্রা ও প্রবাহের সময়ের সঙ্গে সমানুপাতিক হয়।

বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণ আমাদের অনেক উপকার করে। যথা:—

(i) বিদ্যুৎলেপন (electroplating) প্রক্রিয়ার দ্বারা নিকৃষ্ট ধাতুদ্রব্যের (যথা—

চামচ, কাঁটা, বোতাম ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অংশ) উপর উৎকৃষ্ট বিভিন্ন ধাতুর যথা—সোনা, রূপা, নিকেল ইত্যাদির প্রলেপ দেওয়া হয়। ধাতব দ্রব্যকে পরিষ্কার করিয়া বিদ্যুৎ-গাহে ডুবানো হয়। উহাকে ক্যাথোড করা হয়। যে ধাতুকে লেপিত করা হয় তাহার বিশুদ্ধ দণ্ডকে অ্যানোড করা হয়। যে ধাতু লেপিত করা হয় গাহে তাহার একটি লবণের দ্রবণ থাকে। লোহার দ্রব্যের উপর নিকেল লেপনের সময় গাহে নিকেল অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ লওয়া হয়। লোহার দ্রব্যকে ক্যাথোড ও নিকেল দণ্ডকে অ্যানোড করা হয়। পিতলের দ্রব্যের উপর সোনার বা রূপার লেপনকে 'গিল্টি' করা বলে। বিদ্যুৎ লেপনে দ্রব্যগুলি চকচকে, সুন্দর ও টেকসই হয়।



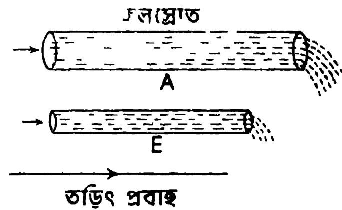
চিত্র 25 : বিদ্যুৎলেপন।

(ii) ধাতুর উপর অক্ষরের ছাঁচ (electrotyping) প্রস্তুত হয়।

(iii) আকরিক হইতে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্বারা ধাতু শোধন করা হয়।

23. প্রবাহ মাত্রা (Intensity) : বাড়ীর ছাদে যে জলের ট্যাঙ্ক থাকে তাহা হইতে নলের সাহায্যে চারিদিকে জল সরবরাহ হয়। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা বুঝিতে হইলে পুনরায় নলের ভিতর এই জল-প্রবাহের সহিত তুলনা করিতে হইবে। নলের দুই মুখে যদি চাপের পার্থক্য বজায় রাখা যায় তবে নলে স্থায়ী জল-প্রবাহ থাকিবে। নলের যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে যে জল বাহির হয় তাহার পরিমাণ দ্বারা জল-প্রবাহের মাত্রা মাপা যায়। যদি 10 সেকেণ্ডে 100 গ্রাম জল নল দিয়া বাহির হয়, তবে জলের প্রবাহ-মাত্রা $=\frac{100}{10}=10$ গ্রাম প্রতি সেকেণ্ডে। অনুরূপভাবে (কোন পরিবাহীর যথা একটি তারের যে কোন বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রতি সেকেণ্ডে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ দ্বারা বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা মাপা যায়) যদি t সেকেণ্ডে q পরিমাণ বিদ্যুৎ তারের কোন বিন্দুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তবে বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা $i=\frac{q}{t}$। বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা সাধারণতঃ অ্যাম্পিয়ার (ampere) এককে প্রকাশিত হয়।

24. রোধ (Resistance) : জলের নলের দুই মুখে চাপের পার্থক্য সমান রাখিয়া যদি নলের প্রস্থচ্ছেদ বা দৈর্ঘ্য কমানো বা বাড়ানো যায় তবে জলের প্রবাহের মাত্রা পরিবর্তিত হয়। নলের প্রস্থচ্ছেদ বাড়িলে অর্থাৎ নলটি মোটা হইলে এবং নলের দৈর্ঘ্য কমিলে অর্থাৎ নলটি ছোট হইলে জলের প্রবাহ-মাত্রা বাড়িবে। মোটা নলে বা ছোট নলে জল কম ঘর্ষণজনিত বাধা পায়। আবার সরু নলে বা দীর্ঘ নলে জল অধিক ঘর্ষণজনিত বাধা পায়। মোটা নলে অধিক জল এবং সরু নলে কম জল প্রবাহিত হয়।



চিত্র 26 : জল-প্রবাহ ও রোধের তুলনা।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটে। বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা তারের প্রস্থচ্ছেদ ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। তারের প্রস্থচ্ছেদ কমিলে বিদ্যুতের প্রবাহ মাত্রা কমে। তারের প্রস্থচ্ছেদ বাড়িলে বিদ্যুতের প্রবাহ-মাত্রা বাড়ে। তারের দৈর্ঘ্য বাড়িলে বিদ্যুতের প্রবাহ মাত্রা কমে। তারের দৈর্ঘ্য কমিলে প্রবাহ মাত্রা বাড়ে। অর্থাৎ মোটা তারে বিদ্যুৎ প্রবাহ কম বাধা পায়; সরু তারে অধিক বাধা পায়। তারের দৈর্ঘ্য বাড়িলে বাধাও বাড়ে। এই বাধাকে **রোধ** বলে। ইলেক্‌ট্রোনবাদ অনুসারে পরিবাহীর ভিতর দিয়া ইলেক্‌ট্রোনের গতিই বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় যাহা ইলেক্‌ট্রোনের গতিকে বাধা দেয় তাহাকেই **রোধ** বলে। রোধ পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতে, প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস্তানুপাতে পরিবর্তিত হয়। যদি পরিবাহীর রোধ $=R$, পরিবাহীর দৈর্ঘ্য $=l$, পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ $=s$ হয়, তবে $R \propto \frac{l}{s}$। ইহা ছাড়া রোধ পরিবাহীর উপাদান ও উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। পরিবাহীর উষ্ণতা যত বাড়ে রোধ তত বাড়ে। জলের ক্ষেত্রে নলের উপাদান বা জলের উষ্ণতার উপর রোধ নির্ভর করে না। সাধারণতঃ ধাতুগুলির রোধ কম। উহাদের মধ্যে সোনা, রূপা, তামার রোধ খুব কম। পশম, রবার প্রভৃতি কুপরিবাহীর রোধ খুব বেশী।

রোধ সাধারণতঃ **ওহম** (Ohm) এককে প্রকাশিত হয়। কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তে এক ভোল্ট বিভব-পার্থক্য থাকিলে যদি উহার মধ্য দিয়া এক

অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তবে উহার রোধ এক ওহম হয়। সুতরাং,

$$1 \text{ ওহম} = \frac{1 \text{ ভোল্ট}}{1 \text{অ্যাম্পিয়ার}}$$

জলপ্রবাহের তীব্রতা বাড়াইতে হইলে জলকে পাম্প করিয়া উচ্চ স্থানে উঠাইয়া জলের চাপ বাড়াইতে হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের তীব্রতা বাড়াইতে হইলে ক্যাথোড হইতে ইলেক্‌ট্রোন পাম্প করিয়া অ্যানোডের উপর ইলেক্‌ট্রোনের চাপ বাড়াইতে হয়। বৈদ্যুতিক কোষ, ডায়নামো যন্ত্রের সাহায্যে এই চাপ বাড়ানো যায়।

25 ওহম সূত্র (Ohm's Law): এই সূত্র দ্বারা প্রবাহ-মাত্রা, রোধ ও বিভব পার্থক্যের সম্পর্ক নির্ণীত হয়। 1826 খৃস্টাব্দে ওহম এই সূত্র আবিষ্কার করেন: **সমান উষ্ণতায় কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য উহার প্রবাহ-মাত্রার সমানুপাতিক হয়।** মনে কর কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব-পার্থক্য $= V_A - V_B$ এবং $V_A > V_B$

$$\therefore \quad V_A - V_B \propto \text{প্রবাহ মাত্রা } i$$

$$\therefore \quad \frac{V_A - V_B}{i} = R = \text{ধ্রুবক}$$

ওহম এই অনুপাতকে রোধ আখ্যা দেন।

$\therefore$ **বিভব-পার্থক্য = রোধ × প্রবাহ-মাত্রা।**

অনুশীলনী

1. স্থির-বিদ্যুৎ বলিতে কি বুঝ?
2. বিদ্যুৎ কয় প্রকার? উহাদের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিয়ম বল।
3. বিদ্যুৎ-প্রবাহ বলিতে কি বুঝ?
4. পরিবাহী ও অপরিবাহী কাহাকে বলে? উদাহরণ দাও।
5. পরিবাহীর বিভব বলিতে কি বুঝ ব্যাখ্যা কর। বিভবের সঙ্গে তরলের চাপের কি সম্পর্ক?
6. সরল বিদ্যুৎ-কোষ বর্ণনা কর।
7. বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফল কি?
8. স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহ কি প্রকারে সৃষ্টি করা যায়?

9. বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা ও জল-প্রবাহের মাত্রার তুলনা কর।

10. পরিবাহীর রোধ কাহাকে বলে ? উহা কিসের উপর নির্ভর করে ?

11. ওহম-সূত্র কাহাকে বলে ?

12. পরমাণুর ইলেক্‌ট্রোনীয় গঠন সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

13. **Alternate Response Type :**

True or False Type : সত্য যুক্তির গায়ে T অক্ষর লিখ।

(i) নিম্ন বিভব হইতে উচ্চ বিভবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়।

(ii) সম বিদ্যুৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, অসম বিদ্যুৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

(iii) বিদ্যুৎকোষ হইতে আমরা চলবিদ্যুৎ পাই।

Yes or No Type : হঁা কি না উত্তর দাও।

(i) পবিবাহীব রোধ কি প্রস্থচ্ছেদের উপর নির্ভর করে ?

(ii) সরল কোষে কি বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তি হইতে উৎপন্ন হয় ?

(iii) বিদ্যুৎ-কোষে কি বর্তনী সম্পূর্ণ হইলে তবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় ?

14. **Recall Type :** শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) যে বস্তুতে ইলেক্‌ট্রোনের ঘাটতি তাহার চার্জ —।

(ii) বিদ্যুৎ—ভিতর দিয়া সহজে চলাচল করে।

15. **Completion Type :** শূন্য স্থান পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর :—

যখনই কোন পদার্থ — (1) হয় তখন — (1)
উহার এমন একটি — (2) সৃষ্টি হয় যাহা — (2)
দ্বারা উক্ত পদার্থে অন্য পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ — (3)
— (3) কিংবা উক্ত পদার্থ হইতে বিদ্যুৎ — (4)
অন্য — (4) প্রবাহিত হইবে কিনা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়।

16. **AssociationType :** :: চিহ্নের ডান দিকের দুই শব্দের সম্পর্ক বাহির কর।

রোধ : প্রবাহ-মাত্রা :: ওহম : —

17. **Multiple Choice Type :**

(i) প্রবাহ-মাত্রা কোন্ এককে প্রকাশিত হয় ?

ওহম, অ্যাম্পিয়ার, ভোল্ট

(ii) কোন তারের প্রবাহ-মাত্রা কাহার উপর নির্ভর করে :—

তারের উপাদান, তারের ব্যাস, বিভব-পার্থক্য

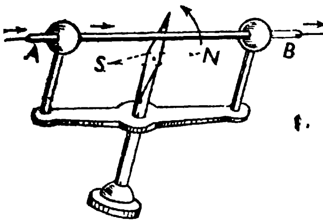
দ্বিতীয় পাঠ

বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পারস্পরিক ক্রিয়া

(Interaction of electricity and magnetism)

বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction)

26. **চুম্বকের উপর বিদ্যুতের ক্রিয়া :** 1820 খৃস্টাব্দে ওয়ারস্টেড (Oersted) পরীক্ষা দ্বারা চুম্বকের উপব বিদ্যুতের ক্রিয়া দেখান। তিনি স্থির চুম্বক-শলাকার উপর দিয়া উহার অক্ষের সমান্তরালে বিদ্যুৎ কোষ হইতে একটি তার প্রসারিত করেন। তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত না হইলে চুম্বক-শলাকা উত্তর-দক্ষিণমুখী অবস্থান করে। চিত্রে বিন্দু-রেখা (dotted line) দ্বারা শলাকার এই অবস্থান দেখানো হইল। যে মুহূর্তে তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করানো হয় সেই মুহূর্তেই শলাকা বিক্ষিপ্ত হইবে। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে তারের চারিদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র (magnetic field) সৃষ্টি হয়। সেইজন্য চুম্বক-শলাকা বিক্ষিপ্ত হয়। কারণ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব ব্যতীত চুম্বক-শলাকা বিক্ষিপ্ত হয় না। বিদ্যুৎ-প্রবাহ স্বয়ং চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। ওয়ারস্টেডের এই আবিষ্কার বিদ্যুৎ-শাস্ত্রে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করে। বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্র এই আবিষ্কারের ফলে নির্মিত হয়।

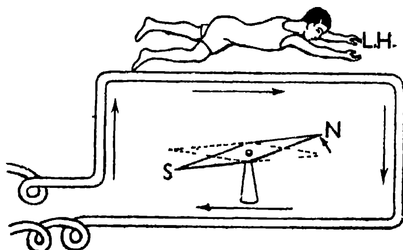


চিত্র 27 : ওয়ারস্টেডের পরীক্ষা।

27. **চুম্বক বিক্ষেপের (deflection) দিক নির্ণয়ের নিয়ম :** চুম্বক-শলাকা দুইটি বলের প্রভাবে আসে। বিদ্যুতের প্রভাবে

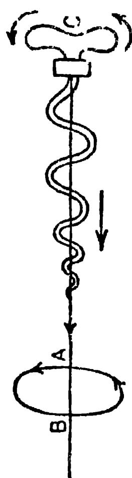
শলাকা তারের দৈর্ঘ্যের অভিলম্বে বিক্ষিপ্ত হইতে চেষ্টা করে। পার্থিব চৌম্বকের ক্ষেত্রের প্রভাবে শলাকা মাঝামাঝি অবস্থায় আসে। শলাকার বিক্ষেপের অভিমুখ, বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখ ও তারের অবস্থানের উপর নির্ভর করে। এই বিক্ষেপের অভিমুখ তিনটি নিয়ম দ্বারা নির্ণীত হয় :—

(i) **অ্যাম্পিয়ার নিয়ম :** মনে কর একটি বিদ্যুৎবাহী তারকে চারকোণা করিয়া মুড়িয়া তারের মধ্যস্থলে একটি চুম্বক-শলাকা রাখা হইল। মনে কর একটি মানুষ শলাকার দিকে সর্বদা মুখ করিয়া তার বরাবর প্রবাহের অভিমুখে সাঁতরাইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় মানুষটির বামহাতের (LH) দিকে শলাকার উত্তর মেরু বিক্ষিপ্ত হইবে এবং দক্ষিণ মেরু ডান হাতের দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।



চিত্র 28 : অ্যাম্পিয়ার নিয়ম পরীক্ষা।

(ii) **ফ্লেমিং-এর ডান হাত নিয়ম** (**Fleming's right hand rule**) : ডান হাতের প্রথম তিনটি আঙ্গুল (বৃদ্ধাঙ্গুলি, তর্জনী ও মধ্যমা) এমনভাবে প্রসারিত কর যে, উহারা পরস্পরের সহিত সমকোণে (perpendicularly) অবস্থান করে। তর্জনী (forefinger) বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করিলে এবং মধ্যমা (middle finger) শলাকার দিকে মুখ করিয়া থাকিলে, শলাকার উত্তর মেরু বৃদ্ধাঙ্গুলীর (thumb) দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে।

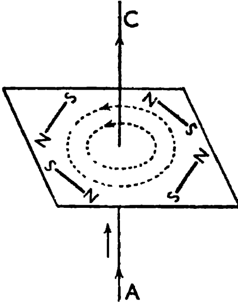


চিত্র 29 :

(iii) **ম্যাক্সওয়েলের কর্ক-স্ক্রু নিয়ম** (**Maxwell's cork-screw rule**) **:** মনে কর A B একটি সোজা তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে। ডান দিকে প্যাঁচযুক্ত ছিপি-খোলার স্ক্রুর (right hand screw) অক্ষ তার বরাবর রাখিয়া যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখে স্ক্রুকে চালনা করা যায় তবে বৃদ্ধাঙ্গুলী যে দিকে ঘুরিবে শলাকার উত্তর মেরু সেই দিকে ঘুরিবে (চিত্র 29)।

চুম্বকের বিক্ষেপের মাত্রা তারের পাকের (turn) সংখ্যা ও প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে।

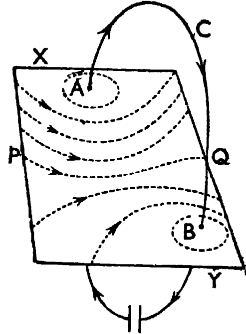
28. সরল রৈখিক বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুণ চৌম্বক ক্ষেত্র: একটি কার্ডবোর্ডের মাঝখানে একটি ছিদ্র করিয়া একটি তার C A সোজাভাবে রাখ, কার্ডবোর্ডের উপর লোহাচুর ছিটাইয়া দাও। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাও। কার্ডবোর্ডকে টোকা দাও। লোহাচুরগুলি চৌম্বক বলরেখা * (line of force) বরাবর সজ্জিত হয়। এই বলরেখাগুলি সমকেন্দ্রিক বৃত্ত হয়। কার্ডবোর্ডের উপর বিভিন্ন স্থানে সূচী-চুম্বক NS রাখিলে উহার অক্ষের অভিমুখ বলরেখার অভিমুখ নির্দেশ করে। এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, বিদ্যুৎ-বাহী তার চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে।



চিত্র 30 : সরল রৈখিক বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুণ চৌম্বক ক্ষেত্র।

বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুণ তারের চারিদিকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। তারের বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখ বদলাইলে বলরেখার অভিমুখ বদলায়।

29. বৃত্তাকার বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুণ চৌম্বক ক্ষেত্র: একটি কার্ডবোর্ডের A ও B দুইটি ছিদ্রের মধ্যদিয়া একটি বৃত্তাকার তার CQ প্রবেশ করাও। কার্ডবোর্ডের উপর লোহাচুর ছড়াইয়া দাও। তারের মধ্য দিয়া চিত্রে প্রদর্শিত অভিমুখে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাও, কার্ডবোর্ডকে টোকা দাও। লোহাচুরগুলি চিত্রে প্রদর্শিত তীরচিহ্ন অভিমুখে বলরেখা বরাবর সজ্জিত হয়। তারের ছেদবিন্দু A ও B বিন্দুর চারিপাশে বলরেখাগুলি প্রায় বৃত্তাকার। বৃত্তাকার তারের কেন্দ্রের চারিপাশে

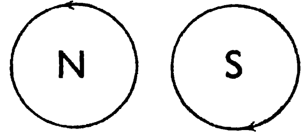


চিত্র 31 : বৃত্তাকার বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুণ চৌম্বক ক্ষেত্র।

* প্রত্যেক চুম্বকের চারিদিকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। প্রত্যেক বিন্দুতে চৌম্বক-বল ক্রিয়া করে। চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র পৃথক উত্তর মেরুকে চুম্বকের উত্তর মেরু হইতে দক্ষিণ মেরুতে লইয়া যাওয়া হইলে উহা একটি নির্দিষ্ট পথে চলিবে। এই পথকে **বলরেখা** বলে।

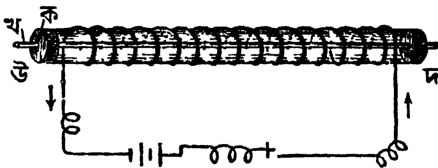
বলরেখাগুলি প্রায় সোজা হয় (যথা PQ)। বৃত্তাকার তার একটি চুম্বক চাকতির (magnetic shell) মত ব্যবহার করে। উহার দুই পৃষ্ঠে দুইটি মেরুর উদ্ভব হয়। তারকে চোখের সামনে ধরিলে দক্ষিণাবর্তী প্রবাহের দিকে দক্ষিণ মেরুর এবং বামাবর্তী প্রবাহের দিকে উত্তর মেরুর উদ্ভব হয়।

30. সলিনয়েড (Solenoid) : একটি দীর্ঘ অন্তরিত তারকে কুণ্ডলীর আকারে কয়েক পাক জড়াইলে উহাকে **সলিনয়েড** বলে। উহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে উহার দুই প্রান্তে দুইটি বিপরীত মেরুর উদ্ভব হয়। কারণ কুণ্ডলীর প্রত্যেক পাকের দুই মুখে বিপরীত ও সমান মেরুর উদ্ভব হয়। সুতরাং মাঝের পাকগুলির একটির N মেরু অপরটির S মেরুকে প্রশমিত করে। দুই প্রান্তের মেরু অপ্রশমিত থাকে। সমস্ত সলিনয়েড একটি চুম্বক দণ্ডের ন্যায় আচরণ করে। যে প্রান্তে বিদ্যুৎ দক্ষিণাবর্তে (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে) প্রবাহিত হয় সেই প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর এবং বিপরীত মুখে উত্তর মেরুর উদ্ভব হয়। সলিনয়েডের একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত পর পর চুম্বক সূচীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর নিকট আন, এক প্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরু বিকর্ষিত হইবে। সুতরাং সলিনয়েড একটি দণ্ড চুম্বকের মত ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে সলিনয়েডের মেরু পরিবর্তিত হয়।



চিত্র 32 : সলিনয়েড মেরুর প্রকৃতি।

31. বিদ্যুচ্চুম্বক (Electromagnet) : একটি কাঁচা লৌহদণ্ডকে সলিনয়েডের ভিতর প্রবেশ করাইয়া তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাইলে সলিনয়েডের চৌম্বক ক্ষেত্র কাঁচা লৌহদণ্ডকে আবেশের (induction) প্রভাবে চুম্বকে পরিণত করে। আবার লৌহদণ্ডকে খাড়া ভাবে কাগজের উপর রাখ। কাগজের উপর লৌহচূর্ণ ছড়াইয়া দাও। কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করাও। লৌহচূর্ণ লৌহদণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হয়। চুম্বকিত কাঁচা লৌহকে **বিদ্যুচ্চুম্বক** বলে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ যতক্ষণ



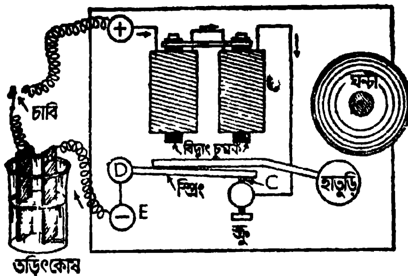
চিত্র 33 : বিদ্যুচ্চুম্বক

থাকে ততক্ষণ লৌহদণ্ডের চুম্বকত্ব থাকে। লৌহদণ্ডকে **কোর** (Core) বলে।

প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র উৎপাদনের জন্য বিদ্যুচ্চুম্বক ব্যবহৃত হয়। তারের পাকের সংখ্যা বাড়াইয়া বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া বিদ্যুচ্চুম্বকের শক্তি বাড়ানো যায়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অশ্বখুরাকৃতি বা U-আকারের বিদ্যুচ্চুম্বকের প্রয়োগ বেশী। U-আকারের ইস্পাত দণ্ডের চারিদিকে তার জড়াইয়া তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ পাঠাইলে ইস্পাত **স্থায়ী চুম্বকে** পরিণত হয়। কাঁচা লৌহদণ্ড **অস্থায়ী চুম্বকে** পরিণত হয়। U-আকারের ইস্পাত দণ্ডের দুই বাহুতে একই দিকে তার জড়াইতে হয়। U-আকারের চুম্বকের দুই মেরু একই দিকে থাকে বলিয়া উহা খুব শক্তিশালী হয়। বিদ্যুচ্চুম্বক নানা কার্যে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুচ্চুম্বক বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, বৈদ্যুতিক পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, স্থায়ী চুম্বক, ডায়নামো, রিলে প্রণালী, মোটর প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। কারখানায় বিদ্যুচ্চুম্বকের সাহায্যে বৃহৎ লৌহখণ্ড স্থানান্তরিত করা হয়। আবার চিকিৎসকগণ চোখে লোহার কুঁচি পড়িলে বিদ্যুচ্চুম্বকের সাহায্যে চোখ হইতে উহা সরাইয়া ফেলেন।

32. বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Bell) : বড় বড় অফিসে ও বাড়ীতে লোক ডাকিবার জন্য বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজানো হয়।

(i) **যন্ত্র :** একটি অশ্বখুরাকৃতি নরম লোহার বিদ্যুচ্চুম্বকের সম্মুখে একটি নরম লোহার আর্মেচারের (armature) উপর প্রান্ত D স্প্রিং-এর সঙ্গে যুক্ত আছে। আর্মেচারের নিম্ন প্রান্তে একটি হাতুড়ি থাকে। উহা ঘণ্টায় আঘাত করিলে শব্দ হয়। অব্যবহৃত অবস্থায় D স্প্রিং একটি স্ক্রুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। D স্প্রিং-এর সহিত E (−) বন্ধনীর যোগ থাকে। বিদ্যুচ্চুম্বকের কুণ্ডলী তারের এক প্রান্ত (+) বন্ধনীর সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত স্প্রিং-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। বর্তনীতে একটি চাবি থাকে।



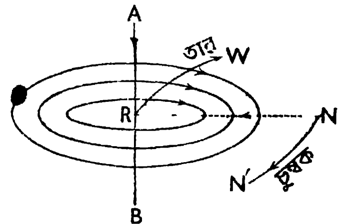
চিত্র 84 : বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

(ii) **ক্রিয়া :** চাবি টিপিলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং বিদ্যুৎ কোষ

হইতে কুণ্ডলীতে প্রবেশ করে। বিদ্যুচ্চুম্বক আর্মেচারকে নিজের দিকে টানে। ফলে হাতুড়ি ঘণ্টার উপর আঘাত করিয়া শব্দ সৃষ্টি করে। আবার এদিকে আর্মেচার আকৃষ্ট হওয়ায় স্ক্রু ও স্প্রিংয়ের মধ্যে ফাঁক (C) হয়। সুতরাং বর্তনী ছিন্ন হয়; ফলে প্রবাহ বন্ধ হয়, বিদ্যুচ্চুম্বকের চুম্বকত্ব অন্তর্হিত হয়। স্প্রিং স্থিতিস্থাপকতার জন্য পুনরায় পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসে; আবার বর্তনী সম্পূর্ণ হয়। যতক্ষণ চাবি টিপিয়া রাখা হয়, ততক্ষণ পর্যায়ক্রমে বর্তনী সম্পূর্ণ ও ছিন্ন হয়, ঘণ্টা বাজিতে থাকে।

33. বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া (Action of magnet on current): আমরা দেখিলাম যে, বিদ্যুৎবাহী তারের চারিদিকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট হয়। ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের ভিতর অন্য কোন চুম্বক-মেরু আনিলে উহার উপর বিদ্যুতের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে এবং উহা বিক্ষিপ্ত হয়। প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়া (reaction) উৎপন্ন হয়। এই নিয়ম অনুসারে তারের উপর উক্ত চুম্বকের একটি সমান আকর্ষণ বা বিকর্ষণ-বল ক্রিয়া করে যাহার ফলে তারটি মেরুর দিকে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয়।

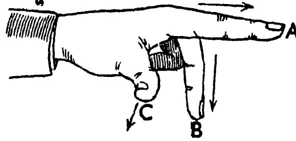
পরীক্ষা: একটি সোজা তার A B-এর মধ্য দিয়া উপর হইতে নীচের দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে। উহার দরুণ তারের চারিদিকে বৃত্তাকার রেখা বরাবর বলরেখা সৃষ্ট হইবে। সুতরাং N বিন্দুতে স্থাপিত একটি উত্তর মেরু স্থির A B তারের চারিদিকে N N′ রেখা বরাবর চলিতে থাকিবে। প্রতিক্রিয়া ক্রিয়ার বিপরীত। সুতরাং N মেরু যদি স্থির থাকে এবং A B তার যদি সঞ্চরণশীল (movable) হয়, তবে উহা NN′-এর বিপরীত দিকে অর্থাৎ R W অভিমুখে একই গতিতে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। সুতরাং কোন স্থির চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি বিদ্যুৎবাহী তার রাখা হইলে উহা একটি বল অনুভব করিবে।



চিত্র 35 : বিদ্যুৎবাহী তারের গতি।

34. তারের গতির দিক নির্ণয়: ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম (Fleming's left hand rule): বাম হস্তের প্রথম তিনটি

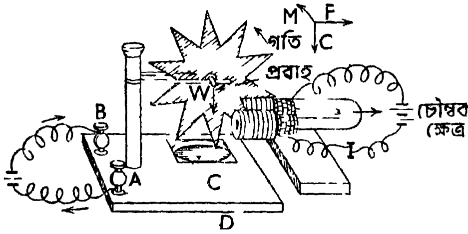
অঙ্গুলি—বৃদ্ধাঙ্গুলি, মধ্যমা ও তর্জনী এমনভাবে প্রসারিত কর যে, উহারা পরস্পরের সহিত সমকোণে অবস্থান করে। যদি তর্জনী A চৌম্বক ক্ষেত্রের



চিত্র 36 : ফ্লেমিং-এর বামহস্ত নিয়ম।

বলরেখার অভিমুখ নির্দেশ করে, মধ্যমা B বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে, তবে বৃদ্ধাঙ্গুলী C তারের গতির অভিমুখ নির্দেশ করিবে।

35. **বারলো চক্র (Barlow's wheel)** : উহা দশটি দাঁত বিশিষ্ট একটি পাতলা ধাতব চক্র—একটি অনুভূমিক অক্ষের চারিদিকে সহজে ঘুরিতে পারে। যন্ত্রটিকে কাঠের পাটাতনের উপর রাখা হয়। পাটাতনের C গর্তে পারদ থাকে। চক্রটি ঘুরিবার সময় উহার নিম্নতম দাঁত পর্যায়ক্রমে পারদ স্পর্শ করে। গর্তটি একটি অশ্বখুরাকৃতি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে অবস্থিত হয়। A বন্ধনী-স্ক্রু

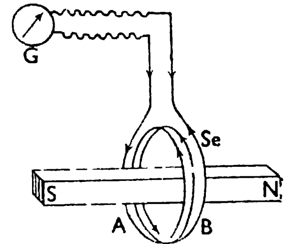


চিত্র ৩৭ : বারলো চক্র।

পারদের সঙ্গে ও B বন্ধনী-স্ক্রু চক্রের অক্ষের সঙ্গে যুক্ত রাখা হয়। দুই বন্ধনী-স্ক্রুকে বিদ্যুৎ কোষের দুই মেরুর সঙ্গে যোগ করা থাকে। বিদ্যুৎ চক্রের অক্ষ ও দাঁত দিয়া নিম্নমুখে প্রবাহিত হইয়া পারদের মধ্য দিয়া কোষে ফিরিয়া যায়। চক্র তীর চিহ্ন প্রদর্শিত পথে অনবরত ঘুরিতে থাকে। একটি দাঁত উপরে উঠিয়া যাইলে গতিজাড্যের জন্য পরবর্তী দাঁত নীচে নামিয়া পারদ স্পর্শ করিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বজায় রাখে। ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়মানুসারে চক্রের গতির অভিমুখ পাওয়া যায়। বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে বা চুম্বকের মেরু ঘুরাইলে চক্রের আবর্তনের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়।

36. বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ (Electromagnetic Induction) : ওয়ারস্টেড (Oersted) আবিষ্কার করেন যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ফ্যারাডে (Faraday) আবিষ্কার করেন যে চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে। 1831 খৃস্টাব্দে তিনি কোন কোষের সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল চুম্বক বা বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীর সাহায্যে অন্তরিত তারের বদ্ধ কুণ্ডলীতে (closed coil) ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুচ্চালক বল ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন। এই ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুচ্চালক বলকে **আবিষ্ট (Induced) বিদ্যুচ্চালক** বল এবং বিদ্যুৎকে **আবিষ্ট বিদ্যুৎ** বলে। এই ঘটনাকে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় **আবেশ** (induction) বলে। ফ্যারাডের এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে বড় বড় শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্ভবপর হইয়াছে। যে তারের কুণ্ডলীতে আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে **গৌণ** (Secondary) **কুণ্ডলী** বলে। বিদ্যুৎবাহী কুণ্ডলীকে **মুখ্য** (Primary) **কুণ্ডলী** বলে।

(a) **চুম্বক দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহের উৎপত্তি (Current induced by a magnet) :** ধাতব অন্তরিত তারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত একটি সুবেদী (Sensitive) গ্যাল্‌ভ্যানোমিটারের সঙ্গে সংযোগ কর। এই যন্ত্রের কাঁটার বিক্ষেপ দেখিয়া বিদ্যুতের অস্তিত্ব ও অভিমুখ বোঝা যায়।



চিত্র 88 : চুম্বক দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহের উৎপত্তি।

(i) একটি দণ্ড-চুম্বকের N মেরুকে গৌণ কুণ্ডলীর মধ্যে **ধীরে ধীরে** আন। যন্ত্রের কাঁটা ক্ষণিকের জন্য বিক্ষিপ্ত হয় অর্থাৎ গৌণ কুণ্ডলীর মধ্যে ক্ষণিক আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(ii) চুম্বককে থামাইলে কাঁটা 0° ডিগ্রিতে ফিরিয়া আসে। অর্থাৎ চুম্বক গতিশীল থাকিলে আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(iii) চুম্বককে **দ্রুত** লইয়া যাও, কাঁটা বেগে বিক্ষিপ্ত হয়, আবিষ্ট প্রবাহ তীব্র হয়।

(iv) চুম্বককে দূরে লইয়া যাও ; কাঁটা বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। গৌণ কুণ্ডলীতে বিপরীত আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(v) এইবার চুম্বকের S মেরু উপরোক্ত প্রণালীতে কুণ্ডলীর কাছে আন

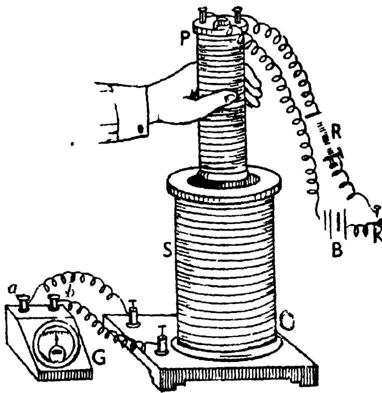
এবং দূরে লইয়া যাও। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাঁটা N-মেরুর ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। অর্থাৎ N মেরু ও S মেরু বিপরীত আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন করে।

(vi) চুম্বককে স্থির রাখিয়া কুণ্ডলীকে ধীরে ধীরে বা দ্রুত কাছে আনিলে একই সাময়িক ফল পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যায় যে, **চুম্বক বা কুণ্ডলীর পারস্পরিক গতির দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়।**

(b) প্রবাহ দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহের উৎপত্তি (Current induced **by a current**) : একটি বড় ফাঁপা কাঠের S ফ্রেমে সরু অন্তরিত তার জড়াইয়া তারের দুই প্রান্ত একটি গ্যালভ্যানোমিটারের বন্ধনীর সঙ্গে যোগ কর। উহা গৌণ কুণ্ডলী। একটি ছোট P ফ্রেমে তার জড়াইয়া অপর একটি কুণ্ডলী প্রস্তুত কর। উহা মুখ্য কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীর বর্তনীতে একটি চাবি K, ব্যাটারি B ও রিওস্টেট R যুক্ত আছে।

(i) প্রথমে গৌণ কুণ্ডলীর বর্তনীতে একটি বিদ্যুৎ কোষ ও রিওষ্টেট সংযোগ করিয়া কুণ্ডলীতে প্রবাহের অভিমুখ নির্ণয় কর। মনে কর প্রবাহ বামাবর্তে (anti clockwise) চলিতেছে। এখন যন্ত্রের কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখ দেখিয়া রাখ। পরবর্তী পরীক্ষায় কাঁটার বিক্ষেপের এই অভিমুখ হইলে গৌণ কুণ্ডলীতে প্রবাহ বামাবর্তে হইবে। রিওস্টেট ও কোষ সরাইয়া লও।



চিত্র 89 : প্রবাহ দ্বারা আবিষ্ট প্রবাহের উৎপত্তি।

(ii) K চাবি তুলিয়া P-কে S-এর মধ্যে প্রবেশ করাও। K চাবি আঁটিয়া বর্তনী সম্পূর্ণ কর। যন্ত্রের কাঁটা নিমেষের জন্য বিক্ষিপ্ত হয়। কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখ দেখিয়া বোঝা যায় যে বর্তনী সম্পূর্ণ করিবার মুহূর্তে (at make) S-তে বিপরীতমুখী (inverse) সাময়িক আবিষ্ট ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(iii) P-কে S-এর ভিতর রাখিয়া K-কে তুলিয়া বর্তনী ছিন্ন কর। কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখ দেখিয়া বোঝা যায় যে বর্তনী ছিন্ন করিবার

মুহূর্তে (at break) S-তে সাময়িক সমমুখী (direct) ক্ষীণ আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(iv) P-কে দূরে লইয়া যাও। বর্তনী সম্পূর্ণ কর। P-কে দ্রুত S-তে প্রবেশ করাও। কাঁটার বিক্ষেপের অভিমুখ দেখিয়া বোঝা যায় যে S-তে বিপরীত মুখী সাময়িক তীব্র প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

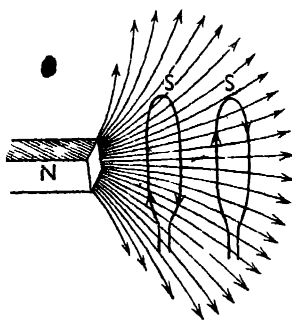
(v) এইরূপে দেখা যায় P-কে S-এর ভিতর হইতে দ্রুত লইয়া যাইলে সমমুখী তীব্র প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(vi) P-কে S-তে ধীরে ধীরে রাখিলে বা S হইতে লইয়া যাইলে S-তে (iv) ও (v) পরীক্ষার মত একই অভিমুখী প্রবাহ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ক্ষীণ প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

(vii) P-তে বর্তনী সম্পূর্ণ করিয়া ও উহাকে স্থির রাখিয়া S কুণ্ডলীকে P-এর নিকট আনিলে বা দূরে লইয়া যাইলে একই ফল পাওয়া যায়।

(viii) বর্তনী সম্পূর্ণ করিয়া P-কে S-এর ভিতর রাখ। R-কে এদিক-ওদিক সরাইয়া P-এর প্রবাহের মাত্রা হঠাৎ কমাও বা বাড়াও। দেখা যায় যে, P-তে প্রবাহের মাত্রা বাড়াইবার সময় বিপরীতমুখী ও কমাইবার সময় সমমুখী সাময়িক প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

37. ফ্যারাডের নিয়ম (Faraday's Law): উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি একই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে S কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া চুম্বক বা মুখ্য প্রবাহ হইতে উৎপন্ন চৌম্বক বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন হয়। সেইজন্য আবিষ্ট প্রবাহ উৎপন্ন হয়। ফ্যারাডে নিম্নলিখিত দুইটি সূত্র আবিষ্কার করেন :—



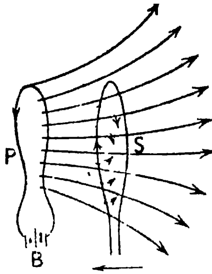
চিত্র 40 : চুম্বক হইতে উৎপন্ন বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন।

(i) **প্রথম সূত্র :** যখন কোন গৌণ সংহত বর্তনীর (বিদ্যুৎ উৎসহীন) মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হয় তখন গৌণ বর্তনীতে আবিষ্ট বিদ্যুচ্চালক বলের ও বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। যতক্ষণ এই পরিবর্তন চলে ততক্ষণ

প্রবাহ থাকে। বলরেখার সংখ্যা **বৃদ্ধিতে বিপরীতমুখী** এবং সংখ্যা **হ্রাসে সমমুখী** প্রবাহ উৎপন্ন হয়।)

(ii) **দ্বিতীয় সূত্র**ঃ (বিদ্যুচ্চালক বলের পরিমাণ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত বলরেখার পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক হয়।)

চিত্রে দেখা যায় যে, S-কে ও P-কে পরস্পর নিকটে আনিলে, P-তে হঠাৎ বর্তনী সম্পূর্ণ করিলে কিংবা P-তে প্রবাহ মাত্রা বাড়াইলে বা শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করিলে S দ্বারা অতিক্রান্ত বলরেখার' সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং S-তে বিপরীতমুখী প্রবাহ উৎপন্ন হয়।



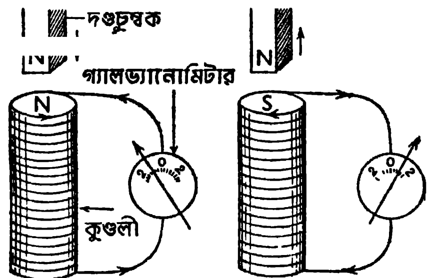
চিত্র 41 : প্রবাহ হইতে উৎপন্ন বলরেখার সংখ্যার পরিবর্তন।

চিত্রে দেখা যায় যে, P-কে ও S-কে পরস্পর হইতে দূরে লইয়া যাইলে, P-তে হঠাৎ প্রবাহ বন্ধ করিলে কিংবা P তে প্রবাহ-মাত্রা কমাইলে S দ্বারা অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা হ্রাস পায়; সুতরাং S-তে সমমুখী প্রবাহ উৎপন্ন হয়।

আবার S বা P-কে স্থির রাখিলে S দ্বারা অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং S-তে কোন প্রবাহ উৎপন্ন হয় না।

দ্রুত S কে বা P-কে লইয়া যাইলে বলরেখার 'পরিবর্তনের হার বাড়ে। সুতরাং প্রবাহ তীব্র হয়।

38. **লেঞ্জের সূত্র (Lenz's Law)**ঃ (যে কোন বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে আবিষ্ট প্রবাহের অভিমুখ এমন হইবে যে, যে-কারণে প্রবাহের সৃষ্টি হয় সেই কারণকে এই প্রবাহ বাধা দিবে।) দণ্ড চুম্বকের N মেরু প্রবেশ করাইবার সময় বিদ্যুৎ-প্রবাহের দরুণ S কুণ্ডলীর উপর মুখে N মেরুর উদ্ভব হয়



চিত্র 42 : লেঞ্জের সূত্র পরীক্ষা।

এবং বাহির করিবার সময় S মেরুর উদ্ভব হয়। সুতরাং দণ্ড চুম্বক ঢুকাইবার

সময় দুই সমমেরুর ভিতর বিকর্ষণ জনিত বলের বিরুদ্ধে এবং বাহির করিবার সময় দুই বিষম মেরুর ভিতর আকর্ষণজনিত বলের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়। এই সময় যান্ত্রিক শক্তিই বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. একটি ছোট চুম্বক-শলাকা একটি দণ্ডের (pivot) উপর স্থাপিত আছে। একটি বিদ্যুৎবাহী তার শলাকার অক্ষের সমান্তরালে নীচে ও উপরে রাখিলে শলাকা কোন্ অবস্থানে থাকে? বিদ্যুৎ-প্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তন করিলে কি হয়?

2. বিদ্যুচ্চুম্বক কাহাকে বলে? উহা কি কি কাজে লাগে?

3. চুম্বকের উপর বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্রিয়া পরীক্ষার দ্বারা বর্ণনা কর। চুম্বক বিক্ষেপের নিয়ম ব্যাখ্যা কর।

4. বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বিবরণ ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

5. বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়া সংক্রান্ত কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

6. বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের পরীক্ষাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

7. বিনা বিদ্যুৎ-কোষে কিরূপে সংহত বর্তনীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবে?

8. বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের সূত্রগুলি বর্ণনা ও ব্যাখ্যা কর।

9. বারলো চক্র বর্ণনা কর। উহা কি প্রমাণ করে?

10. Recall Type

(i) বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন চুম্বককে বলে ——।

(ii) অন্তরিত তারের কুণ্ডলীকে বলে ——।

11. Completion Type

কোন মানুষ— (1) বাহী তার বরাবর প্রবাহের— (2) এমনভাবে হাত প্রসারিত করিয়া সাঁতরাইতেছে যে তাহার মুখ সর্বদা — (3) দিকে থাকে। এই মানুষটির — (4) হাতের দিকে চুম্বকের — (5) মেরু বিক্ষিপ্ত হইবে।

12. Alternate Response Type

True or False Type : সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও।

(i) বিদ্যুৎ-প্রবাহ চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট করে।

(ii) বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশে বিদ্যুৎ সৃষ্ট হয়।

(iii) তারের পাকের সংখ্যা বাড়াইলে বিদ্যুতের মাত্রা বাড়ে।

Yes or no Type : হাঁ কি না উত্তর দাও।

(i) বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় কি বিদ্যুচ্চুম্বক ব্যবহৃত হয়?

(ii) বারলো চক্র বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ার কি উদাহরণ?

(iii) বিদ্যুৎবাহী সলিনয়েড কি চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে?

13. Multiple Choice Type

(i) চুম্বকের উপর বিদ্যুৎ-প্রবাহের ক্রিয়া কে আবিষ্কার করেন— ফ্যারাডে? ওয়ারষ্টেড? অ্যাম্পিয়ার?

(ii) বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ কাহার আবিষ্কার—

ফ্যারাডে? ওহম? লেঞ্জ?

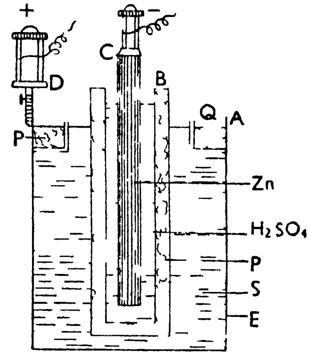
তৃতীয় পাঠ

বিদ্যুৎ-কোষ (Electric Cell), শক্তিরূপে বিদ্যুৎ (Electricity as energy), বার্তাবহ বিদ্যুৎ (Electricity for communication)

39. **বিদ্যুৎ-কোষ :** যে ব্যবস্থায় রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহাকে বিদ্যুৎ-কোষ বলে। বিদ্যুৎ-কোষের সাহায্যে অল্প কাজের জন্য অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোনে উহা ব্যবহৃত হয়। বিভব-পার্থক্য সৃষ্ট করিবার জন্য প্রত্যেক কোষে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পাত, একটি তরল এবং ছদন-নিবারক দ্রব্য থাকে। কোষে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। গ্যাস বিদ্যুতের কুপরিবাহী, সেইজন্য উহাতে প্রবাহ বন্ধ হয়। এই ঘটনাকে ছদন

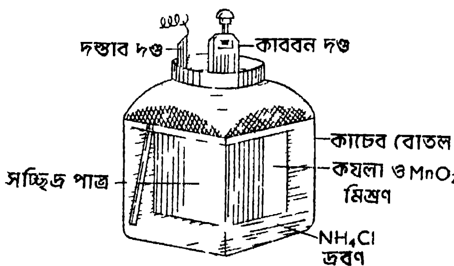
(polarisation) বলে। কোন জারক পদার্থ কোষে রাখিলে উহা হাইড্রোজেনকে জারিত করিয়া জলে পরিণত করে। জারক দ্রব্যকে ছদন নিবারক (depolariser) বলে।

(i) **ড্যানিয়েল কোষ** (Daniell Cell): একটি তামার E পাত্রে তুঁতের ($CuSO_4$) সংপৃক্ত দ্রবণ S থাকে। এই তামার পাত্র কোষের ধনাত্মক (+) পাতের কাজ করে। তামার পাত্রের উপরের দিকে সছিদ্র P ও Q তাকে (Shelf) তুঁতের কেলাস রাখা হয়। তাক দ্রবণে আংশিক ডুবিয়া থাকে। উহার ফলে দ্রবণ সর্বদাই সংপৃক্ত থাকে। দ্রবণের ভিতর সছিদ্র চিনামাটির B পাত্রে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে পারদের প্রলেপযুক্ত দস্তার C দণ্ড রাখা হয়। এই দণ্ড ঋণাত্মক মেরুর কাজ করে। দস্তার পাত নিম্ন বিভবে এবং তামার পাত উচ্চ বিভবে থাকে। দুই পাত তার দিয়া যোগ করিলে তারের মধ্য দিয়া তামা হইতে দস্তার দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। দস্তার সহিত সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই কোষ কিছুক্ষণের জন্য নিত্যপ্রবাহ সরবরাহ করে। তুঁতের দ্রবণ ছদন নিবারণের কাজ করে।



চিত্র 43 : ড্যানিয়েল কোষ।

(ii) **লেকল্যান্স কোষ** (Leclanche Cell): কাচ পাত্রে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের গাঢ় দ্রবণ রাখা হয়। দ্রবণে পারদের প্রলেপযুক্ত দস্তার দণ্ড আংশিক ডোবানো থাকে। দ্রবণের ভিতর একটি সছিদ্র পাত্রে ম্যাংগানিজ ডাই-অক্সাইড ও কাঠ কয়লার মিশ্রণের মধ্যে একটি কারবনদণ্ড প্রবিষ্ট থাকে। দস্তার দণ্ড ঋণাত্মক মেরু

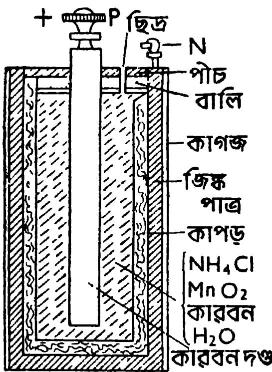


চিত্র 44 : লেকল্যান্স কোষ।

ও কারবন দণ্ড ধনাত্মক মেরু গঠন করে। দস্তা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সহিত ক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে। এই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে' বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎপত্তি হয়। ম্যাংগানিজ ডাই-অক্সাইড ছদন নিবারক। এই কোষ টেলিফোনে, টেলিগ্রাফে ও বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় ব্যবহৃত হয়। এই সকল কোষ একটানা অনেকক্ষণ ব্যবহৃত হয় না। একটানা ব্যবহার করিলে বিদ্যুচ্চালক বল কমিয়া যায়।

(iii) **নির্জল কোষ** (Dry Cell) ঃ উহা প্রকৃতপক্ষে লেকল্যান্স কোষের পরিবর্তিত রূপ। কেবল তরলের পরিবর্তে লেই (paste) ব্যবহার করা হয়। এই কোষ টর্চ লাইটে, রেডিও চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এই যন্ত্রের বহির্ভাগে দস্তার চোঙ ঋণাত্মক পাত্রের কাজ করে। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড, কয়লার গুড়া ও সামান্য জল মিশাইয়া একটি লেই করিয়া উহাকে কাপড়ের থলিতে মুড়িয়া পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। একটি কারবন দণ্ড লেই-এর মাঝখানে রাখা হয়। উহা ধনাত্মক পাতের কাজ করে। থলির চারিদিকে করাতের গুড়া, সামান্য অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও জিঙ্ক ক্লোরাইডের দ্রবণ থাকে। কারণ সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় এই কোষ কাজ করে না। কোষের উপরিভাগ অন্তরক যথা পিচ, মোম দ্বারা বন্ধ থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন গ্যাস বাহির হইবার জন্য উপরে একটি ছিদ্র থাকে। কাপড়ের ছিদ্রের মধ্য দিয়া অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দস্তার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করে।



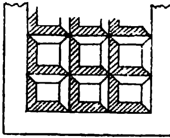
চিত্র 45 : নির্জল কোষ।

40. সঞ্চয়ক কোষ (Accumulator or Storage Cell) ঃ উপরোক্ত কোষগুলিতে রাসায়নিক ক্রিয়া যতক্ষণ চলে ততক্ষণ প্রবাহ পাওয়া যায়। পদার্থগুলির ক্রিয়া শেষ হইলে উহাদিগকে ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া পদার্থ দিতে হয়। সেইজন্য এই সব কোষে খরচ বেশী হয়। উহাদিগকে **প্রাথমিক কোষ** (Primary Cell) বলে।

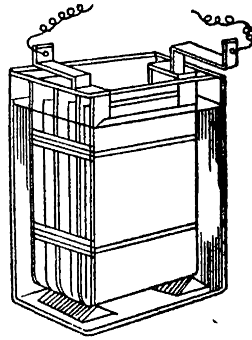
পেট্রোল এঞ্জিনে, জাহাজে, ট্রেণে নানাবিধ কাজের জন্য মাঝে মাঝে

কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োজন হয়। এই সব কাজের জন্য ডায়নামো বা বিদ্যুৎকোষ ব্যবহার করিলে খরচ বেশী পড়ে।

এই সব কাজের জন্য এক রকম কোষ ব্যবহার করা হয়। উহাদিগকে **সঞ্চয়ক কোষ** বলে। এই কোষগুলির বিশেষত্ব এই যে উহাদের ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইলেও রাসায়নিক পদার্থগুলিকে কার্যক্ষম করিবার জন্য বাহির হইতে বিদ্যুৎ পাঠানো হয়। সাধারণতঃ ডায়নামো হইতে



চিত্র 46 : সঞ্চয়ক কোষের ঝাঁঝরা।

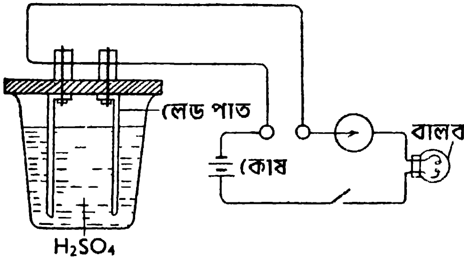


চিত্র 47 : সঞ্চয়ক কোষ।

উৎপন্ন বিদ্যুৎ উহাদের ভিতর দিয়া প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা পাঠানো হয়। এই পদ্ধতিকে কোষের **আহিতকরণ** (Charging) বলে। এইরূপে বিদ্যুৎশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। 1859 খৃস্টাব্দে প্ল্যাণ্ট (Plante) এই কোষ আবিষ্কার করেন। একই রাসায়নিক পদার্থ না ফেলিয়া বার বার ব্যবহার করা চলে।

কোষের বিবরণ ও কার্য প্রণালী : পুরু কাচের পাত্রে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের (চারভাগ জল ও একভাগ অ্যাসিড) মধ্যে কতকগুলি সীসার পাত সমান্তরালে ডুবানো থাকে। পাতগুলি ঝাঁঝরার মত জালি করিয়া ঝাঁঝরার ফাঁকের মধ্যে লিথার্জ (PbO) কিংবা রেড লেড (Pb_3O_4) গাদা করা থাকে। দুই প্রান্তের দুইটি সীসার পাতকে তার দিয়া ডাইনামোর অ্যানোডের ও ক্যাথোডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে কোষ আহিত হয়। আহিতকরণের সময় সালফিউরিক অ্যাসিড বিশ্লিষ্ট হইয়া SO_4^{--} ও $2H^+$ আয়নে পরিণত হয়। SO_4^{--} আয়ন ধনাত্মক দ্বারে বিদ্যুৎ-মুক্ত হইয়া SO_4 মূলকে পরিণত হয়। SO_4 মূলক লেড অক্সাইডকে লেড পারক্সাইডে (PbO_2) পরিণত করে। উহা সঞ্চয়ক কোষের ধনাত্মক মেরু হয়।

H আয়ন ঋণাত্মক দ্বারে বিদ্যুৎ-মুক্ত হইয়া H_2 অণুতে পরিণত হয়। উহা লেড্ অক্সাইডকে বিজারিত করিয়া ধাতব লেডে পরিণত করে। উহা সঞ্চয়ক কোষের ঋণাত্মক মেরু হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় কোষে বিদ্যুৎ সঞ্চার হয়। আহিতকরণের পর এই দুই মেরু তার দিয়া যোগ করিলে বিপরীত মুখে অর্থাৎ পারক্সাইড পাত হইতে লেডের পাতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় লেড ও লেড পারক্সাইড ক্রিয়া করিয়া লেড সালফেট ও জল উৎপন্ন হয়। জল অ্যাসিডকে পাতলা করে, এই সময় প্রবাহ কমে এবং উহা discharged হয়। উহাকে তখন পুনরায় আহিত করিতে হয়। অ্যাসিডের ঘনাঙ্ক 1·12 হইতে 1·31 এর মধ্যে রাখিতে হয় এবং বিদ্যুচ্চালক বলকে 2 ভোল্টের মধ্যে রাখিতে হয়। কোষের দুই মেরু কখনও তার দিয়া যুক্ত করিবে না।



চিত্র 48 : সঞ্চয়ক কোষের নীতি।

41. কোষের সমবায় : একটি কোষ হইতে কম বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সেইজন্য কতকগুলি একই রকমের কোষ পরস্পর যুক্ত করিয়া বর্তনীতে রাখিলে বিদ্যুচ্চালক বল বৃদ্ধি পায়। এইরূপ কোষের সমবায়কে ব্যাটারি বলে। এইরূপ কোষগুলিকে যুক্ত করিবার প্রণালী দুই রকম :

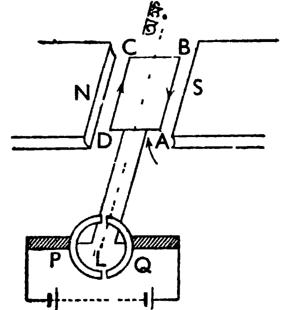
শ্রেণী সমবায় (in series) : এই সমবায়ে একটির + মেরু অপরটির —মেরুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

সমান্তরাল সমবায় (in parallel) : সব কোষের + মেরু এক বিন্দুতে যুক্ত হয় এবং—মেরু অপর এক বিন্দুতে যুক্ত হয়।

42. শক্তিরূপে বিদ্যুৎ (Electricity as energy) :

মোটর (Motors) : এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। বারলো চক্রে বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা চক্রকে ঘোরানো হয়। মোটরের নীতি এইরূপ। দুইটি শক্তিশালী চুম্বক-মেরুর মধ্যে একটি তারের কুণ্ডলী রাখিয়া এই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে কুণ্ডলী ঘুরিতে থাকে। কুণ্ডলীকে **আর্মেচার** (armature) বলে।

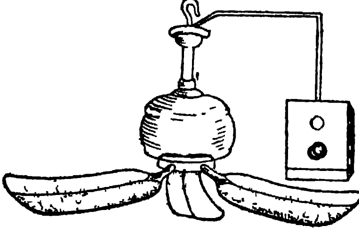
চিত্রে ABCD আর্মেচার কুণ্ডলী। আর্মেচার LL′ অক্ষের চারিদিকে ঘুরিতে পারে। আর্মেচার কুণ্ডলীর প্রান্তদ্বয়ে দুইটি অর্ধ বলয় (half ring commutator) P ও Q থাকে। বলয়ের উপর কারবন ব্রাশ চাপানো থাকে। কারবন ব্রাশ বিদ্যুৎ-উৎসর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। মনে কর বিদ্যুৎ DCBA অভিমুখে যাইতেছে এবং কুণ্ডলী অনুভূমিক অবস্থায় আছে। এই অবস্থায় উৎসর ধনাত্মক মেরু P বলয়ের সঙ্গে এবং ঋণাত্মক মেরু Q বলয়ের সঙ্গে যুক্ত আছে। বিদ্যুৎবাহী আর্মেচার চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত বলিয়া ফ্লেমিং-এর বাম'হস্ত নিয়মানুসারে AB বাহু উর্ধ্বমুখী বল এবং CD বাহু নিম্নমুখী বল অনুভব করে, কারণ দুই বাহুতে বিদ্যুতের প্রবাহ বিপরীতমুখী। CB ও AD বাহু কোন বল অনুভব করে না কারণ উহাদের বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিমুখের দিকে দুই বল দ্বন্দের (couple) ন্যায় ক্রিয়া করিয়া আর্মেচারকে একই দিকে ঘুরায়। দুইটি বলয়ের ছেদ রেখা (line of separation) আর্মেচারের তলের উপর অভিলম্ব হয়।



চিত্র 49 : মোটরের নীতি।

যখন আর্মেচার উল্লম্ব (vertical) অবস্থায় আসে তখন অর্ধবলয়ের সাহায্যে আর্মেচারে বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। প্রত্যেক বলয় একটি ব্রাশ ত্যাগ করিয়া অপর ব্রাশ স্পর্শ করে। সুতরাং বিদ্যুৎ উৎসর ধনাত্মক মেরু Q বলয়ের এবং ঋণাত্মক মেরু P বলয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। সুতরাং আর্মেচারে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ আর্মেচারে বিদ্যুৎ ABCD অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সুতরাং AB ও CD তারের উপর যান্ত্রিক বলের অভিমুখ উল্টাইয়া যায়। ফলে আর্মেচার একই দিকে ঘুরিতে থাকে। এইরূপ যখনই আর্মেচার উল্লম্ব অবস্থায় আসে তখনই অর্ধ বলয়ের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ পরিবর্তিত হইয়া আর্মেচারকে একই দিকে ঘোরায়। আর্মেচারের দণ্ডের সঙ্গে পাখার ফলক কিংবা ট্রাম ও ট্রেনের গাড়ীর চাকা বা কলের চাকার যোগ সাধন করা হইলে পাখা, ট্রাম, ট্রেন ও কল চলে। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়াইয়া বা শক্তিশালী চুম্বক ব্যবহার করিয়া আর্মেচারকে প্রবলভাবে ঘোরানো যায়।

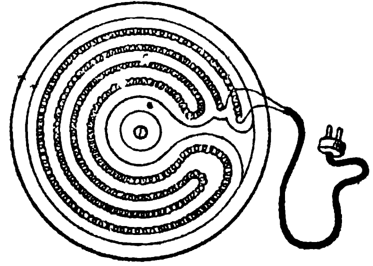
বেগ নিয়ামক (Regulator) দিয়া পাখার বা চাকার গতি বাড়ানো বা কমানো যায়। বেগ নিয়ামকে রোধ তারের (resistance wire) দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া বা কমাইয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা কমানো বা বাড়ানো যায়। পাখা জোরে চালাইবার সময় বিদ্যুৎ সোজা পাখার মোটরের আর্মেচারে যায়। নিয়ামকে একটি রোধ কুণ্ডলী থাকে। বাহির হইতে একটি হাতল ঘুরাইলে পাখার সঙ্গে রোধ কুণ্ডলীর বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। ইহাতে কুণ্ডলীর তারের দৈর্ঘ্য কম বেশী হয়।



চিত্র 50 : পাখা ও বেগ নিয়ামক।

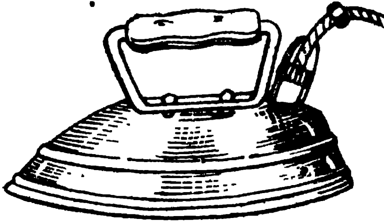
43. তাপ শক্তি ও আলোক শক্তিরূপে বিদ্যুৎ :

বৈদ্যুতিক তাপ যন্ত্র : আমরা দেখিয়াছি উচ্চ রোধ বিশিষ্ট খুব সরু তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে তাপ ও আলো উদ্ভূত হয়। এই উদ্ভূত তাপ কাজে লাগাইয়া বৈদ্যুতিক কেটলি, ইস্ত্রি, হিটার, তাপ বিকিরক (heat radiator), বৈদ্যুতিক চুল্লী (furnace) প্রভৃতি আবশ্যকীয় যন্ত্র প্রস্তুত হয়। তার এরূপ উপাদানের হওয়া উচিত যাহা তাপে না গলে। নিকেল, ক্রোমিয়াম ও লোহা মিশাইয়া এক প্রকার সংকর ধাতু প্রস্তুত হয়। উহাকে **নাইক্রোম** (Nichrome) বলে। উহার রোধ খুব বেশী। উহা উচ্চ উষ্ণতায় গলে না বা জারিত হয় না। এই সকল যন্ত্রে তাপসহ দ্রব্যের যেমন অভ্র বা চীনামাটির কাঠামোর উপর নাইক্রোম তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করানো হয়। আবার চীনামাটি ও অভ্র বিদ্যুৎ অন্তরক। কুণ্ডলীর সহিত যন্ত্রগুলির ধাতব অংশের সংযোগ থাকে না। কোনও কারণে অন্তরক নষ্ট হইলে শক (shock) খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে কুণ্ডলী একটি লোহার আবরণের মধ্যে থাকে। এই আবরণটি গরম হইলে উহা কাপড় জামার উপর দিয়া ঘষিতে হয়। তাপ বিকিরকে অবতল দর্পণের কেন্দ্রে

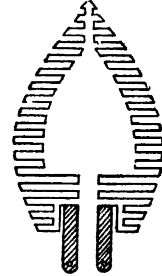


চিত্র 51 : হিটার।

নাইক্রোমের কুণ্ডলী থাকে। অবতল দর্পণের দ্বারা তাপরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়। বৈদ্যুতিক ফিউজে (fuse) টিন ও সীসার সংকর ধাতুর ছোট ফিউজ তার

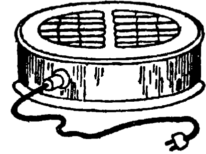


চিত্র 52 : ইস্ত্রি।



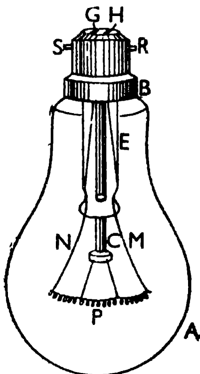
চিত্র 53 : নাইক্রোমের কুণ্ডলী।

থাকে। উহার গলনাঙ্ক কম কিন্তু রোধ বেশী। উহা বাক্সের মধ্যে বর্তনীতে যোগ করা থাকে। কোনও কারণে বর্তনীতে প্রবাহ-মাত্রা বাড়িলে অধিক উষ্ণতার জন্য উহা গলিয়া যায়। প্রবাহ ছিন্ন হয়। উহার ফলে অনেক দুর্ঘটনা এড়ান যায়। ডিনামাইটের মধ্যে সরু প্লাটিনাম তারের ফিউজ রাখিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে উহা ফাটিয়া যায়। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সিলিকা নলের গায়ে নাইক্রোমের তার জড়ানো থাকে। উহার উষ্ণতা 1500—2500°C হয়।



চিত্র 54 : স্টোভ।

প্রত্যেক যন্ত্রের রোধ তারের দুই প্রান্ত প্লাগের (plug) সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্লাগটি সুইচের গর্তে বসাইয়া সুইচ চালু করিতে হয়।

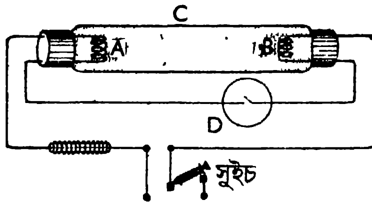


চিত্র 55 : বৈদ্যুতিক ল্যাম্প।

বৈদ্যুতিক আলো : উচ্চ গলনাঙ্ক ও রোধ বিশিষ্ট সরু ও দীর্ঘ তারের মধ্য দিয়া অধিক মাত্রায় বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠাইলে তারটি এত উত্তপ্ত হয় যে উহা শেষে ভাস্বর হইয়া আলো বিকিরণ করে। সরু তারকে তন্তু (filament) বলে। বায়ুশূন্য কাচের বালবের মধ্যে টাংস্টেন, ট্যান্টালাম বা ওসরামের (ওস্‌মিয়াম ও উলফ্রামের সংকর ধাতু) তন্তু ব্যবহার করা হয়। উহাদের গলনাঙ্ক খুব উচ্চ (3500°C)। আজকাল বালবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আরগন, নিয়ন) ভর্তি থাকে। বালবের মুখে ধাতব

টুপির মধ্যে প্রবিষ্ট কাচদণ্ডের শেষে দুইটি মোটা তামার তার ঝাল দেওয়া থাকে। তার দুইটি টুপিকে স্পর্শ করে না। মোটা তারের উপর প্রান্তে দুইটি পিতলের চাকতি ঝাল দেওয়া থাকে। তামার তারের নীচের প্রান্তে একটি সরু তারের কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত যোগ করা থাকে। বালবের টুপি বাতি ঘরের (socket) মধ্যে বসাইলে লাইনের তারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়।

44. ফ্লুওরেসেণ্ট বাতি (Fluorescent lamp) : অল্পকাল হইল ফ্লুওরেসেণ্ট বাতির বহুল প্রচলন হইয়াছে। উহার আলোতে কম ছায়া উৎপন্ন হয় এবং উহার আলো চোখে ধাঁধাঁর (glare) সৃষ্টি করে না বলিয়া কারখানায়, স্কুলে, কলেজে, হাঁসপাতালে, রেলষ্টেশনে ও বড় বড় রাস্তার মোড়ে উহা ব্যবহৃত হইতেছে। অনেক গৃহস্থ বাড়ীতেও উহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। কারণ উহা হইতে সাধারণ বৈদ্যুতিক বালব অপেক্ষা তিনগুণ আলো পাওয়া যায়। বালবটিও টেকসই হয় এবং উহাতে খরচ কম পড়ে।



চিত্র 56 : ফ্লুওরেসেণ্ট বাতি।

এই বালব একটি দীর্ঘ কাচের নল। উহার ভিতর একটু পারদ রাখিয়া ইহার দুই মুখ বন্ধ করা হয়। উহাতে বায়ুর পরিবর্তে স্বল্প পরিমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আরগন বা নাইট্রোজেন রাখা হয়, যাহাতে নলের ভিতরে গ্যাসের চাপ কম থাকে। নলের দুই প্রান্তে দুই বিদ্যুৎ-দ্বার প্রবেশ করানো থাকে। নলের ভিতর গায়ে ফ্লুওরেসেণ্ট পদার্থের প্রলেপ দেওয়া থাকে। বিদ্যুৎ-দ্বারের সঙ্গে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্লাগের সংযোগ করা হইলে বিদ্যুৎ গ্যাসের ইলেক্‌ট্রোনের সাহায্যে প্রবাহিত হয় এবং বিদ্যুৎমোক্ষণের ফলে আলোর উৎপত্তি হয়। নলের ফ্লুওরেসেণ্ট পদার্থের উপর আলো পড়িলে উহা নানা বর্ণের আলোকে পরিণত হয়।

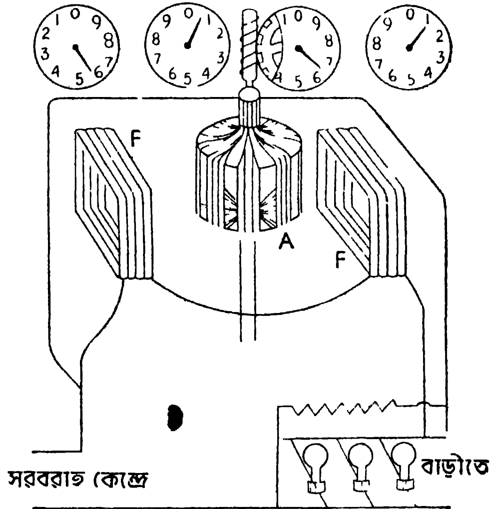
45. বিদ্যুৎ শক্তির একক (Units of electric energy) : বিদ্যুৎ শক্তির সরবরাহের হারকে **ক্ষমতা** (power) বলে। ক্ষমতা মাপিবার একককে **ওয়াট** (watt) বলে। বিদ্যুচ্চালক বলের ও প্রবাহ মাত্রার একককে যথাক্রমে **ভোল্ট** (volt) ও **অ্যাম্পিয়ার** (ampere) বলে।

এক ওয়াট = এক ভোল্ট × এক অ্যাম্পিয়ার।

যদি কোন তারে দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব-পার্থক্য এক ভোল্ট হয় এবং উহার ভিতর যদি এক সেকেণ্ডে এক অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ যায় তবে এক ওয়াট ক্ষমতা পাওয়া যায়। 1 কিলোওয়াট = 1000 ওয়াট। বৈদ্যুতিক বালবের গায়ে 200 V. 60W লেখা থাকে। উহার অর্থ হইল যে বালবে 220 ভোল্টের V বিদ্যুচ্চালক বলের প্রয়োগ হইলে উহাতে প্রতি সেকেণ্ডে 60 ওয়াট শক্তি খরচ হয়। উহাতে $\frac{60}{200}=\frac{3}{10}$ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ দরকার।

কিলোওয়াট ঘণ্টা (Kilowatt hour) : এক ঘণ্টা যাবৎ এক কিলো-ওয়াট শক্তি খরচ হইলে মোট শক্তিকে কিলোওয়াট ঘণ্টা শক্তি বলে। উহাই বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারিক একক। উহাকে সাধারণ কথায় ইউনিট (unit) বলে।

46. বিদ্যুৎ মিটার : মিটার নামক যন্ত্র দ্বারা কোন গৃহে বা কারখানায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি মাপা হয়। লাইন তার হইতে দুইটি শাখা তার গৃহস্থ বাড়ীতে মিটারে যুক্ত করা থাকে। একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় মোট ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ মাপা হয়। ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী উহা হইতে জানিতে পারে যে বাড়ীতে মোট কত বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হইয়াছে। এই যন্ত্রে একটি আর্মেচার বিদ্যুৎ-বাহী দুই কুণ্ডলীর মধ্যে বসানো থাকে। আর্মে-চারের আবর্তনের



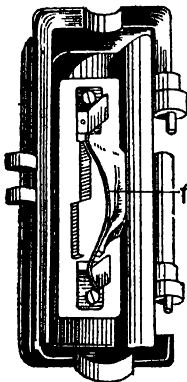
চিত্র 57 : বৈদ্যুতিক মিটার।

বেগের হার ব্যয়িত শক্তির হারের সমান হয়। আর্মেচারের আবর্তনের সঙ্গে কয়েকটি সূচক (pointer) মিটারের অংশাঙ্কিত চাকার উপর ঘুরিয়া থাকে। চাকার ইউনিটের অঙ্ক দেখিয়া মোট শক্তির হিসাব করা হয়। এক কিলোওয়াট ঘণ্টার একটি দর নির্দিষ্ট থাকে ; এই দর হইতে মোট ব্যয়িত শক্তির হিসাব করা হয়।

দশটি 100 ওয়াট বাতি দশ ঘণ্টা জ্বলিলে মোট কিলোওয়াট ঘণ্টা $=\frac{10\times100\times10}{1000}=10$ ∴ 10 ইউনিট শক্তি ব্যয় হয়। যদি প্রতি ইউনিটের দর 30 নয়া পয়সা হয় তবে মোট দর 3 টাকা হইবে।

47. গৃহে বিদ্যুৎ বর্তনী: প্রত্যেক বাড়ীতে ইলেকট্রিক কোম্পানীর একটি মেনস (mains) ও সুইচ থাকে। মেনস্ হইতে কোম্পানীর মেন ফিউজের ভিতর দিয়া দুইটি অন্তরিত তার শ্রেণীতে মিটারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। দুইটি তারকে বিতরণ (distribution) ফিউজ বোর্ডের ভিতর দিয়া প্রত্যেক ঘরে লইয়া আলো ও পাখার সহিত সমান্তরালে যোগ করা হয়। এই অবস্থায় সুবিধা এই যে কোন জায়গার বর্তনী ছিন্ন হইলে বাকী বর্তনী ঠিক থাকে। লাইনে দুইটি ফিউজ (fuse) থাকে, একটি প্রধান ফিউজ আর প্রত্যেক পাখার ও আলোর পৃথক ফিউজ।

48. ফিউজ: ফিউজ বিদ্যুৎ ব্যবহারের পক্ষে একটি আবশ্যকীয় যন্ত্র। ইহা অনেক বিপদ ও দুর্ঘটনা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। যদি কোনও কারণে দুইটি তার পরস্পর স্পর্শ করে যাহাতে লাইনের রোধ কমিয়া যায়, তবে লাইন দিয়া বর্তনীর ক্ষমতার অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। তারের এইরূপ সংযোগকে short circuit বলে। উহাতে উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে পারে। এই দুর্ঘটনা এড়াইবার জন্য 'ফিউজ' তার ব্যবহার করা হয়। এই তার সীসা ও টিন মিশ্রিত সংকর ধাতু দ্বারা নির্মিত। উহার বিশেষত্ব এই যে উহা কম উষ্ণতায় গলিয়া যায়। উহার রোধ খুব বেশী। যদি কখনও short circuit হয় তবে ফিউজ তার পূর্বেই গলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বর্তনী ছিন্ন হয় এবং আলো নিবিয়া যায় কিন্তু লাইন নষ্ট হয় না। ফিউজ তার একটি পোর্সিলিনের খাপের মধ্যে ভরা থাকে। খাপটি একটি বাক্সে আটকানো থাকে।



চিত্র 58 : ফিউজ তার।

49. বার্তাবহ বিদ্যুৎ (Electricity for communication): বিদ্যুৎশক্তি ও টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের পূর্বে সংবাদ আদান-

প্রদানের প্রণালী খুব সময় সাপেক্ষ ছিল। এখন বিদ্যুৎকে কাজে লাগাইয়া সংবাদের দ্রুত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সংবাদ তারের মধ্য দিয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন মারফত কিংবা বেতারে রেডিও, টেলিপ্রিণ্টার মারফত পাঠান হয়। বিদ্যুৎ তারে বা বেতারে আলোর ন্যায় সেকেণ্ডে প্রায় 300 হাজার কিলোমিটার বেগে চলে। সংবাদ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে বহুদূরের বক্তার বা সংবাদদাতার বা কোন ঘটনার ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের মারফত সংকেত (signal) দ্বারা সংবাদ পাঠাইলে তাহাকে **টেলিগ্রাফ** বলে। তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের সাহায্যে কণ্ঠস্বর পাঠাইলে তাহাকে **টেলিফোন** বলে। বেতারে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে সঙ্কেত ও কণ্ঠস্বর পাঠাইলে তাহাকে **রেডিও** বলে। বিদ্যুত তরঙ্গের সাহায্যে কণ্ঠস্বর সহ মনুষ্যমূর্তি বা কোন ঘটনার ছবি পাঠাইলে তাহাকে **টেলিভিশন** বলে।

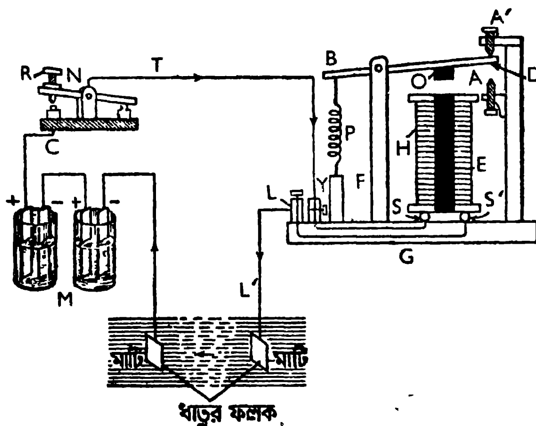
50. টেলিগ্রাফঃ এই যন্ত্র বিদ্যুতের চৌম্বকীয় ধর্মের উপর নির্ভর করে। 1845-50 খৃস্টাব্দের মধ্যে মোর্স (Morse) টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। বিপদ-আপদের সময়, জরুরী কাজের জন্য ও রেলগাড়ী চলাচলের সুবিধার জন্য সঙ্কেত দ্বারা দূরবর্তী স্থানের মধ্যে টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ করা হয়।

টেলিগ্রাফে প্রচুর তার, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কয়েকটি বিদ্যুৎ কোষ-বিশিষ্ট একটি ব্যাটারি M, শব্দ গ্রহণের গ্রাহক যন্ত্র G (receiver or Morse sounder) ও শব্দ পাঠাইবার জন্য দুইটি প্রেরক যন্ত্র (transmitter) C দরকার (চিত্রে একটি প্রেরক যন্ত্র দেখান হইয়াছে, চিত্র 59)।

গ্রাহক যন্ত্র G-তে একটি বিদ্যুচ্চুম্বক H থাকে। বিদ্যুচ্চুম্বকে একটি ফাঁপা কাঠের কাটিম H-এর উপর তুলার দ্বারা আবৃত তামার তার জড়ান থাকে। এই তারের দুই প্রান্ত S ও S´ বন্ধনীর সঙ্গে আটকানো আছে। কাটিমের ভিতরে একটি নরম লৌহদণ্ড আছে। F কাঠের থামের উপর একটি পিতলের দণ্ড B সংলগ্ন আছে। উহাতে এক টুকরা লৌহদণ্ড O লাগান আছে। উহার এক প্রান্তকে P স্প্রিং নীচের দিকে টানিয়া রাখে। অপর প্রান্তে দুইটি স্ক্রু A ও A´-এর মধ্যে নড়িয়া শব্দ করে।

বিদ্যুচ্চুম্বকের গায়ে জড়ান তারের S´ প্রান্ত L L´ তার দিয়া মাটিতে ধাতু ফলকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। প্রান্ত S খুব দীর্ঘ তার S Y T দিয়া পরবর্তী ষ্টেশনের প্রেরক যন্ত্রের চাবির এক প্রান্ত N-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। প্রেরক

যন্ত্রের চাবির অপর প্রান্ত C ব্যাটারি M-এর প্রথম কোষে ধনাত্মক মেরুর সহিত সংযুক্ত থাকে। ব্যাটারির সকলের শেষের কোষের ঋণাত্মক মেরু মাটির মধ্যে একটি ধাতব ফলকে সংযুক্ত থাকে। মাটি ভাল বিদ্যুৎ পরিবাহক বলিয়া মাটির মধ্য দিয়া বর্তনী সম্পূর্ণ হয়। মাটি একটি তারের কাজ করে। অন্য তারটি লম্বা লম্বা থামের সাহায্যে বা জলের তলা দিয়া (submarine cable) দূরবর্তী স্থানে লওয়া হয়।



চিত্র 59 : টেলিগ্রাফ যন্ত্রের নীতি।

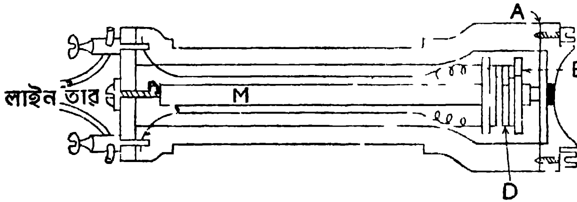
প্রেরক যন্ত্রের চাবি R টিপিলেই M ব্যাটারি হইতে বিদ্যুৎ শক্তি R, N, T, Y দিয়া বিদ্যুচ্চুম্বক E-তে প্রবেশ করে এবং বিদ্যুচ্চুম্বক হইতে S′ দিয়া বাহির হইয়া L L′ পথে গিয়া মাটির মধ্য দিয়া ব্যাটারিতে ফিরিয়া আসে। E-তে বিদ্যুৎ যাতায়াতে B পিতল-দণ্ডের লৌহ টুকরা O আকৃষ্ট হয় এবং D প্রান্ত A-তে টক্ করিয়া আওয়াজ করে। প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপিবার সময়ের অন্তরের উপর অক্ষরের সঙ্কেত নির্দেশ করে। অন্তর দীর্ঘ হইলে শব্দকে টক্কা —(dash) বলে, অন্তর কম হইলে শব্দকে টরে ● (dot) বলে। ইংরেজি বর্ণমালার 26টি অক্ষর টরে ও টক্কার বিভিন্ন মিলনে প্রকাশ করা হয়। যথা— প্রথম অক্ষর A একটি টরের পর একটি টক্কা। টক্কার সময়ের ব্যবধান টরের তিনগুণ।

গ্রাহক যন্ত্রে পর পর যে সব শব্দ শোনা যায় তাহা হইতে সংবাদের পাঠোদ্ধার করা হয়।

বহু দূরে তারের দৈর্ঘ্যের দরুণ বিদ্যুৎ ক্ষীণ হইয়া আসে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য লাইনের মাঝে রীলে (relay) যন্ত্র রাখা হয়। উহাতে একটি বিদ্যুচ্চুম্বক থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় উহা একটি লোহার পাতকে আকর্ষণ করায় লাইন তার আর একটি ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত হয়।

51. টেলিফোন: টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ফলে দূরবর্তী স্থানের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান সম্ভব হইল বটে কিন্তু বিজ্ঞানী তখন কি প্রকারে দূরবর্তী স্থানের মানুষের অবিকল কণ্ঠস্বর শোনা যায় তারই চেষ্টা শুরু করে। আলেকজাণ্ডার বেল কয়েক বৎসরের গবেষণার পর 1875 খৃস্টাব্দে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। বেল পদ্ধতিতে প্রেরক যন্ত্র (transmitter) ও গ্রাহক যন্ত্র (receiver) একই প্রকারের ছিল।

M একটি স্থায়ী চুম্বক। উহার একধারে একটি কাঠের ববিনের (bobbin) উপর সরু অন্তরিত (insulated) তার D কুণ্ডলীর আকারে জড়ানো থাকে। এই কুণ্ডলী তারের দুই প্রান্ত বাহিরের লাইন তারের সঙ্গে যুক্ত হয়। চুম্বকের এই প্রান্তের নিকটেই একটি নরম লোহার পাতলা পর্দা (diaphragm)

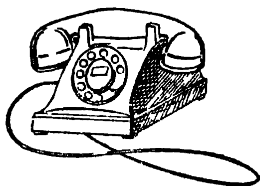


চিত্র 60 : টেলিফোন।

আছে। এইরূপ দুইটি যন্ত্র শ্রেণীতে দুইটি তার দিয়া যুক্ত করা হয়। যখন কেহ এই পর্দার সম্মুখে মুখ রাখিয়া কথা বলে তখন বায়ুতে শব্দ তরঙ্গ উত্থিত হয়। এই তরঙ্গ পর্দায় কম্পন সৃষ্টি করে। উহাতে চুম্বকের কুণ্ডলীর প্রান্ত হইতে পর্দার দূরত্ব কমবেশী হয়। ফলে চুম্বক হইতে নির্গত চৌম্বক বল রেখা যাহা D কুণ্ডলীকে ছেদ করে তাহার সংখ্যা কম-বেশী হয় এবং বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশের নিয়মানুসারে কুণ্ডলীতে একটি সাময়িক বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহ লাইন তারের ভিতর দিয়া গ্রাহক যন্ত্রে অনুরূপ কুণ্ডলীতে প্রবেশ করে। এই প্রবাহের তারতম্য অনুসারে গ্রাহক যন্ত্রে চুম্বক মেরু ও পর্দার মধ্যে পরিবর্তনশীল (fluctuating) চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা গ্রাহক যন্ত্রের পর্দা পর্যায়ক্রমে আকর্ষিত হয় ও পিছনে সরিয়া যায় অর্থাৎ

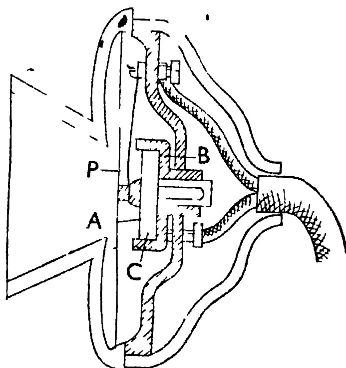
প্রেরকযন্ত্রের পর্দা যেভাবে কম্পিত হয় গ্রাহক যন্ত্রের পর্দাও সেইভাবে কম্পিত হয় গ্রাহক যন্ত্রের পর্দার এই কম্পন বায়ুতে অনুরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। এই তরঙ্গ শব্দের হুবহু পুনরাবৃত্তি করে।

টেলিফোন লাইনের তারগুলি একটি কেন্দ্রীয় অফিসের (Exchange) সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই অফিসের একজন লোক (operator) দুই ব্যক্তির টেলিফোনের সঙ্গে যোগ সাধন করিলে দুই ব্যক্তির মধ্যে কথাবার্তা হয়। আধুনিক ধরনের স্বয়ংক্রিয় (automatic) ব্যবস্থায় টেলিফোন যন্ত্রে একটি চাকতি (dial) ঘুরাইয়া দিলে আপনা-আপনি অপর ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। চাকতিতে 1 হইতে 9 ও O সংখ্যা চিহ্নিত থাকে।



চিত্র 61 : স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের ডায়াল।

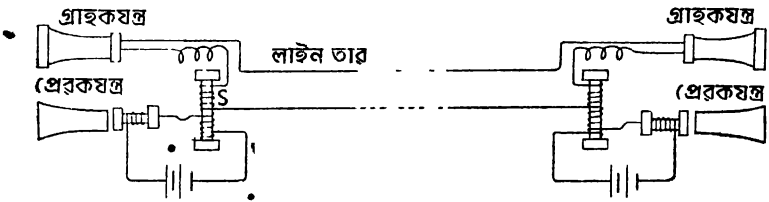
বেল টেলিফোনে স্পষ্ট সংবাদ খুব জোরালো নয় বলিয়া উহার দ্বারা দূরবর্তী স্থানের মধ্যে কথাবার্তা বলা সম্ভব হয় নাই। আধুনিক উন্নততর টেলিফোনে **কারবন মাইক্রোফোন** (carbon microphone) প্রেরক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়; এই যন্ত্রের দ্বারা বহু দূরবর্তী লোকের সঙ্গে স্পষ্ট কথাবার্তা হয়। উহা আবিষ্কার করেন টমাস আল্‌ভা এডিসন। এই যন্ত্রে দুইটি পালিশ করা কারবন পাতের A ও B-এর মধ্যে কারবনের দানা C আছে। A পাত একটি কারবন বোতামের সাহায্যে একটি ধাতুর পাতলা পর্দা P-এর সঙ্গে যুক্ত আছে। কারবন পাতের সঙ্গে দুইটি বন্ধনী স্ক্রু (binding screw T_1, T_2) জোড়া থাকে। ব্যাটারির দুই মেরু T_1 ও T_2 এর সঙ্গে যোগ করিলে কারবন দানার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে। কারবনের রোধ কারবন দানার চাপের উপর নির্ভর করে। P পর্দার সম্মুখে একটি ফানেলের মত যন্ত্রে



চিত্র 62 : কারবন মাইক্রোফোন।

(mouth piece) কথা বলিলে P পর্দা কাঁপে। পর্দা ভিতরে সরিয়া যাইলে কারবন দানার উপর চাপ বাড়ে। ফলে দানাগুলির রোধ কমিয়া যায়। পর্দা বাহিরের দিকে সরিয়া যাইলে দানার উপর চাপ কমে সেইজন্য দানার রোধ বাড়ে। এইরূপ রোধের পরিবর্তনের ফলে বর্তনীর প্রবাহের মাত্রাও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহ লাইন তারের মধ্য দিয়া গ্রাহক যন্ত্রে উপস্থিত হয় এবং গ্রাহক যন্ত্রের পর্দাকে প্রেরক যন্ত্রের পর্দার মত কাঁপাইতে থাকে। ইহাতে বায়ুমণ্ডলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হইয়া গ্রাহক যন্ত্রে শব্দের পুনরাবৃত্তি হয়। আধুনিক গ্রাহক যন্ত্রে বেল টেলিফোনের দণ্ড-চুম্বকের পরিবর্তে অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

52. টেলিফোন বর্তনী ঃ দুই ব্যক্তির মধ্যে টেলিফোন বর্তনীর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা 63 নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে প্রেরক যন্ত্র ও গ্রাহক যন্ত্র থাকে। যে কোন স্থানের প্রেরক যন্ত্রে কথা বলিলে



চিত্র 63 ঃ টেলিফোন বর্তনী।

বিদ্যুৎ-প্রবাহ লাইন তার দিয়া অপর স্থানের গ্রাহক যন্ত্রে হাজির হয় এবং গ্রাহক যন্ত্রে কান রাখিলে শব্দ শোনা যায়। আধুনিক টেলিফোনে গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র একই আধারে এমনভাবে রাখা হয় যে একই সময়ে প্রেরক যন্ত্রে মুখে কথা বলা যায় এবং গ্রাহক যন্ত্রে কানে কথা শোনা যায়।

অনুশীলনী

1. একটি চুম্বক-শলাকা একটি দণ্ডের উপর অবস্থিত আছে। একটি বিদ্যুৎবাহী তার যদি শলাকার অক্ষ বরাবর রাখা হয় তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শলাকা কোন্ অবস্থানে থাকিবে?

(i) তারটি শলাকার উপর, (ii) তারটি শলাকার নীচে, (iii) বিদ্যুৎ প্রবাহের অভিমুখ বদলাইলে।

2. চুম্বকের বিক্ষেপের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর।

3. বিদ্যুচ্চুম্বক কাহাকে বলে? বিদ্যুচ্চুম্বক বর্ণনা কর।

4. ফ্লেমিং-এর দক্ষিণ হস্ত নিয়ম কি ব্যাখ্যা কর।

5. বার্লো চক্র বর্ণনা কর। এই পরীক্ষা কি বিষয় প্রমাণ করে?

6. আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ কাহাকে বলে? একটি চুম্বক ও বিদ্যুৎবাহী বর্তনী দ্বারা আবিষ্ট বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন করিবে পরীক্ষা দ্বারা বর্ণনা কর।

7. বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কিত নিয়মগুলি বল। উপযুক্ত পরীক্ষা দ্বারা নিয়মগুলি ব্যাখ্যা কর।

8. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির সম্পর্কে টীকা লিখ:

(i) বৈদ্যুতিক বাতি, (ii) ফিউজ তার, (iii) মোটর, (iv) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি।

9. নিম্নলিখিত কোষগুলির বিবরণ দাও:—

(i) লেকল্যান্স কোষ (ii) নির্জল কোষ (iii) ড্যানিয়েল কোষ।

10. সঞ্চয়ক কোষের নীতি ব্যাখ্যা কর। কোষ বর্ণনা কর।

11. মোটরের মূল নীতি ব্যাখ্যা কর।

12. নিম্নলিখিত কার্যের জন্য কোন কোষ উপযোগী:—

(i) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজাইবার জন্য, (ii) সাইকেলের আলো জ্বালিবার জন্য, (iii) ঘর আলোকিত করিবার জন্য।

13. বিদ্যুৎ-প্রবাহে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা সরল পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

14. পরিষ্কার চিত্রসহ টেলিগ্রাফের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

15. টেলিফোনের নীতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

16. কারবন মাইক্রোফোন বর্ণনা কর।

17. বিদ্যুৎবাহী তারের চৌম্বক ক্ষেত্রে অনবরত: ঘূর্ণনের ব্যবস্থা বর্ণনা কর।

18 **Recall Type:** ডানদিকের শূন্যস্থান পূরণ কর:—

(i) বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা উৎপন্ন চুম্বকের নাম —।

(ii) বৈদ্যুতিক প্রবাহের তাপীয় ফলের উদাহরণ —।

(iii) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা হইতে রক্ষাকারী যন্ত্রের নাম —।

19. **Completion Type:** ডান হাতের প্রথম তিনটি অঙ্গুলী পরস্পরের সহিত— (a) প্রসারিত করিলে যদি তর্জনী — (b) — অভিমুখে যায় —

(c) পরিবাহীর — (d) হয় তবে মধ্যমা — (e) প্রবাহের অভিমুখী হয়। উহাকে — (f) এর — ডান হস্ত — (g) বলে।

—(a), — (b), — (c), — (d), — (e), — (f), — (g)

Alternate Response Type :

20. (a) **True of False Type :** সত্য উক্তির গায়ে × দাও।

(i) বিদ্যুৎকোষে রাসায়নিক শক্তির পরিবর্তে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়।

(ii) টেলিফোন পদ্ধতিতে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশকে কাজে লাগানো হয়।

(iii) লেকল্যান্স কোষের ও নির্জল কোষের নীতি প্রায় একই রকমের।

(iv) বারলো চক্র বিদ্যুৎ-প্রবাহের উপর চুম্বকের ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত।

(b) **Yes or No Type :**

(i) বিদ্যুৎ প্রবাহ কি চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করিতে সক্ষম ?

(ii) সলিনয়েডে বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটিলে উহা কি চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে ?

(iii) চুম্বক কি বিদ্যুৎ প্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করে ?

21. Multiple Choice Type :

(i) দূরবর্তী স্থানের সহিত কথাবার্তা বলিবার জন্য কোন্ যন্ত্র উপযোগী ?
টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিভিসন।

(ii) বিদ্যুচ্চুম্বকীয় আবেশ কাহার আবিষ্কার :—
ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে, নিউটন।

(iii) বিদ্যুৎ-প্রবাহের তাপীয় ফলের প্রয়োগ কোন্‌টি ?
কারবন মাইক্রোফোন, হিটার, নির্জল কোষ, ফিউজ তার।

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু (Metal)

প্রথম পাঠ

ধাতু (Metal), সংকর ধাতু (Alloy)

53. ধাতুর পরিচয়ঃ পৃথিবীর যাবতীয় মৌলিক পদার্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ—**ধাতু** (Metals) ও **অধাতু** (Non-metals)। ধাতুর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—ধাতু সাধারণতঃ কঠিন, ভারী, শক্ত, চক্‌চক করে, আলোক প্রতিফলন করে, আঘাত করিলে গুড়া হয় না, এবং পাতে ও তারে পরিণত করা যায়। ধাতু তাপের ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী। ধাতুকে আঘাত করিলে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে। ধাতু খুব উচ্চ উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয়। ধাতুর অক্সাইড অ্যাসিডের সঙ্গে জল ও লবণ উৎপন্ন করে।

মানব সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার জড়িত। বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার অনুসারে মানব সভ্যতার ইতিহাসকে তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। বর্তমান যুগকে ইস্পাত যুগ বলা যায়। কারণ, বর্তমান যুগের কলকব্জা, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্র সবই ইস্পাতের তৈরী। অধিকাংশ ধাতু মাটির নীচে খনিতে পাওয়া যায়। লোহা, ম্যাগনেসিয়াম্, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা এই সকল ধাতুর কোনটিকেই বিশুদ্ধ অবস্থায় খনিতে পাওয়া যায় না। উহারা খনিতে যৌগিক অবস্থায় অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে। এইগুলিকে **খনিজ পদার্থ** (mineral) বলে। সব খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন করা আর্থিক দিক হইতে লাভজনক নহে। যে খনিজ হইতে সুলভে ও সহজে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তাহাকে **আকরিক** (ore) বলে। আকরিকে ধাতু সাধারণতঃ অক্সাইড, কারবনেট, সালফাইড প্রভৃতি রূপে থাকে। নিষ্কাশনের ব্যাপারে কোন্ আকরিকে কত ভাগ ধাতু থাকা প্রয়োজন তাহা ধাতুর বাজার দরের উপর নির্ভর করে। লোহা অপেক্ষা তামার দর অধিক। সেইজন্য লোহার আকরিকে (হিমাটাইট) 60—65% লোহা থাকা দরকার, কিন্তু তামার আকরিকে 4—5% তামা থাকিলেও চলে। আবার সোনার আকরিকে এক লক্ষ ভাগে একভাগ সোনা থাকিলেও সোনা নিষ্কাশন করা লাভজনক। সাধারণতঃ আকরিক হইতে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করা হয়ঃ—

(i) খনি হইতে আকরিক কাটিয়া বড় বড় স্তূপে উপরে তোলা হয়। এই

স্তূপকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ আকরিককে জলস্রোতে ধৌত করা হয় কিংবা জল ও তেলের মিশ্রণের সহিত বায়ু দ্বারা মন্থন করা হয়। এই ভাবে অনেক অশুদ্ধি দূরীভূত হয়।

সালফাইড, কারবনেট ও নাইট্রেট আকরিককে খুব উত্তপ্ত করিলে উহারা অক্সাইডে পরিণত হয়।

(ii) অনেক আকরিককে না গলাইয়া নিম্ন উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া উদ্বায়ী বস্তুকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়।

(iii) অক্সাইড আকরিককে বা উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত অক্সাইডকে কয়লা দ্বারা বিজারণ করা হয়।

(iv) অনেক ধাতুকে বিদ্যুৎ-বিশ্লেষণের দ্বারা আকরিক বা ঐ ধাতুর কোন যৌগিক হইতে পৃথক করা হয়।

(v) প্রত্যেক ধাতুকে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে হয়।

উত্তাপে আকরিক হইতে গলিত অবস্থায় ধাতুর নিষ্কাশনকে **বিগলন** (melting) বলে। আকরিকের অশুদ্ধিগুলি অন্য অতিরিক্ত পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া গলিত যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। উহাকে **ধাতুমল** (slag) বলে অতিরিক্ত অন্য পদার্থকে **বিগালক** (flux) বলে। অ্যাসিডিক অশুদ্ধিগুলিকে (বালি—SiO_2) ক্ষারীয় বিগালক (CaO, MgO) দ্বারা এবং ক্ষারীয় অশুদ্ধিগুলিকে (Fe_2O_3) অ্যাসিডিক বিগালক (SiO_2)দ্বারা দূর করা হয়।

54. লৌহ (Iron) :

পরিচয়ঃ লোহার আকরিক হইতে লোহা নিষ্কাশন করা কঠিন বলিয়া মানব সভ্যতায় লোহার ব্যবহার সোনা ও রূপার ব্যবহারের অনেক পরে প্রচলিত হয়। ভারতে লোহার ব্যবহার প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। দিল্লীতে 220 ফিট একখণ্ড লোহার স্তম্ভ হাজার বৎসরের ঝড় ও বৃষ্টিতে মরিচাহীন অবস্থায় আজও বিদ্যমান আছে। বর্তমান জগতে ইস্পাতের অবদান অতুলনীয়। সামান্য একটি সূঁচ হইতে যাবতীয় কল-কব্জা, রেল, পুল, জাহাজ, মটর গাড়ী, ট্যাঙ্ক, বন্দুক, কামান প্রভৃতি অসংখ্য জিনিষ ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হয়। ভারতে বর্তমানে পাঁচটি বিরাট লোহার কারখানা আছে—জামসেদপুর, বার্ণপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুর। ভারতে বর্তমানে বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টন লোহা উৎপন্ন হয়।

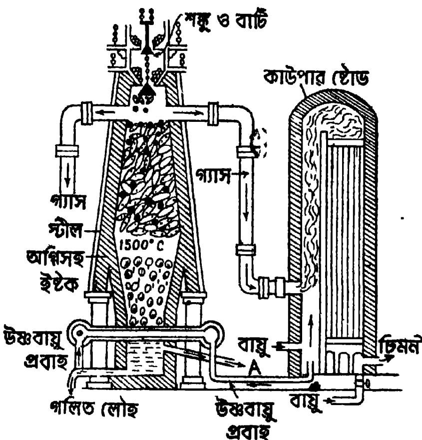
অবস্থান (Occurrence) ঃ যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাজ্যে, জাপানে, সোভিয়েট রাশিয়ায়, রূঢ় অঞ্চলে ও ভারতে প্রচুর লোহা আছে।

খনিতে লোহা প্রধানতঃ অক্সাইডরূপে অবস্থান করে। উহাদের মধ্যে ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4), হিমাটাইট (Fe_2O_3) হইতে লোহা নিষ্কাশন করা হয়। আয়রন কারবনেট ($FeCO_3$) হইতেও কিছু লোহা নিষ্কাশন করা হয়।

নিষ্কাশন (Extraction) ঃ লোহা নিষ্কাশনে দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় :—

(i) **ভস্মীকরণ (Calcination) ঃ** আকরিককে প্রথমে অল্প কয়লা সহ বায়ুতে উত্তাপের সাহায্যে ভস্মীভূত করা হয়। এই পদ্ধতিতে জলীয় বাষ্প ও কতকগুলি অশুদ্ধি উদ্বায়ী অক্সাইডরূপে চলিয়া যায়। আকরিক ঝামার মত ফোঁপরা হয়।

(ii) **বিজারণ (Reduction) ঃ** একটি প্রায় 100 ফুট উচ্চ বিরাট চুল্লীতে এই অক্সাইডকে বিজারিত করা হয়। চুল্লীর বহির্ভাগ ইস্পাতের ও অন্তর্ভাগ অগ্নিসহ ইটের তৈরি। চুল্লীর মুখে বাটি ও শঙ্কুর (cup and cone) ব্যবস্থা আছে। এই বাটিতে উক্ত আকরিক, কোক ও চুনাপাথরের ($CaCO_3$) মিশ্রণ ঢালিয়া দিলে চুল্লীর ভিতর উহা আপনা হইতে পড়িয়া যায়। এদিকে



চিত্র 64 ঃ মারুত চুল্লী।

চুল্লীর নীচের অংশে মোটা ও শক্ত নলের (tuyer) ভিতর দিয়া প্রবল চাপে উষ্ণ (800°C), শুষ্ক ও ধূলিমুক্ত বায়ু প্রবেশ করানো হয়। চুল্লীর ভিতরকার উষ্ণ গ্যাস চুল্লীর গলার নিকটস্থ নল দিয়া বাহির হইয়া কাউপার স্টোভে যায়। চুল্লীর ভিতর উষ্ণতা উপর (300°) হইতে নীচের দিকে বাড়িতে (1500°) থাকে। চুল্লীর মধ্যভাগে প্রশস্ততম অংশে (bosh)

উষ্ণতা প্রায় 1200°C হয়। গলিত লোহা চুল্লীর তলায় জমে, তার উপর অকেজো পদার্থগুলি চুনের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনে গাদ বা ধাতুমল (slag) রূপে ভাসে। চুল্লীর নীচের দিকে দুইটি ছিদ্র-পথের মধ্যে উপরেরটি দিয়া ধাতুমল এবং নীচের ছিদ্র-পথ দিয়া গলিত লোহাকে বালির ছাঁচে ঢালা হয়। চুল্লীর ভিতর ঝড়ের মত বায়ু ঢোকান হয় বলিয়া ইহাকে **মারুত চুল্লী** বা **ঝটিকা চুল্লী** (blast furnace) বলে (চিত্র 64)। ছিদ্র-পথ অন্য সময় ছিপি (plug) দিয়া বন্ধ করা থাকে।

রাসায়নিক ক্রিয়া : চুনাপাথর উত্তাপে বিশ্লিষ্ট হইয়া কারবন ডাই-অক্সাইড ও চুন উৎপন্ন করে। কারবন ডাই-অক্সাইড কারবন দ্বারা বিজারিত হইয়া কারবন মনক্সাইড উৎপন্ন করে। অবশ্য, চুল্লীর মধ্যে বায়ু ও কয়লার সংযোগেই ইহা প্রধানতঃ উৎপন্ন হয়। এই চুন, আকরিকের অশুদ্ধি, যথা বালির (SiO_2) সহিত যুক্ত হইয়া ধাতুমল গঠন করে। লোহার অক্সাইড কারবন ও কারবন মনক্সাইড দ্বারা বিজারিত হইয়া ধাতব লোহায় পরিণত হয়।



$$CaCO_3 = CaO + CO_2 \; ; \; C + O_2 = CO_2$$



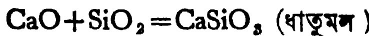
$$CO_2 + C = 2CO.$$



$$Fe_2O_3 + 3C = 2Fe + 3CO.$$



$$Fe_2O_3 + 3CO = 2Fe + 3CO_2$$



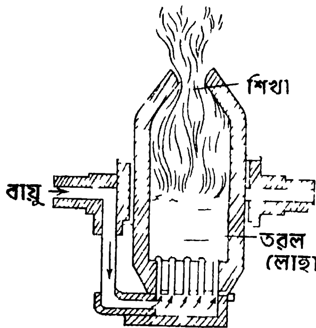
$$CaO + SiO_2 = CaSiO_3 \text{ (ধাতুমল)}$$

নির্গত গ্যাসে যথেষ্ট কারবন মনোক্সাইড থাকে। উহা দাহ্য গ্যাস। এই গ্যাসকে কাউপার স্টোভে ইটের জাফ্রিতে জ্বালানো হয়। উহাতে জাফ্রি অত্যন্ত উষ্ণ (700°—800°C) হয়। এই স্টোভের ভিতর দিয়া বায়ুকে গরম করিয়া চুল্লীতে পাম্প করা হয়। এইভাবে বায়ুকে গরম করার খরচ কমিয়া যায়। একটি চুল্লী একবার জ্বালিলে একাদিক্রমে 15—20 বৎসর চলিতে পারে। একটি চুল্লী হইতে সাধারণতঃ 24 ঘণ্টায় 1000 টন লোহা পাওয়া যায়।

লোহা তিন প্রকার : উপরোক্ত উপায়ে প্রস্তুত এই লোহাকে **ঢালাই** (Cast) লোহা বলে। উহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী 2 – 5% কারবন অশুদ্ধি থাকে। ঢালাই লোহার অশুদ্ধি বায়ু দ্বারা ও অকেজো Fe_2O_3 দ্বারা জারিত করিলে **পেটা** (wrought) লোহা পাওয়া যায়। উহাতে সর্বাপেক্ষা কম (0·12 – 0·25%) কারবন থাকে। **ইস্পাতের** (steel) ভিতর কারবনের পরিমাণ মাঝামাঝি (0·25 – 1·5%) থাকে।

ইস্পাত প্রস্তুত : (ক) অগ্নিসহ ইস্টক নির্মিত বাক্সে পেটা লোহার দণ্ডের সঙ্গে কাঠ কয়লার গুড়া দিয়া ঢাকিয়া বাক্সগুলিকে বন্ধ করিয়া কয়েক দিন লোহিত তাপে রাখিলে পেটা লোহা না গলিয়া ধীরে ধীরে কারবন শোষণ করিয়া ইস্পাতে পরিণত হয়।

(খ) ডিম্বাকৃতি বিসিমার চুল্লীতে গলিত ঢালাই লোহার মধ্য দিয়া বায়ুর ঝড় চালিত করিলে ঢালাই লোহার অশুদ্ধি জারিত হয়। ইহাতে স্পাইজেল (spiegel) নামক পদার্থ মিশাইয়া পুনরায় উষ্ণ করিলে ইস্পাত পাওয়া যায়। স্পাইজেল লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও কারবনের সংযোগে প্রস্তুত। স্পাইজেল উপযুক্ত পরিমাণ কারবন সরবরাহ করে। উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত এই চুল্লীর ভিতরের গায়ে পুরু আস্তরণ থাকে। ঢালাই লোহায় ফসফরাস অধিক থাকিলে ক্ষারকীয় পদার্থের (ডলোমাইটের) আস্তরণ এবং ফসফরাস কম থাকিলে অ্যাসিডিক পদার্থের (সিলিকার) আস্তরণ থাকে।



চিত্র 65 : বিসিমার চুল্লীতে ইস্পাত তৈরী।

চুল্লী দুইটি পিনের উপর ঝুলান অবস্থায় থাকে। ইহাকে ইচ্ছামত সোজা, কাত বা উপুড় করা যায়। নীচের ছিদ্র (ports) দিয়া বায়ু ঢোকান হয়।

ধর্ম: ভৌত ধর্ম : বিশুদ্ধ লোহা সাদা উজ্জ্বল ধাতু। উহার গলনাঙ্ক 1530°C। উহা প্রসার্যমান ও নমনীয়। উহা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) শুষ্ক বায়ু সাধারণ উষ্ণতায় লোহের উপর কোন ক্রিয়া করে না। আর্দ্র বায়ুতে লোহায় মরিচা পড়ে। অক্সিজেনে লোহাকে উত্তপ্ত করিলে লোহা জ্বলিয়া উঠে এবং স্ফুলিঙ্গ (ফুলঝুরিতে Fe_3O_4-এর কণা) বাহির হয়। (ii) বিশুদ্ধ লোহা সাধারণ উষ্ণতায় জলের সহিত কোন ক্রিয়া করে না, কিন্তু লোহিত তপ্ত (red hot) লোহা স্টীমকে বিশ্লিষ্ট করে। $4H_2O + 3Fe = Fe_3O_4 + 4H_2$। (iii) পাতলা সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে লোহা দ্রবীভূত হয়। (iv) লোহা কস্টিক সোডা দ্বারা আক্রান্ত হয় না। (v) ইহা উত্তপ্ত কারবন, সালফার ও ক্লোরিনের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। (vi) লোহাকে ধূমায়মান (fuming)

নাইট্রিক অ্যাসিডে রাখিলে উহা দ্রবীভূত হয় না, বরঞ্চ নিষ্ক্রিয় (Passive) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই লোহায় মরিচা পড়ে না।

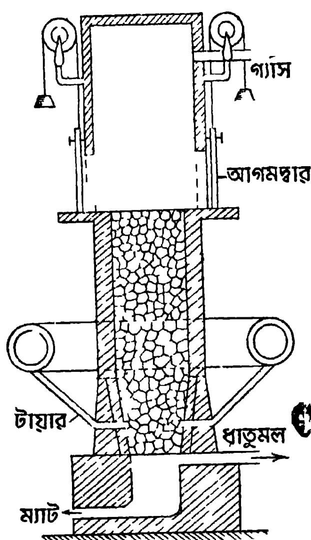
তিন প্রকার লৌহের ধর্ম ও ব্যবহার ঃ

ধর্ম	কাস্ট আয়রন	স্টীল	রট আয়রন
১। কারবন	2–5%	·25–1·5%	·12–·25%
২। গলনাঙ্ক	· 1200°C	1300°–1400°C	1500°C.
৩। ভঙ্গুরতা	শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর	শক্ত অভঙ্গুর, খুব স্থিতিস্থাপক	নরম ও নমনীয়, পিটিলে পাতে এবং টানিলে তারে পরিণত হয়
৪। গঠন	কেলাসিত	কেলাসিত	তন্তুময়
৫। উত্তাপে ও শৈত্যে কঠিন (tempering)	করা যায় না	করা যায়	করা যায় না
৬। ঝাল দেওয়া ও জোড়া লাগানো	যায় না	যায়	যায়
৭। স্থায়ী চৌম্বকত্ব	হয় না	হয়	হয় না
৮। ব্যবহার	ছাঁচে ঢালাই হয়। রট আয়রন ও স্টীল প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়, আলোক-স্তম্ভ, রেলিং ও নল প্রভৃতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।	রেল লাইন, গাড়ি, জাহাজ, কড়ি, যুদ্ধাস্ত্র, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।	তড়িৎ-চুম্বকের কোর, তার ও শিকল প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

55. তামা (Copper) :

অবস্থান : কানাডায়, সুইডেনে, উরাল পর্বতে, সাইবেরিয়ায়, ভারতে প্রাকৃতিক (natural) তামা পাওয়া যায়। পৃথিবীর উৎপন্ন তামার এক তৃতীয়াংশ কেবল যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। তামার প্রধান আকরিকের নাম **কপার পাইরাইটিস** (Copper pyrites—$CuFeS_2$)। ইহা ছাড়া বিভিন্ন কপার অক্সাইড আকরিক আছে। খুব অল্প পরিমাণ তামা অবিযুক্ত অবস্থায়ও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়।

নিষ্কাশন : (i) **ভাসন (Floatation) ও গাঢ়ীকরণ (Concentration)**। কপার পাইরাইটিস লোহা ও তামার সম্মিলিত সালফাইড। প্রথমে আকরিককে চূর্ণ করিয়া পাইন তেল ও জলের সহিত বায়ু দ্বারা মন্থন করা হয়। অল্প পরিমাণে সাবান ও জ্যান্থেট (Xanthate) নামে রাসায়নিক পদার্থও দেওয়া হয়। কপার সালফাইড ফেনার সঙ্গে ভাসিয়া উঠে। উহাকে শুকাইয়া লওয়া হয়। উহাতে 25-30% তামা থাকে। এই গাঢ় আকরিককে বহু কক্ষযুক্ত চুল্লীতে উষ্ণ বায়ু প্রবাহে উত্তপ্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক, জলীয় বাষ্প, কারবন ডাই-অক্সাইড অপসারিত হয়। কিছু সালফার অক্সাইডে (SO_2) পরিণত হয়। উহা সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এই আকরিকে প্রধানতঃ কপার সালফাইড, ফেরাস সালফাইড ও ফেরাস অক্সাইড থাকে। এই আকরিকের সহিত অল্প কোক, বালি ও চুন মিশাইয়া দীর্ঘ মারুত চুল্লীতে শুষ্ক ও উষ্ণ বায়ু স্রোতে পোড়ানো হয়। আকরিক মিশ্রণটি চুল্লীর উপর দিকে আগম দ্বার দিয়া ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং নল (tuyer) দিয়া উত্তপ্ত বায়ু চুল্লীতে প্রবেশ করানো হয়। কোক তাপ উৎপাদনে সাহায্য করে। লোহা অক্সাইডে পরিণত হয়, কিন্তু কপার সালফাইড প্রায় অবিকৃতই থাকে।



চিত্র 66 : কপার নিষ্কাশন।

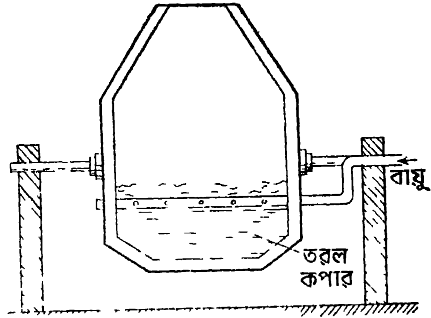
লোহার অক্সাইড বালির সহিত ধাতুমল গঠন করে। উহা হাল্‌কা বলিয়া গলিত কপার সালফাইডের উপর ভাসে।



$$2FeS + 3O_2 = 2FeO + 2SO_2 \; ; \; FeO + SiO_2 = FeSiO_3$$

নীচের স্তরে কপার সালফাইড থাকে। উহাকে ম্যাটে (matte) বলে। ম্যাটেতে 55% তামা থাকে।

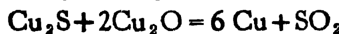
(ii) ম্যাটেকে সোজাসুজি ম্যাগনেসাইটের প্রলেপ যুক্ত বিসিমার চুল্লীতে লইয়া মাঝখানের ছিদ্রযুক্ত নল দিয়া উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত করা হয়। উহাতে পূর্ব হইতে সামান্য বালি মিশানো হয়। ম্যাটেতে যে বাকী লোহার সালফাইড থাকে তাহা প্রথমে অক্সাইডে পরিণত হয়। এই অক্সাইড সিলিকার সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধাতুমল গঠন করে। চুল্লীকে ইচ্ছামত কাত, উপুড় বা সোজা করা যায়। এইবার উহাকে কাত করিয়া ধাতুমল সরাইয়া পুনরায় সোজা করিয়া প্রবল উষ্ণ বায়ু-স্রোত পাঠানো হয়। ইহাতে কিছু কপার সালফাইড অক্সাইডে পরিণত হয়। দুই-তৃতীয়াংশ কপার সালফাইড অক্সাইডে পরিণত হইলে ঐ অক্সাইড অপরিবর্তিত সালফাইডের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া কপার উৎপন্ন করে। উদ্ভূত সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায়। ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে চুল্লীকে উপুড় করিয়া গলিত কপার বাহির করা হয়। এই প্রকার কপারের গায়ে ফোসকা (blister) পড়িয়া মৌচাকের মত দেখায়। উহাতে 98% কপার এবং অন্যান্য অশুদ্ধি থাকে।



চিত্র 67 : বিসিমার চুল্লীতে ম্যাটে হইতে কপার প্রস্তুত।



$$2\,Cu_2S + 3O_2 = 2Cu_2O + 2SO_2$$

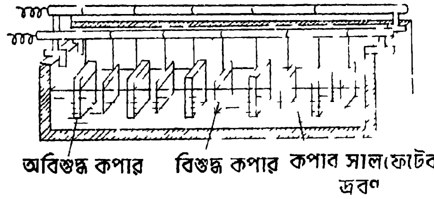


$$Cu_2S + 2Cu_2O = 6\,Cu + SO_2$$

শোধন (Purification) : এই কপারকে বালির লাইনযুক্ত পরাবর্ত চুল্লীতে পুনরায় উষ্ণ বায়ুস্রোত দ্বারা জারিত করা হয়। লোহার অক্সাইড ধাতুমল গঠন করে; কিছু কপারও জারিত হয়। গলিত কপারের উপর কিছু কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া একটি কাঁচা কাঠ (green pole) দিয়া নাড়া

হয়। এই প্রণালীতে কপার অক্সাইড বিজারিত হইয়া কপার উৎপন্ন করে। এই কপার 99·5% বিশুদ্ধ। সাধারণ কার্যের জন্য ইহা উপযুক্ত।

তড়িৎ-শোধন (Purification by Electrolysis)ঃ বিশুদ্ধ কপারের পাতকে কপার সালফেট দ্রবণে ক্যাথোড এবং অশুদ্ধ বা ব্লিষ্টার কপারকে



চিত্র ৬৪ : কপারের তড়িৎ শোধন।

অ্যানোড করা হয়। দ্রবণে কিছুটা সালফিউরিক এসিডও দেওয়া হয়। বিদ্যুৎ ঐ দ্রবণের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করিলে অ্যানোড হইতে চালিত হইয়া বিশুদ্ধ কপার ক্যাথোডে জমা হয়।

ধর্ম : ভৌত ধর্মঃ কপারের বর্ণ লাল। উহা নরম, ঘাতসহনশীল ও প্রসার্যমান, এবং বিদ্যুতের ও তাপের সুপরিবাহী।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) সাধারণ উষ্ণতায় উহার উপর শুষ্ক বায়ু কোন ক্রিয়া করে না। আর্দ্র বায়ু ধীরে ধীরে অক্সাইড উৎপন্ন করে। কপারকে বায়ুতে বা অক্সিজেনে উত্তপ্ত করিলে কপারের অক্সাইড উৎপন্ন হয়। $2\,Cu + O_2 = 2\,CuO$. (ii) জল বা স্টীম কপারের উপর কোন ক্রিয়া করে না। (iii) কপারের সঙ্গে পাতলা হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রিয়া করে না। গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড বায়ুর উপস্থিতিতে কপারের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া উহাদের লবণ উৎপন্ন করে। উষ্ণ ও গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড কপারের উপর ক্রিয়া করে। গাঢ় বা পাতলা নাইট্রিক অ্যাসিডে কপার দ্রবীভূত হয়।

ব্যবহার : কপার বিদ্যুতের ও তাপের সুপরিবাহী বলিয়া উহা বিদ্যুৎ শিল্পে, তাপ যন্ত্রে ও রন্ধনের পাত্রে ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুতবাহী তার মাত্রই কপারের তৈরী। উহা খুব টেকসই বলিয়া মুদ্রা ও সংকর ধাতু প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। কপারের সংকর ধাতু, যথা কাঁসা, পিতল খুব শক্ত বলিয়া বাসনপত্র

প্রস্তুতে এই সংকর ধাতু ব্যবহৃত হয়। কপার বিদ্যুৎলেপনে, অক্ষর প্রস্তুতে ও ছাঁচ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

56. অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium) :

অবস্থান : প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়ামের যৌগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ধাতুগুলির মধ্যে অ্যালুমিয়ামের পরিমাণই সবচেয়ে বেশী। সমস্ত মৌলিক পদার্থের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ চতুর্থ স্থান অধিকার করে। পূর্বে যৌগিক পদার্থ হইতে অ্যালুমিনিয়াম-নিষ্কাশন খুব কঠিন ছিল। উহার ব্যবহার জানা ছিল না। প্রায় একশত বৎসর পূর্বেও উহা এতই মূল্যবান ছিল যে উহা অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত।

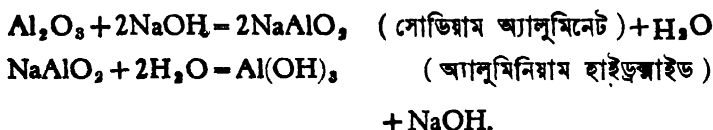
অ্যালুমিনিয়াম সাধারণতঃ অক্সাইড ও সিলিকেট রূপে পাওয়া যায়। অক্সাইডের (Al_2O_3) মধ্যে মরকত (emerald, সবুজ পাথর), নীলা (sapphire), কুরুবিন্দ (corrundum), চুনী (ruby, লাল পাথর), এমেরি (emery), **বক্সাইট** (Al_2O_3, $2H_2O$) প্রসিদ্ধ। সিলিকেটের মধ্যে অভ্র, ফেল্‌সপার, কেওলিন (Kaolin) প্রসিদ্ধ; অন্যান্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে ক্রায়োলাইট (Cryolite), অ্যালুনাইট প্রসিদ্ধ।

উপরি উক্ত সিলিকেট আকরিক হইতে এবং বক্সাইট ব্যতীত অন্যান্য অক্সাইড আকরিক হইতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করা খুবই অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য। একমাত্র বক্সাইট হইতেই এই ধাতু স্বল্প ব্যয়ে নিষ্কাশিত হয়। ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতে প্রচুর বক্সাইট পাওয়া যায়। অক্সাইড হইলেও বক্সাইট হইতে বিজারণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না। ভারতে মুরিতে অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে।

নিষ্কাশন : পরপর তিনটি পদ্ধতির সংযোগে বক্সাইট হইতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

(i) **বক্সাইট হইতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা** বা **অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড** (Al_2O_3) **প্রস্তুতি :** ভস্মীভূত ও চূর্ণ বক্সাইটকে বদ্ধ লোহার পাত্রে (autoclave) বর্ধিত চাপে 150°C উষ্ণতায় গাঢ় কস্টিক (45%) সোডার সঙ্গে ফুটানো হয়। সোডিয়াম অ্যালুমিনেট উৎপন্ন হইয়া দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণে জল মিশ্রিত করিয়া অদ্রাব্য অশুদ্ধিগুলি পরিস্রুত করিলে পরিস্রুত দ্রবণে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট থাকিয়া যায়। পরিস্রুতে সদ্য প্রস্তুত জলযুক্ত অ্যালুমিনা (hydrated alumina) দিয়া নাড়িলে অদ্রাব্য অ্যালুমিনিয়াম

হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। উহাকে পরিস্রুত ও শুষ্ক করিয়া উত্তাপ দিলে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনা পাওয়া যায়।



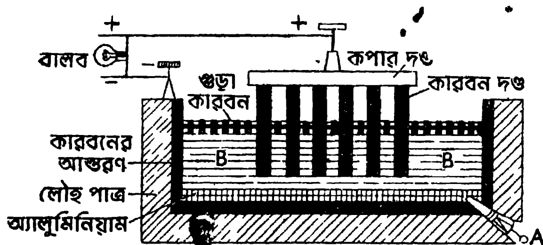
$Al_2O_3 + 2NaOH = 2NaAlO_2$ (সোডিয়াম অ্যালুমিনেট) $+ H_2O$

$NaAlO_2 + 2H_2O = Al(OH)_3$ (অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড) $+ NaOH.$



$$2Al(OH)_3 = Al_2O_3 + 3H_2O$$

(ii) **অ্যালুমিনার তড়িৎ-বিশ্লেষণ :** ভিতরে গ্রাফাইট (কারবন) প্রলেপযুক্ত লোহার বাক্সে ক্রায়োলাইট লইয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানো হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন প্রচণ্ড তাপে ক্রায়োলাইট গলিয়া যায়। তৎপরে উহার ভিতর অ্যালুমিনা চূর্ণ ও ফ্লোরস্পারের মিশ্রণ দেওয়া হয়। গলিত মিশ্রণে অ্যালুমিনা দ্রবীভূত হয়। গ্রাফাইট ক্যাথোডের কাজ করে এবং উপরের কপার দণ্ড হইতে দ্রবণে প্রলম্বিত গ্যাস-কারবন-দণ্ড অ্যানোডের কাজ করে। অ্যালুমিনা বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় : $2Al_2O_3 = 4Al + 3O_2$ ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অ্যালুমিনিয়াম তরল অবস্থায় বাক্সের তলায় জমা হয়। প্রয়োজনমত উহাকে একটি ছিদ্র (tap hole)



চিত্র 69 : অ্যালুমিনার তড়িৎ বিশ্লেষণ।

দিয়া বাহির করা হয়। এত উষ্ণতায় অ্যানোডে উৎপন্ন অক্সিজেন যাহাতে গ্রাফাইটকে না জারিত করে সেইজন্য গ্রাফাইটের উপর কোক চূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। অ্যালুমিনার পরিমাণ কমিয়া গেলে একটি বালব জ্বলিয়া উঠে। তখন পুনরায় বাক্সে অ্যালুমিনা যোগ করা হয়। উপরোক্ত অ্যালুমিনিয়াম 99% বিশুদ্ধ। (iii) বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ দ্বারা ইহা হইতে বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়।

ধর্ম : ভৌত ধর্ম : অ্যালুমিনিয়াম সাদা ও খুব হাল্কা ধাতু। উহা

নমনীয় ও প্রসার্যমান ধাতু, সেইজন্য উহাকে সহজে পাতে বা তারে পরিণত করা যায়। উহা খুব শক্ত (tough)। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব 2·7। উহা তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহী।

রাসায়নিক ধর্ম ঃ (i) সাধারণ উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ু উহার উপর কোন ক্রিয়া করে না। আর্দ্র বায়ুতে উহার উপর অক্সসাইডের স্তর পড়ে। (ii) বায়ুতে উহাকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে উহা জ্বলিতে থাকে এবং অক্সাইড উৎপন্ন হয়। (iii) লবণাক্ত জলে উহা দ্রবীভূত হয়। (iv) অ্যালুমিনিয়াম-পারদ সংকর সাধারণ উষ্ণতায় জলকে বিশ্লিষ্ট করে। অ্যালুমিনিয়াম ফুটন্ত জলকে বিশ্লিষ্ট করে। (v) পাতলা ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়ামকে বিশ্লিষ্ট করে এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। (vi) গাঢ় ও উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়ামকে দ্রবীভূত করে এবং সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2) উৎপন্ন করে। (vii) অ্যালুমিনিয়াম সহজেই উষ্ণ কস্টিক সোডা ও কস্টিক পটাশে দ্রবীভূত হইয়া অ্যালুমিনেট ($NaAlO_2$) ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। (viii) অ্যালুমিনিয়াম উত্তপ্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার ও কারবনের সহিত যুক্ত হইয়া যথাক্রমে নাইট্রাইড (AlN), ক্লোরাইড ($AlCl_3$), সালফাইড (Al_2S_3) ও কারবাইড (Al_3C_4) গঠন করে। (ix) 1000°C উষ্ণতায় অ্যালুমিনিয়াম আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম অক্সাইডের সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া উক্ত অক্সাইডগুলি হইতে অক্সিজেন টানিয়া লয় এবং ধাতু পৃথক হয়। এই ক্রিয়ায় প্রভূত তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে ধাতুগুলি গলিয়া যায়। এই গলিত ধাতু দিয়া ভগ্ন রেল লাইন ও গাড়ী মেরামত করা হয়; উহাকে তাপ বিগলন মিশ্র (Thermit) বলে।

ব্যবহার ঃ এই ধাতু খুব টেকসই, হালকা ও নমনীয় বলিয়া উহা উড়োজাহাজ ও মটর গাড়ীর দেহ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। চাপে উহা পাতলা পাতে পরিণত হয় এবং উহা ভাল তাপ পরিবাহী বলিয়া উহা দিয়া রান্নার পাত্র ও ঘটি বাটি প্রস্তুত হয়। বিদ্যুতের সুপরিবাহিতার জন্য উহা তড়িৎ শিল্পে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। উহা বহু সংকর ধাতু প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়, যথা ডুরালুমিন উড়ো জাহাজ নির্মাণে ও ম্যাগনেশিয়াম তুলা যন্ত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ চাপে উহাকে এক ইঞ্চির 2 হাজার ভাগের এক ভাগ প্রস্থ বিশিষ্ট পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। এই পাত সিগারেট ও চকোলেটের প্যাকেট মুড়িতে ব্যবহৃত হয়। উহার গুড়া সাদা রং হিসাবে ও

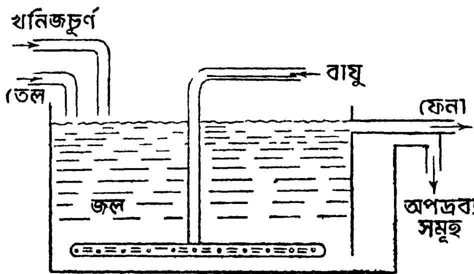
প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। উহা বিজারক হিসাবে বিগলন মিশ্রে ব্যবহৃত হয়। চুনী, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তর প্রকৃত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড।

57. জিঙ্ক বা দস্তা (Zinc) :

অবস্থান : জিঙ্ককে প্রকৃতিতে যৌগিক অবস্থায় পাওয়া যায়। উহার প্রধান আকরিকের নাম **জিঙ্ক ব্লেণ্ড** (Zinc blende)। উহা জিঙ্ক ও সালফারের যৌগিক পদার্থ (ZnS)। উহা ছাড়া অন্য জিঙ্ক আকরিকের নাম রেড জিঙ্ক ওর (Red Zinc Ore, ZnO), ক্যালামাইন (Calamine, $ZnCO_3$) ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়াম দেশে জিঙ্ক নিষ্কাশন করা হয়। ভারতের অনেক স্থানে জিঙ্ক ব্লেণ্ড পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতে জিঙ্ক নিষ্কাশন করা হয় না।

নিষ্কাশন : জিঙ্ক ব্লেণ্ড হইতে নিম্নলিখিত চারিটি পদ্ধতির সহযোগে জিঙ্ক নিষ্কাশন করা হয়।

(i) **গাঢ়ীকরণ :** আকরিককে চূর্ণ করিয়া একটু পাইন তেল ও অ্যাসিড এবং জল মিশ্রিত করিয়া বায়ু দ্বারা আলোড়িত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফাইড ফেনার সহিত মিশিয়া ভাসিয়া উঠে এবং অশুদ্ধিগুলি জলের নীচে থিতাইয়া পড়ে। ফেনাকে পৃথক করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।



চিত্র 70 : জিঙ্ক ব্লেণ্ডের গাঢ়ীকরণ।

(ii) **ভর্জন :** গাঢ় জিঙ্ক সালফাইডকে কিংবা ক্যালামাইনকে বহু কক্ষ (hearth) যুক্ত চুল্লীতে উষ্ণ বায়ু-স্রোতে পোড়ানো হয়। চুল্লীর বাহিরটা ইস্পাতের ও ভিতরটা অগ্নিসহ ইটের নির্মিত। চুল্লীর উপর হইতে গাঢ় আকরিক ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং নীচ হইতে উষ্ণ বায়ু প্রবেশ করানো হয়। চুল্লীর ভিতর আলোড়ক দিয়া মালগুলিকে নাড়িয়া দেওয়া হয়। এই ক্রিয়ায় জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO) প্রস্তুত হয়। $2ZnS+3O_2=2ZnO+2\ SO_2$; $ZnCO_3=ZnO+CO_2$.

(iii) **বিজারণ :** জিঙ্ক অক্সাইডের সহিত কোক চূর্ণ মিশাইয়া অগ্নিসহ মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত বহুবক্ষ বকযন্ত্রে জ্বালানি গ্যাস দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। বকযন্ত্রের মুখে মাটির গ্রাহক (receiver) ও লোহার শীতল নল জোড়া থাকে। তাপে জিঙ্ক অক্সাইড জিঙ্কে পরিণত হয় এবং কারবন মনক্সাইড উৎপন্ন হয়। জিঙ্ক বাষ্পরূপে পাতিত হইয়া ঐ নলে জমে। তরল জিঙ্ককে ছাঁচে ঢালা হয়।

(iv) **বিশুদ্ধ জিঙ্ক :** এই জিঙ্ক কয়েকবার পাতিত করিলে 99·9% বিশুদ্ধ জিঙ্ক পাওয়া যায়। উপরোক্ত জিঙ্ককে অ্যানোড করিয়া এবং বিশুদ্ধ জিঙ্ক দণ্ডকে ক্যাথোড করিয়া বিশুদ্ধ জিঙ্ক সালফেটের গাহে তড়িৎ বিশ্লেষণ করিলে ক্যাথোডে বিশুদ্ধ জিঙ্ক জমে। গাহের মধ্যে কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিড দিতে হয়।

ধর্ম : ভৌত ধর্ম : জিঙ্ক নীলাভ সাদা স্ফটিকাকার ধাতু। অশুদ্ধ জিঙ্ক সাধারণ উষ্ণতায় ভঙ্গুর হয়। 100–150°C উষ্ণতায় উহা নমনীয় হয় এবং উহাকে তারে বা পাতে পরিণত করা যায়।

রাসায়নিক ধর্ম : (i) শুষ্ক বায়ু জিঙ্কের উপর ক্রিয়া করে না। আর্দ্র বায়ুতে জিঙ্কের উপর কারবনেটের স্তর পড়ে। বায়ুতে উহাকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে উহা জ্বলিয়া উঠে। (ii) অশুদ্ধ জিঙ্ক ফুটন্ত জলকে বিশ্লিষ্ট করিয়া হাইড্রোজেন ও জিঙ্ক হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করে। (iii) অশুদ্ধ জিঙ্ক পাতলা সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয় এবং হাইড্রোজেন উদ্ভূত হয়। গাঢ় ও উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিডে জিঙ্ক দ্রবীভূত হয় এবং সালফার ডাই-অক্সাইড উদ্ভূত হয়। জিঙ্ক পাতলা ও গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিডে দ্রবীভূত হয়। (iv) জিঙ্ক উষ্ণ কস্টিক সোডায় দ্রবীভূত হয় এবং সোডিয়াম জিঙ্কেট [$Zn(ONa)_2$] ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

ব্যবহার : লোহায় মরিচা নিবারণের জন্য লোহার উপর দস্তার প্রলেপ (galvanizing) দেওয়া হয়। বালতি বা ঢেউ খেলানো টিনে এইরূপ দস্তার প্রলেপ থাকে। জিঙ্ক ধূলা বা জিঙ্ক ছিবড়া (granulated zinc) বিজারকের কাজ করে। তড়িৎ-কোষ প্রস্তুতে, জিঙ্ক হোয়াইট (রং বিশেষ) প্রস্তুতে উহার প্রয়োজন হয়। অনেক সংকর ধাতু প্রস্তুতে জিঙ্ক ব্যবহৃত হয়।

58. **সংকর ধাতু (Alloy) :** কোন কোন ধাতু এককভাবে যে গুণসম্পন্ন হয় অন্য ধাতুর সহিত তাপে মিশ্রিত করিলে উহার গুণ পরিবর্তিত হয়। দুই বা ততোধিক ধাতুর এই মিশ্রণকে **সংকর ধাতু** বলে। তামা

খুব নরম ধাতু কিন্তু উহার সঙ্গে অন্য ধাতু যথা জিঙ্ক মিশ্রণ করিলে উহা খুব শক্ত হয়। সাধারণ অ্যালুমিনিয়াম চাপে বাঁকিয়া যায়। অ্যালুমিনিয়ামের বাসন পড়িয়া গেলে টোল খায়। উহার সহিত অল্প পরিমাণ তামা, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত করিলে উহা এত শক্ত ও টেকসই হয় যে উহা দ্বারা উড়োজাহাজের এঞ্জিন ও কাঠামো প্রস্তুত হয়। খাঁটি সোনা এত নরম যে উহা একটু চাপেই বাঁকিয়া যায়। সেইজন্য স্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তুতের সময় বিশুদ্ধ সোনার সহিত সামান্য একটু তামা মিশাইয়া লয়। এই সংকর ধাতু শক্ত ও স্থায়ী হয়।

ইস্পাত : বর্তমান সভ্যতার বিরাট উপকরণ যে লোহা তাহা বিশুদ্ধ লোহা নয়। বিশুদ্ধ লোহা এত নরম যে উহা সামান্য চাপে বা আঘাতে বাঁকিয়া যায়। সেইজন্য নরম লোহার সঙ্গে কারবন, ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এই ইস্পাত অত্যন্ত শক্ত ও মজবুত। উহা প্রচুর আঘাত ও চাপ সহ্য করিতে পারে। এই সকল অশুদ্ধি কম থাকিলে উহাকে নরম ইস্পাত (mild steel) ও বেশী থাকিলে উহাকে শক্ত ইস্পাত (hard steel) বলে। ইস্পাত প্রস্তুতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

পিতল (Brass) **:** পিতল তামা ও দস্তার সংকর ধাতু। গলিত দস্তার ভিতর একটু একটু করিয়া তামা মিশাইতে হয়। সাধারণ পিতলে 70 ভাগ তামা ও 30 ভাগ দস্তা থাকে। পিতল দিয়া ঘটি, বাটি, থালা, নল, রড, তালাচাবি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পিতলের উপর বিভিন্ন ধাতুর তড়িৎ লেপনে বহু প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করা হয়।

কাঁসা (Bell-Metal) **:** কাঁসা তামা ও টিনের সংকর ধাতু। উহাতে শতকরা 80 ভাগ তামা ও 20 ভাগ টিন থাকে। উহাতে আঘাত করিলে খুব জোর শব্দ হয় বলিয়া উহা দিয়া ঘণ্টা প্রস্তুত হয়। সেইজন্য উহার Bell-Metal নাম হইয়াছে। কাঁসা আমাদের দেশে থালা, ঘটি, বাটি প্রভৃতি বাসন প্রস্তুতে বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে।

অনুশীলনী

1. লোহার আকরিকের নাম বল। লোহার নিষ্কাশনের প্রণালী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. লোহার ধর্ম ও ব্যবহার সংক্ষেপে বল।

3. কপার আকরিকের নাম বল। কপার নিষ্কাশনের প্রণালী বর্ণনা কর।

4. বিশুদ্ধ কপার কি প্রকারে পাওয়া যায় ?

5. অ্যালুমিনিয়ামের নিষ্কাশন, ব্যবহার ও ধর্ম সম্পর্কে যাহা জান বল।

6. জিঙ্কের নিষ্কাশন, ধর্ম ও ব্যবহার সম্পর্কে বল।

7. নিম্নলিখিত ধাতুগুলির প্রধান আকরিক অক্সাইডরূপে, সালফাইডরূপে পাওয়া যায় : কোনটি কিরূপে পাওয়া যায় ? (i) কপার (ii) লোহা (iii) অ্যালুমিনিয়াম (iv) জিঙ্ক।

8. বাম দিকের ধাতু ডান দিকের কোন আকরিক হইতে পাওয়া যায় ?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম	(ক) বক্সাইট
(খ) কপার	(খ) জিঙ্ক ব্লেণ্ড
(গ) জিঙ্ক	(গ) কপার পাইরাইটিস

9. হ্যাঁ কি না উত্তর দাও :

(i) বক্সাইটকে কয়লা দ্বারা বিজারিত করা যায় কি ?

(ii) বৈদ্যুতিক তারে কি বিশুদ্ধ তামা লাগে ?

(iii) কাউপার স্টোভে লোহা প্রস্তুত হয় কি ?

(iv) মারুত চুল্লীতে লোহা নিষ্কাশন হয় কি ?

(v) লোহার উপর কি জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় ?

(vi) কাঁসা কি লোহা ও তামার সংকর ?

10. সত্য উক্তির গায়ে × চিহ্ন দাও :

(i) অ্যালুমিনিয়াম খুব তাপের কুপরিবাহী।

(ii) অ্যালুমিনিয়াম খুব হালকা ধাতু।

(iii) জিঙ্ক পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

(iv) জল তামা দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জীব-জগৎ (Living Beings)

প্রথম পাঠ

অ্যামিবা, স্পাইরোগাইরা (অ্যালজি), ইষ্ট ও ফার্ণ
(Amoeba, Spirogyra (algae), Yeast and Fern)

59. সজীব পদার্থ (Living Objects) : সজীব পদার্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যথা—

(i) সজীব পদার্থের চলৎশক্তি আছে। প্রাণী মাত্রই আহারের অন্বেষণে বা আত্মরক্ষার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করে। মানুষ পা দিয়া স্থলে চলিয়া বেড়ায়, পাখী-পতঙ্গ ডানা দিয়া বায়ুতে উড়িয়া বেড়ায়, মাছ পাখনা দিয়া জলে সাঁতার দেয়। কেঁচো দেহকে প্রসারিত ও সংকুচিত করিয়া চলাফেরা করে। উদ্ভিদের মূল আহারের সন্ধানে মাটির ভিতরের দিকে বাড়ে এবং কাণ্ড আলোকের সন্ধানে উপর দিকে বাড়ে।

(ii) সজীব পদার্থ মাত্রই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। আমরা তাপ, শৈত্য, শব্দ, তড়িৎ ও স্পর্শ প্রভৃতি উত্তেজনায় নানা ইন্দ্রিয় দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে সাড়া দিই। আরশুলার গায়ে তীব্র আলোক ফেলিলে উহা পলাইয়া যায়। লজ্জাবতী লতার পাতায় হাত দিলে উহা গুটাইয়া যায়। ড্রসেরা নামক উদ্ভিদের পাতায় পতঙ্গ পড়িলে উহা বুজিয়া যাইয়া পতঙ্গকে বন্দী করে।

(iii) সজীব পদার্থ মাত্রই শ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন করে। প্রাণী নাক, মুখ, ত্বক, ফুলকা প্রভৃতি নানা প্রত্যঙ্গ দ্বারা বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কারবন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদের পাতা এই কার্য সম্পাদন করে।

(iv) সজীব পদার্থ মাত্রই খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। সজীব পদার্থ কার্য করিয়া শক্তি ক্ষয় করে। দেহযন্ত্রাদি কার্য করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই উভয় প্রকার ক্ষয় পূরণের জন্য খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। প্রাণী মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে। উদ্ভিজ মূল ও পাতা দিয়া খাদ্য গ্রহণ করে।

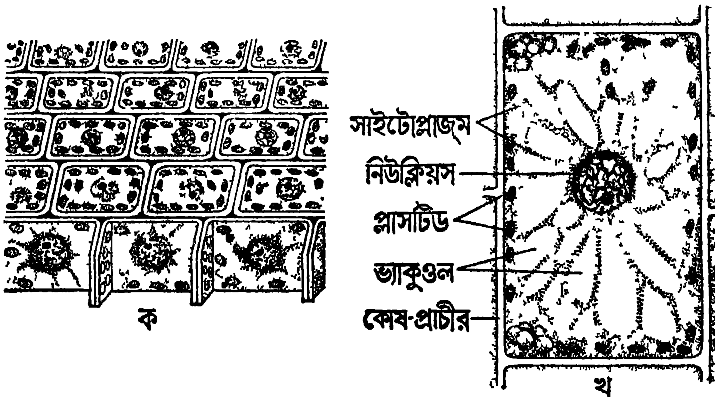
(v) সজীব পদার্থ মাত্রই বংশ বৃদ্ধি করে। প্রাণীগণ বাচ্চা প্রসব করিয়া, ডিম পাড়িয়া, দেহ বিভক্ত করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ

বীজ উৎপাদন করিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। অনেক উদ্ভিদের [illegible], মূল মাটিতে পুঁতিলে গাছ হয়।

(vi) সজীব পদার্থ মাত্রই অতি সূক্ষ্ম অংশ দ্বারা গঠিত। উহাদিগকে কোষ (cell) বলে। উহারা এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখা যায় না। অতি শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দ্বারা কোষ দেখা যায়।

(vii) সজীব পদার্থ মাত্রই কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিয়া পরে মরিয়া যায়। তখন উহার দেহ জড় পদার্থে পরিণত হয়।

60. কোষ ও প্রোটোপ্লাজম্ (Cells and protoplasm): প্রাণী ও উদ্ভিদ—উভয় শ্রেণীর দেহই অসংখ্য কোষে গঠিত। জীবদেহের তির্যকচ্ছেদকে (transverse section) অণুবীক্ষণ যন্ত্র



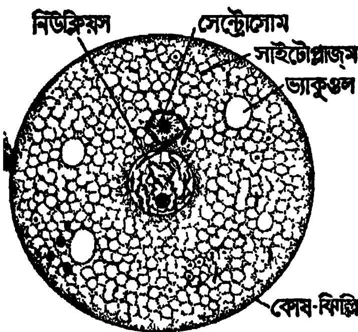
চিত্র 71 : উদ্ভিদকোষ ও তাহার অংশসমূহ।

সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে পরস্পরের সহিত যুক্ত অগণিত বহু বাহু-বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ দ্বারা উহা গঠিত। প্রতি প্রকোষ্ঠই একটি কোষ (cell)। জীবদেহ সাধারণতঃ বহুকোষী (multicellular)। কোষের শ্রেণীও একাধিক হইতে পারে। ঈষ্ট (yeast), অ্যামিবা (amœba) প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর জীবদেহ এককোষী (unicellular), অর্থাৎ একটি মাত্র কোষে গঠিত।

ইটের উপরে ইট সাজাইয়া যে ভাবে বাড়ী তৈয়ারী হয় জীবদেহও সেইভাবে কোষ দ্বারা গঠিত। জীবদেহের গঠন-প্রকৃতি ও জৈবধর্ম কোষের উপর নির্ভর করে। ইহারা জীবদেহে প্রাণশক্তির প্রতীক ও দেহের প্রয়োজনীয় সকল কাজ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের কোষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে।

...র কোষই একটি ... জেলির মত পদার্থে গঠিত। ইহার নাম প্রোটোপ্লাজম্—জীবদেহে প্রাণের ধারক। উদ্ভিদের দেহকোষের চারিদিকে একটি কঠিন আবরণ থাকে। এই কোষ-প্রাচীর (cell-wall) সেলিউলোজ (cellulose) নামক কার্বোহাইড্রেট দ্বারা গঠিত (চিত্র 71)। প্রাণীদেহের কোষে কোন সেলিউলোজ বা কঠিন আবরণ নাই। অপরপক্ষে প্রোটোপ্লাজ্ম্ কতকটা শক্ত হইয়া চারিদিকে একটি ঝিল্লি-আবরণ (plasma membrane) সৃষ্টি করে।

কোষমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমের সর্বাপেক্ষা ঘন অংশের নাম **নিউক্লিয়াস**। উহাই প্রোটোপ্লাজমের সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিউক্লিয়াস ব্যতীত প্রোটোপ্লাজমের অন্য ছোট ছোট ঘন অংশগুলির নাম **প্লাস্টিড** (plastid)। উহারা বর্ণহীন অথবা নানা বর্ণ যুক্ত। প্রাণীদেহের কোষে প্লাস্টিড থাকে না, কিন্তু নিউক্লিয়াসের নিকটে **সেন্ট্রোসোম** নামে অন্য একটি পদার্থ থাকে (চিত্র 72)। অবশ্য কোন কোন নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ কোষেও সেন্ট্রোসোম থাকে। নিউক্লিয়াস ও প্লাস্টিড বাদে প্রোটোপ্লাজমের বর্ণহীন স্বচ্ছ অংশের নাম সাইটোপ্লাজ্ম (cytoplasm)। উহার মধ্যে সকল সময়েই এক বা একাধিক সীমাবদ্ধ স্থান থাকে। উহাদিগের নাম **ভ্যাকুওল** (vacuole), ইহা কোষরসে (cell-sap) পূর্ণ। কোষরসের প্রধান উপাদান জলের মধ্যে নানারূপ জৈব ও অজৈব পদার্থ থাকে। প্রাণীকোষের ভ্যাকুওল সংখ্যায় কম ও আকারে ছোট।



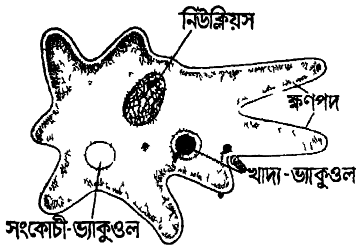
চিত্র 72 : প্রাণীর দেহকোষ।

প্রোটোপ্লাজ্ম্ দানাযুক্ত এবং স্থিতিস্থাপকও (elastic) বটে। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যস্থ জলের পরিমাণ উহার ঘনত্ব নির্দেশ করে। জীবিত অবস্থায় উহা নড়াচড়া করে, কিন্তু জলের অভাব হইলে এই ক্রিয়াশীলতা থাকে না। অবশ্য জল পাইলেই আবার প্রাণশক্তির বিকাশ হয়। প্রোটোপ্লাজমের রাসায়নিক সংযুতি অত্যন্ত জটিল। বিশ্লেষণকালে মরিয়া যায় বলিয়া জীবিত প্রোটোপ্লাজমের গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে, জীবিত ও মৃত প্রোটোপ্লাজমের উপাদানগুলি এক নহে।

যাহা হউক, এপর্যন্ত জানা গিয়াছে [illegible] উপাদানগুলির মধ্যে [illegible] কার্বোহাইড্রেট, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং [illegible] লবণও (ino[illegible] salts) কিছুটা আছে। মৌলিক উপাদান হিসাবে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, সালফার ও ফস্‌ফরাসের নাম করা যায়। প্রোটিন ও কার্বো-হাইড্রেটকে সঞ্চিত খাদ্য বলিয়া মনে করা হয়। [illegible]তাপে বা অ্যাসিড সংস্পর্শে প্রোটোপ্লাজমের পিণ্ডতাপ্রাপ্তি (coagulation) ঘটিলে অর্থাৎ জমিয়া গেলে, কোনভাবেই ইহাকে আর তরল করা যায় না। মৃত প্রোটোপ্লাজমের কোন ক্রিয়াশীলতা থাকে না।

61. অ্যামিবা (Amoeba): অ্যামিবা প্রাণীজগতের আদ্যপ্রাণী। উহা সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জীব; দেহ অতি ক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না।

অবস্থান: পুকুর, ডোবা, নালা প্রভৃতির তলায় জলজ উদ্ভিদের গায়ে অথবা কাদার মধ্যে উহারা প্রচুর পরিমাণে থাকে। পুকুর হইতে একটি পচা পাতা তুলিয়া উহার তলার দিক চাঁচিয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে অনেক অ্যামিবা ইতস্ততঃ চলিতে দেখা যায়।



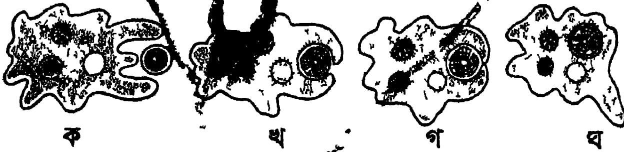
চিত্র 73 : অ্যামিবা।

দেহ: প্রতি অ্যামিবার দেহে একটি মাত্র কোষ থাকায় উহার দৈহিক গঠন অত্যন্ত সরল। এই আদ্যপ্রাণীর দেহ অর্ধস্বচ্ছ এবং প্রোটোপ্লাজমে গঠিত। উদ্ভিদ-কোষের মত এই এককোষীর দেহে প্রোটোপ্লাজম্‌কে ঘিরিয়া কোন শক্ত প্রাচীর নাই। সেইজন্য উহাদের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে না এবং উহারা সর্বদা নড়াচড়া করে।

অ্যামিবার চলিবার পদ্ধতি অদ্ভুত। উহার দেহের একটি অংশ লম্বা হইয়া যে কোন দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া যায় এবং বিপরীত দিকের সমস্ত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌কে টানিয়া লয়। ফলে, সম্পূর্ণ অ্যামিবাটি সরিয়া গিয়া অগ্রবর্তী স্থান দখল করে। আঙ্গুলের মত লম্বা এই ধরণের উপবৃদ্ধিকে ক্ষণপদ (pseudo-podia) বলা হয়। অ্যামিবার দেহ হইতে সর্বসময়ে সর্বদিকে ক্ষণপদ বাহির হইতেছে এবং অদৃশ্য হইতেছে।

অ্যামিবা-দেহের প্রোটোপ্লাজমে একটি নিউক্লিয়াস ও একটি বড় ভ্যাকুওল

বা[illegible]ওলটি সর্বদা [illegible] দেহে জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া উহা[illegible]কোচী ভ্যাকু[illegible]actile vacuole) বলে। ছোট ছোট শেওলা এবং অতি ক্ষুদ্র এক[illegible] —[illegible]প্রাণী অ্যামিবার খাদ্য। দুইটি ক্ষণপদ দ্বারা



চিত্র 74 : অ্যামিবার খাদ্য-সংগ্রহ।

অ্যামিবা কিছু জল সহ খাদ্যকে দেহের মধ্যে ঘিরিয়া ফেলে (চিত্র 74)। জল সহ খাদ্য অ্যামিবা-দেহে একটি ক্ষুদ্র খাদ্য-ভ্যাকুওল (food-vacuole) সৃষ্টি করে। উহা অস্থায়ী পাকস্থলী। এখানে অ্যামিবা-দেহের জারক-রসের (enzyme) সাহায্যে খাদ্য হজম হয়। হজমের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ভ্যাকুওল ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া এক সময়ে ফাটিয়া অদৃশ্য হয় এবং অজীর্ণ খাদ্য দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে।

পূর্বোল্লিখিত সঙ্কোচী ভ্যাকুওল স্বচ্ছ ; উহা ক্রমে বড় হইয়া উদ্বৃত্ত জল ও আবর্জনা—যথা, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি সহ অ্যামিবা-দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থানে নূতন সঙ্কোচী ভ্যাকুওল সৃষ্ট হয়। অন্য প্রাণীদের মত অ্যামিবাও শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্বন ডাই-অক্সাইড রূপে সঙ্কোচী ভ্যাকুওল সাহায্যে পরিত্যাগ করে। অ্যামিবা উত্তেজনায় সাড়া দেয় ; একটি সূঁচের স্পর্শেও উহার দেহ সরিয়া যায়।

বংশবৃদ্ধি : অনুকূল অবস্থায় অ্যামিবা খুব সহজেই বংশবৃদ্ধি করে। প্রথমে নিউক্লিয়াসটি দুই ভাগ হইয়া দেহটি লম্বা হয়। পরে একটি স্থান সঙ্কুচিত হইয়া

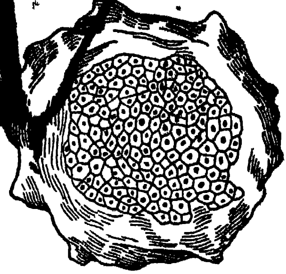


চিত্র 75 : অনুকূল অবস্থায় অ্যামিবার বংশ বৃদ্ধি।

দেহটি এমনভাবে দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয় যে, প্রতি খণ্ডে একটি নিউক্লিয়াস থাকে (চিত্র 75 গ, ঘ)। প্রতিকূল অবস্থায়—অর্থাৎ, অত্যধিক উত্তাপে বা জলাভাবে

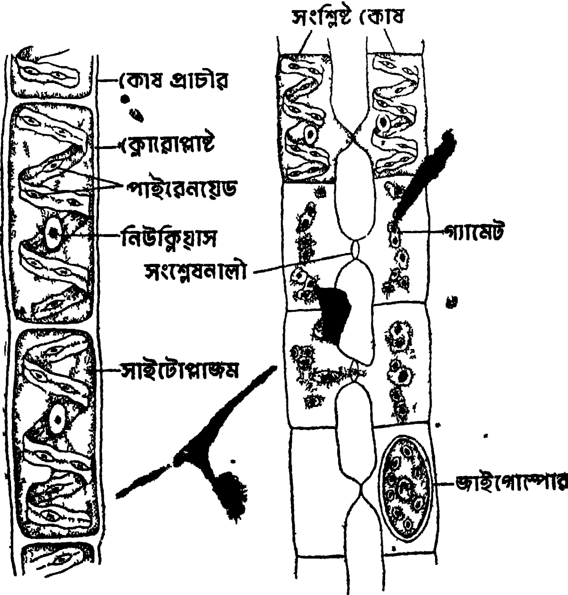
অ্যামিবা অন্যভাবে বংশবৃদ্ধি করে। [illegible] গুটাইয়া [illegible] দেহের চতুর্দিকে একটি শক্ত আবরণের (সিস্ট—[illegible]) [illegible] করে। [illegible] নিউক্লিয়াস এবং প্রোটোপ্লাজম্ এমনভাবে বহু [illegible] বিভক্ত হয় যেন প্রতি খণ্ড প্রোটোপ্লাজমে [illegible] একটি নিউক্লিয়াস থাকে (চিত্র 76)। আবার অনুকূল অবস্থায় আবরণ ফাটিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিবা বাহির হইয়া আসে।

সাধারণ প্রাণীর মত অ্যামিবার মৃত্যু হয় না; একটি কোষ বারে বারে বিভক্ত [illegible] নিত্য নূতন কোষ সৃষ্টি করে। স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়া উহাদের কোন শ্রেণীভেদ নাই।



চিত্র 76 : প্রতিকূল অবস্থায় অ্যামিবার বংশ বৃদ্ধি।

62. স্পাইরোগাইরা (আল্‌জি) (**Spirogyra**): উহারা স্বাদু জলের সাধারণ শেওলা। উহার দেহ সাধারণতঃ মূল, কাণ্ড বা পাতা দ্বারা



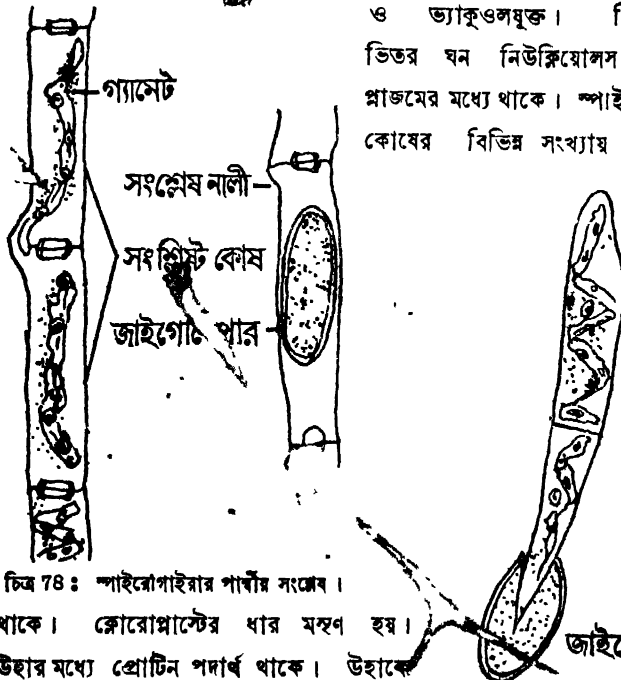
(ক) চিত্র 77 : স্পাইরোগাইরা। (খ)

বিভাগ করা যায় না। এই প্রকার উদ্ভিদের দেহকে **থ্যালাস** (thalus) বলে।

ভহার. ক্লারোফিল না... ...গার সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

অবস্থান : স্পাইরোগ... ...ধারণতঃ স্রোতহীন জলে (যথা, ডোবা, পুষ্করিণী) ভাসমান অবস্থায় ... যায়। তবে বহমান নদীতে বা ঝরণায় পাথরের সহিত উহাদিগকে ... সাহায্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়।

দেহ : স্পাইরোগা... ...ক সূতার মত... সূতাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া পিচ্ছিল পিণ্ডে পরিণত হয়। উ...তে প্রত্যেক সূতা কতকগুলি গোলাকার কোষ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি পর পর সজ্জিত থাকে (চিত্র 77, ক)। কোষ-প্রাচীর তিনটি স্তর দ্বারা গঠিত। ভিতরের দুইটি স্তর সেলিউলোজ এবং বাহিরের প্রাচীর স্পেকটোজ দ্বারা গঠিত। কোষের প্রোটোপ্লাজম্ দা... ও ভ্যাকুওলযুক্ত। নিউ...য়াসের ভিতর ঘন নিউক্লিয়োলস সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে। স্পাইরোগাইরার কোষের বিভিন্ন সংখ্যায় ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। ক্লোরোপ্লাস্টের ধার মসৃণ হয়। উহার মধ্যে প্রোটিন পদার্থ থাকে। উহাকে **পাইরেনয়েড** বলে (চিত্র 77 ক)।



চিত্র 78 : স্পাইরোগাইরার পার্শ্বীয় সংশ্লেষ।

চিত্র 79 : জাইগো...রের অঙ্কুরণ।

বংশবৃদ্ধি : স্পাইরোগাইরা তিন প্রকারে বংশ বৃদ্ধি করে :—(1) ... : দুইটি কোষের মধ্যপ্রাচীর নরম হইয়া বা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া দুইটি কোষ উৎপন্ন করে। উৎপন্ন প্রত্যেক অংশ বার বার বিভক্ত হইয়া নূতন সূত্র সৃষ্টি করে।

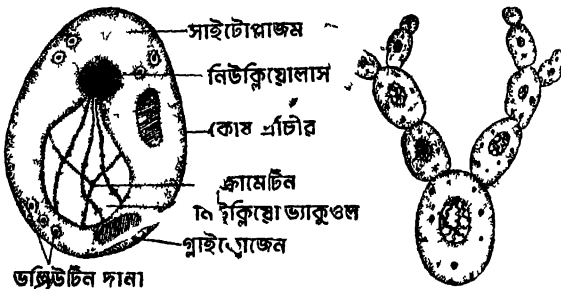
(2) **যৌন :** বসন্তকালে স্পা   যৌন মিলন প্রোটোপ্লাস্ট হইতে উৎপন্ন দুইটি এক র   মেটের (gam   র্গনে উহা সাধিত হয়। উহাকে **সংশ্লেষ** (conj   ) পদ্ধতি বলে। অবিভক্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত প্রোটোপ্লাস্টকে **গ্যামেট** বলে।   নও কখনও দুইটি পাশাপাশি বিভিন্ন সূতার কোষগুলির মধ্যে সংশ্লেষ সাধিত   উহাকে **পার্শ্বীয় সংশ্লেষ** বলে। কোষগুলির কোষ-প্রাচীর হইতে ক্ষুদ্র   (papilla) উৎপন্ন হয় (চিত্র 77 খ ও 78)। পুং গ্যামে ও স্ত্রী গ্যামেটের মিলনের ফলে উৎপন্ন কোষকে **জাইগোস্পোর** (zygospore) বলে। কখনও কখনও একই সূত্রে পাশাপাশি কোষের মধ্যে সংশ্লেষ সাধিত হয়।

২) **অযৌন :** গ্যামেটের মিলন না ঘটিলে প্রত্যেক গ্যামেটের চারিদিকে একটি পুরু আবরণ গঠিত হয়। উহা হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া নূতন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়।

63. ঈষ্ট (Yeast) :

অবস্থান : ঈষ্ট সাধারণতঃ ফলে, ফুলের মধুতে, মিষ্ট রসে, আখ চাকে মাটিতে অবস্থান করে। কতকগুলি ঈষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে পরজীবী হিসাবে বাস করে। উহা নানা শিল্পে বিশেষতঃ কোহল সন্ধানে (alcoholic fermentation) ব্যবহৃত হয়।

দেহ : ঈষ্ট সাধারণতঃ এককোষী জীব। প্রত্যেক কোষের আকৃতি উপবৃত্তাকার। কোষ-প্রাচীর পাতলা ; কোষের মধ্যে দানাদার ও ভ্যাকুওল যুক্ত



চিত্র 80 : ঈষ্টের দেহ।

প্রোটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস একটু অন্ত ধরনের, কারণ নিউক্লিয়োলসটি বড় ভ্যাকুওলের ধারে থাকে। ভ্যাকুওলের মধ্যে জালের মত